

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
শ্যামল সেন

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

উৎসর্গ

যাঁর স্নেহের ছায়ায় স্কুল-জীবনে একদিন লেখক হওয়ার
স্বপ্ন দেখতাম আমার সেই মেজদিকে—

রচনাকাল—সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

এই লেখকের—

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প	(উপন্যাস)
মুশ্‌কিল আসান	(নাটক)
গ্রাম্য-বাস্তু	(সত্যসাক্ষর-সাহিত্য)
পরিকল্পিত পরিবার	(ঐ)

পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-আড়িয়েল-খাঁ বিধৌত নদীমাতৃক দেশের মানুষ ওরা!

কোন অতীত ইতিহাসে ওদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে। সঙ্গে এনেছিল অশ্ব, গৃহপালিত পশু; —এনেছিল দৃপ্ত সাহস আর উন্নত রক্তের অভিমান। ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কিনারে কিনারে। অনুন্নত অনার্যদের সঙ্গে, মঙ্গোলীয় রক্তের সঙ্গে, আরও হাজার জাতি-উপজাতির শোণিতে ওদের সে অভিমান হয়েছিল দ্রব। তাদেরই একটা শাখা মেনে নিয়েছিল ঐ নদী মেখলা শ্যামল ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি ব'লে। পৃথিবী সে অধিকার স্বীকার ক'রে নেয়। কেটে যায় সহস্রাব্দী।

তারপর কোথা দিয়ে কি যেন হ'য়ে গেল। আজও ভাবলে অবাক্ লাগে হরিপদ মাস্টার মশায়ের—হঠাৎ একদিন নাকি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেল আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা তাঁর সাতপুরুষের ভিটাখানায় তিনি পরবাসী। জিনিসটা ভালো করে বুঝবারও সময় পাওয়া গেল না। মাস্টারি ক'রে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তাঁর। ভূগোল-ইতিহাস গিলিয়ে গিলিয়ে গাধা পিটিয়ে মানুষ করতে হ'য়েছে যাঁকে—সেই হরিপদ মাস্টারকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল ইতিহাস-ভূগোল-বহির্ভূত এই সিদ্ধান্তটাকে।

হরিপদ চক্রবর্তীকে হঠাৎ একদিন বলা হ'ল যে মতিগঞ্জে তিনি প্রবাসী। মতিগঞ্জ তাঁর দেশ নয়। এখানে তাঁর স্থান নেই!

হরিপদ সামনের কলমের কজলি গাছটার দিকে চাইলেন; ওটা লাগিয়ে ছিলেন তাঁর কর্তামা। গোয়ালঘরখানির দিকে তাকালেন। দেখলেন গৃহসংলগ্ন দেবায়তনের দিকে,—সেটা তাঁর কর্তাদাদার প্রতিষ্ঠিত। অসহায় উদাস দৃষ্টিতে অনেক কিছুই ধরা পড়ল। পাশাপাশি টিনের চালায় ভীড়, ছায়া-

থম্‌থম্‌ নারকেল গাছের পাতায় পাতায় কোলাকুলি, মরাইয়ের গায়ে তেল-সিঁদুরের রাঙা রেখা, নদীর হাঁসুলি-বাঁকের জল-চিক্‌-চিক্‌ পাড়ে কলমি আর কচুর মিতালি, ধান সিঁড়ির ধাপে ধাপে বীজ-ধানের ঘন সবুজাভা। ফুলে ফুলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা, গোরুর গাড়ির চাকা মেরামত হ'চ্ছে কলিমুদ্দি মিস্ত্রির ছাপরায়—ভেসে আসছে তার ঠকাঠক্‌! ও পাশের দাওয়ায় পুত্রবধূ কামিনীর আঁচল ধরে ঝুলে পড়েছে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বাবলু। রৌদ্র ঝল্‌মল মতিগঞ্জ গ্রামের আপাদমস্তক একনজরে দেখে নিয়ে হরিপদ মাস্টার চশমাটা খুলে নিয়ে মুছলেন। তারপর আবার চোখে দিলেন সেটা। জীবনে এই প্রথম ভুল জেনেও অঙ্কটাকে সংশোধন করা হ'য়ে উঠল না। কোন্‌ নির্বোধ ছাত্র যে এতবড় ভুল অঙ্কটা কষলো তা জানতেও পারলেন না তিনি। অন্তত তাকে নাগালের মধ্যে পেলেন না। পেলে কি করতেন জানি না,—কিন্তু ভুল অঙ্কের অশুদ্ধ ফলাফলটাকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। বার হ'য়ে পড়তে হ'ল স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে।

ওদের মতো অনেকেই চলে এল এ পারে দলে দলে। সারি সারি মানুষ। কোলে শিশু, বগলে প্যাঁটরা, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। শেষ-বারের মত স্টিমারটা ডেকে উঠল মতিগঞ্জের স্টিমারঘাটে। সিটি তো নয়—সে এক আর্তনাদ! রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। হরিপদ মাস্টার আর তাঁরই মতো সহস্র হতভাগ্য। নদীর জলে পড়েছে লক্ষ লক্ষ সূর্যকণা,—ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রয়েছে সঙ্কেত—ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কোটি কোটি হাত-ছানি দিয়ে মতিগঞ্জের স্টিমার ঘাটে নদী ওদের ফিরে ডাকছে। স্টিমারের সিটি শুনে দূরে স'রে যাচ্ছে ইলিস ধরার নৌকাগুলো। ওদের গলুইয়ে রাশী-কৃত রূপালী ইলিস। মাছরাঙাটা স্থির হ'য়ে বসে আছে আধ-ডোবা কঞ্চিটার ডালে। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' নরনারী—তাদের মুখে আতঙ্ক, চোখে জল। আসবে, ওরাও আস্‌বে, দুদিন আগে আর দুদিন পরে—এই যা!

এইবার খুলে দেবে স্টিমারের সিঁড়িটা। মতিগঞ্জের সঙ্গে যে সামান্যতম যোগসূত্রটি অবশিষ্ট রয়েছে—মুহূর্তে ঘুচে যাবে তা। সন্তান ভেসে পড়বে

নিজের ভাগ্যান্বেষণে—মায়ের জঠরের নিশ্চিত নিদ্রার অবকাশ আর ফিরে আসবে না জীবনে। হঠাৎ পায়ের কাছে উবুড় হ'য়ে পড়ে জোবেদালি।

: আমাগো ছাইড়্যা চল্লান ছাবতা? আমরায় কি দোষ করলাম?

না! দোষ জোবেদালি করে নি। কোনও দোষ নাই তার। ওর বাপ, ওর ঠাকুর্দা ছিল চক্রবর্তী বাড়ীর কৃষাণ। চক্রবর্তী পরিবারের ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ডটুকুতে ওরাই ফলাতো সোণা। ঘরে বয়ে দিয়ে যেত মালিকের প্রাপ্য ধান। আহ্বানমাত্র বেগার দিয়ে গেছে। বেজার হয়নি কখনও। ৺সত্য-নারায়ণের প্রসাদ নিয়ে অম্লানবদনে কপালে ছুঁইয়ে খেয়েছে। ঈদের দিনে নিয়ে গেছে বকশিশ—বিজয়ার দিনে মিষ্টান্ন। দাওয়ার উঠে বসবার অধিকার ছিল না ব'লে খুন্ন হয়নি কখনও—এ কারণে যে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত—এটা যে মানবিকতারই অপমান সে বোধই ছিল না ওদের। না, জোবেদালির প্রতি কোন অভিযোগ নেই চক্রবর্তীর। তিনি ওর হাত দুটি ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটি কথাও বলতে পারলেন না। ধরা গলায় জোবেদালি বলে

: আমাগো কি অইব? দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়া দাঁড়াইবাম? হরিপদ চক্রবর্তীর মনে হ'ল এই জোবেদালির সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা আছে। সুখ দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হ'য়ে গেছে শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দীর নির্দেশে! র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে সম্পর্ক ছিন্ন হ'তে পারে না। দুঃখের রাত্রে জোবেদালির কোনও নিরাপত্তা নেই চক্রবর্তী বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়া। চক্রবর্তী বাড়ীর কোন উৎসবও সম্পন্ন হ'তে পারে না পরিবার-ভুক্ত জোবেদালির উপস্থিতি ভিন্ন। হরিপদ চক্রবর্তী বলেন

: মন খারাপ করিস না আলি। তুই আমার পরিবারের লোক—আমার আত্মীয়। তোকেও আমি নিয়ে যাব কলকাতায়।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে জোবেদালি। যেন বুঝতে পারে না মাস্টার মশায়ের কথা।

: কি ভাবছিস্ রে বোকা? ভয় নেই—তোর বউকেও নিয়ে যাবো—ফতিমাকেও; ওখানে আবার আমি জমি কিনবো। তোকেই বন্দোবস্ত

দেবো। তুই ভাবিস না। আমাকে ছেড়ে তোরও চলবে না—তোকে ছেড়ে আমারও চলবে না রে।

দ্বিতীয়বার সিটি দেয় স্টিমারে। ওরা সিঁড়িটাকে সরাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সচকিত হ'য়ে ওঠে জোবেদালি। ছুটে চলে যায় সিঁড়ির দিকে। ওর স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্রও বুঝি এখনই ছিন্ন হ'য়ে যাবে। যাবার সময় তার ভীত আর্ত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় ক'টি শব্দ : না কর্তা, কইলকাতায় যাইলে উয়ারা আমারে মাইর‍্যা ফ্যালাইবে!

চকিতে স্মরণ হয় হরিপদ মাস্টারের। মতিগঞ্জ যেমন হরিপদর বিমাতৃভূমি—খাস কলকাতাও তেমনি জোবেদালির কাছে বিদেশ। ভুল অঙ্কটার কথা মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ!

ওদিকে স্টিমারটা বার কতক পাক খেয়ে তখন ঘুলিয়ে দিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ! লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়লেন যেন চক্রবর্তী। স্টিমারের সারেঙ কোনপথে চলেছে—জ্ঞান নেই তাঁর। তবু নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়েছেন তার উপর এ যাত্রার দায়িত্ব। যেমন ছেড়ে দিয়েছেন জীবনতরীর হালখানি ভাগ্যদেবীকে।

দর্শনা থেকে বানপুর। দলে দলে চলেছে মানুষ। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। অতীত ইতিহাসের যুগে যেমন ক'রে এসেছিল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ,—খাইবার 'পাশ'. দিয়ে—আর্যাবর্তে! নরনারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা-নারী সন্তানক্রোড়ে সগু জননী! সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলেছে খাঁচায়-পোষা পাখী, গলায়-চেন কুকুর। ক্যানেস্তারা, পোঁটলা, বাক্স, বিছানা। কাঠিওঠা মাদুর আর কালিওঠা লণ্ঠন। কাঁকালে শিশু, চোখে আতঙ্ক আর হৃদয়ে সন্ত্রাস। ওদের পূর্বপুরুষ আর্যাবর্তে এসেছিল নতুন রাজ্য জয় করতে; অনার্যদের উদ্বাস্তু করতে। ওরা এল নিজের দেশ ছেড়ে—উদ্বাস্তু হ'য়ে।

এইটুকু হাঁটাপথে আসতে হ'বে। দুই রাজ্যের মধ্যে সরাসরি রেলপথ আছে—নেই রেলপথে গমনাগমন। এটুকু পথ আসতে রেললাইনের পাথরে ঠোক্কর খেয়ে চোখ থেকে পড়ে চশমাটা ভেঙ্গে গেল হরিপদ মাস্টারের।

ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ তিনি বরাবরই। চোখে অন্ধকার দেখলেন। স্ত্রী বিন্দুবাসিনী হাত ধরে ওঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন রেললাইনের ধারের এক বিরলছায়া বাব্‌লা গাছতলায়। বড়মেয়ে নমিতা দুর্বাঘাস ছিঁড়ে এনে একটুকরা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দেয় পায়ের বুড়ো আঙুলটা। খর মধ্যাহ্নের দৃপ্ত তেজে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল তাঁকে। সেই দু'ঘণ্টা ধরে তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চোখের সামনে দিয়ে—বৈশাখী মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে বয়ে গিয়েছিল এক জনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। মানুষ চলেছে গায়ে গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথেব উপর চাপ ভীড়। ঠেলা-ঠেলি, হুড়াহুড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের একটা চলন্ত অজগর! বিনা চশমায় একটা মানুষের থেকে আর একটা মানুষকে তফাৎ ক'রে দেখতে পারছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই। ওরা যেন সন্ত্রাসিত পালায়নপর একটি অভীপ্সার উপাদান। অজগরটা চলেছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই। ওর লেজটা দেখা যায় না—কিন্তু কে বুঝি সঙ্গিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে সেই লেজে। ভয়ত্রস্ত সরীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুর!

আজও কলোনীর বিরলস্থান কুটিরে মাদুর বিছিয়ে যখন শুয়ে থাকেন—চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায় সেই বিচিত্র মিছিল। গায়ে গায়ে লাগা মানুষের প্রবাহ।

এ পারে এসে কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। স্টিমারে, ট্রেনে, কতো লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নতুন ক'রে জীবিকা অন্বেষণের যৌথ প্রচেষ্টা করবেন ব'লে কয়েকজনের নাম পরিচয়ও লিখে রেখেছিলেন নোট বইতে। কে জানে কোথায় গেল লোকগুলো। আছে হয়তো কোনও পি. এল. ক্যাম্পে পড়ে অথবা পেয়েছে পুনর্বসতি তাঁরই মতো। না হয় হাঙ্গামা চুকেই গেছে একেবারে।

সাত আট বছর কেটে গেছে এরপর। কত ঝড় ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে এদের উপর দিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। ট্রান্‌সিট ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প, পুনর্বসতি,

যাও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বেরার—ফিরে এসো হাওড়া অথবা শেয়ালদ' স্টেশনে। পুলিস ভ্যান, কোর্ট, হাজত—ঠিক হ্যায়! ক্যাংটার নেই বাটপাড়ের জন্য; কি করবি কর। আবার পুনর্বসতি? বেশ আবার চেষ্টা ক'রে দেখব। তোমাদের যদি ধৈর্য থাকে তবে আমাদেরও থাকবে।

: কেন থাকবে না?—বলেন গোকুল দাস। জমিদারের গোমস্তা ছিলেন তিনি। বলেন: ও ব্যাটাগো সুজা করা কি সহজ মশয়? মাইর খাইয়্যা খাইয়্যা বেটাগো পিঠে কড়া পইড়্যা গেছে। আরও মারবা? মারো। তোমারই জুতো ছিঁড়বো।

হরিপদ মাস্টার বলেন: ওরা ওরা ব'লছেন কেন? আমি আপনিও তো ঐ দলেই। আমরাও তো উদ্বাস্তু!

: আমরা আর অরা?—বিস্মিত হন গোকুল দাস। জমিদারেব দুর্ধর্ষ গোমস্তা। বলেন: আমরা হইলাম গিয়া ভদ্দরলুক, মানে মিডলক্লাস। আর অরা? অগো কোনও দিন চা'ল আছিল না চুলা আছিল? ঘর ভাইঙ্গ্যা দিছি বারবার। উই পুকার মতো গড়ছে আবার!

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িয়েলখাঁ বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডের মানুষগুলো সে গৌরব দাবী করতে পারে। এক হাতে রুখেছে প্রকৃতিকে—অন্য হাতে প্রতিহত ক'রেছে প্রবলতর শোষণবিলাসী মানুষকে। দু'হাতে সংগ্রাম ক'রে চলেছে আজীবন। তবু দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারেনি। শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা নদীতে শোনা গিয়েছে সুপ্তোত্থিত অজগরের গর্জন—নিভৃত রাত্রে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখেছে হয়তো একশ' দেড়শ' হাত এগিয়ে এসেছে নদী! কাল সন্ধ্যায় যে বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখে গিয়েছিলে গৈরিকবসনা মেয়েটির উদ্দাম উচ্ছ্বাস—আজ সে মহীরুহের চিহ্নমাত্র নেই। রাতারাতি নদীতীর ছেড়ে মানুষ চলে গিয়েছে অভ্যন্তর ভাগে। সেখানে নতুন বন্দোবস্ত দেয় না জমিদার। নদী যদি জমি খেয়ে নেয় তবে কে কি করতে পারে? অসহায় স্ত্রীপুত্র গোরু-ছাগল নিয়ে মানুষগুলো ঘুরে মরে, বানের মুখে কুটোর মতো। তারপর সংবাদ

আসে নদীর ওপারে জেগেছে চর। উর্বর পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে দল্‌দলে কাদামাটি হাতছানি দেয় ওদের। চরের জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলে ওরা। মানুষ-খেকো কুমীরে তাড়া ক'রে ধরে নিয়ে যায় বিরলবসতি চরের শিশুকে—বিষাক্ত সাপের করাল দংশনে নীল হ'য়ে যায় প্রিয়জন। তবু ওরা হার মানে না। চালায় লাঙ্গল, বোনে শস্য, বসায় কলমের গাছ। ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে ওঠে গ্রাম। প্রকৃতিকে জয় ক'রে ওরা হাসে!

অমনি দেখা দেন আর একজন। এতদিন যিনি খোঁজই রাখেন নি মানুষ-গুলো কি করছে চরে। তিনি জমিদারের লোক। হুকুম জারি হয়—নতুন বন্দোবস্ত নিতে হ'বে। কে অনুমতি দিলে ওদের এখানে ঘর করতে?

অনুমতি? অনুমতি আবার কিসের? অনুমতি দিতে বাধ্য হ'য়েছে প্রকৃতি—পৌরুষের দৃপ্ত নির্দেশে। কিন্তু সেকথা শোনে না জমিদারের পেয়াদা। এ যুক্তি ওরা মানে না।...

...দূরের গ্রাম থেকে সকলে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে এসে দেখে নদীর বুকে জ্বলে উঠেছে বাড়বানল। বিস্তীর্ণ নদীর এ পাড়ে এসে পৌছায় না তার পোড়া ছাই, অথবা হতভাগ্য গৃহদগ্ধ মানুষের অন্তিম আর্তনাদ!

: চরইস্‌মাইলপুরে আগুন লাগ্‌ছে মনে হতিছে?

: লাগবো না! হালার জমিদার।

এ যেন চিরন্তন একটি ব্যবস্থা! প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। গ্রীষ্মকালের খররৌদ্র, বর্ষার ধারাপাত, শীতের তীব্রতা যদি মুখ বুঁজে সহ্য করতে পার তবে এটাই বা পারবে না কেন?

তবু উইপোকার মতোই মানুষগুলো আবার লেগে যায় ঘর বাঁধতে!

সেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষগুলি এসে ঘর বেঁধেছে কলোনীতে

কলোনী!

উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনী।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন বসতি। এলোমেলো

অগোছালো গ্রাম নয়। দস্তুরমত প্ল্যান করা গ্রামনগরী। প্ল্যানের ব্লুপ্রিন্ট দেখলে মনে হ'তে পারে ত্রিশ-চল্লিশ-ফুট চওড়া সমান্তরাল সড়কগুলোর দু'ধারে বাড়ীগুলি বুঝিবা সাজানো। বাস্তবে কিন্তু বিসর্পিল রেখার অপ্রশস্ত গলির কাদা ভেঙে বাড়ীগুলির কাছে পৌঁছানোই কষ্টকর। ঈশ্বর জানেন ত্রুটি কার। যে সরকারি ওভারসিয়ার প্ল্যান দেখে রাস্তার লে-আউট দিয়েছিল তারই যোগ্যতার অভাব—অথবা সরকারি সড়ক গ্রাসে উৎসাহী কলোনীবাসীর যোগ্যতার পরিচয়! পাশাপাশি বাড়ী। তার ছাঁদ আলাদা। কোনটা পাকা, কোনটা কাদার। দরমা, মুলিবাঁশও আছে। পলেস্তারা করা পাকা ইটের দেওয়ালের উপর কংক্রীটের ছাদ থেকে সুরু ক'রে পাটকাঠির দেওয়ালের উপর তাল পাতার ছাউনিও আছে। সরকারি খাতা অনুযায়ী এদের মূল্যমান হওয়া উচিত অভিন্ন। 'প্রত্যেকটি বাড়ী করার খরচ বাবদ সরকারি খাতায় ঋণের পরিমাণ সাড়ে বাইশ শ' টাকা। একচুল এদিক ওদিক নেই।

এদের মাঝে মাঝে আবার আছে অসমাপ্ত ঘর। কোনটা প্লিন্থ পর্যন্ত গাঁথা, কোনটার লিণ্টেল ঢালাই হ'য়ে থেমে আছে। মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বমুখ পিলার-অহল্যা পাপস্খলনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এদের যারা মালিক তারা নিরুদ্দেশ। জমি আছে—অসমাপ্ত বাড়ী আছে—নেই মালিক। কলোনীর পরিভাষায় ডেসার্টার! দুষ্ট লোকে বলে গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা আত্মসাৎ করে এরা নাকি অপর জায়গায় গিয়ে ব্যবস্থা করেছে নতুন ঋণলাভের। ঊর্ধ্বমুখ পিলারগুলো বোধহয় সেকথা বিশ্বাস ক'রে না। শববীর প্রতীক্ষায় ওরা দিন গোনে।

এ হেন একটি ডেসার্টারের বাড়ীর মাথায় খান কয়েক করগেট চাপিয়ে বর্তমানে বাস করছেন হরিপদ মাস্টারমশাই। সাতবছর আগে ট্রেনে-স্টিমারে যাঁরা হরিপদ মাস্টারের নাম লিখে নিয়েছিলেন তাঁরা আজ তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না। সাত বছরেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর। ডান চোখে একেবারেই দেখতে পান না তিনি। বাঁ চোখটায় তীব্র আলোর সামনে বুঝতে পারেন লোকজনের আনাগোনা। মানুষ চিহ্নিত করার মতোও

দৃষ্টিশক্তি নেই তাঁর। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত এপারে এসে বহু স্কুলেই দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু নতুন চাকরি জোটেনি তাঁর। লেখাপড়ার চর্চা ছিল তাঁদের পরিবারে। বড় ছেলে অনিমেষকে ওকালতি পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। হ'ল না। নমিতাও মেধাবী ছাত্রী। প্রাইভেটে পড়েই ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সে। পড়ালে এতদিনে বি. এ, এম. এ পাশ করত হয়তো। কিন্তু কিছুই করা হ'ল না।

গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা দিয়ে একটা বাড়ী করতে সুরু করেছিলেন। প্রায় শেষও হ'য়ে এসেছিল। তারপর অর্থাভাবে তিলে তিলে খুলে বিক্রি করেছেন জানালা-দরজা-টিন-ইট! নিজের উপার্জন নেই। অনিমেষ একটা রিক্সা চালায়। তাতেই চলে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন। আজ দু'মাস সেও রোগ-শয্যায়। বর্তমানে এই ডেসার্টাস´ কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সপরিবারে। জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষাই ঘুচে গেছে। এখন বৃদ্ধের একমাত্র বাসনা ছোট ছেলেটিকে মানুষ করে তোলা। ওকে দিয়েই ফিরিয়ে আনতে হ'বে এ সংসারের লক্ষ্মীশ্রী।

ঘর একখানিই। তার মাঝামাঝি একটা শাড়ি টাঙ্গিয়ে এপাশে রাত্রি যাপন করেন হরিপদ মাস্টার আর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী। নমিতা আর লতু সে দিকেরই ভাগীদার। শাড়ির অপরাংশে, গৌরবে পাশের ঘরে, অনিমেষ আর কামিনী নিম্নস্বরে দাম্পত্য আলাপ ক'রে। গোরা শোয় ওদের কাছেই। অন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু যে কোথায় শোয় তা বোধহয় সে নিজেই জানে না।

ক'দিন ধরে অনিমেষের জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। অবশ্য জ্বরতাপ মাপবার মাপকাঠি এক্ষেত্রে হরিপদ মাস্টারের হস্তস্পর্শ ই। কিন্তু উদ্বিগ্ন বাপের কম্পিত হস্তে কি ভুল নির্দেশ দিতে পারে না? অনিমেষ মাথা তুলে উঠে বসবার চেষ্টা করে। আজ তার শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালোই বোধ হ'চ্ছে।

: আবার উঠে বসলে কেন? প্রশ্ন করে কামিনী।

: জ্বরটা ছাড়লো মনে হ'চ্ছে।

কামিনীর ডান হাতটা এঁটো। গোরাকে খাওয়াতে খাওয়াতে উঠে এসেছে। বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর ললাট স্পর্শ ক'রে। জ্বর বেশ আছে বলেই মনে হয়—সেকথা জানাতে মন সরে না ওর। চুপ ক'রে থাকে।

: বউমা, র‍্যাশানের থলেটা দাও।

পর্দার ও পাশ থেকে হরিপদ সাড়া দেন। ত্রস্তপদে কামিনী বেরিয়ে আসে। শ্বশুরের হাতে তুলে দেয় চটের থলিটা। আজ ডোল-ডে। শ্বশুর গিয়ে চাল আনবেন তবে জ্বালা হ'বে উনান। অন্ধ মানুষ। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়িতে সহজেই কাবু হ'য়ে পড়েন। চাল নিয়ে হয়তো ফিরবেন পড়ন্ত বেলায়। তখন রান্না চড়বে। র‍্যাশান-মেয়াদের শেষ কটি দিন কামিনীর প্রায় অভুক্তই কাটে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে সে তখন গিয়ে বসে কাঠের উনানের সামনে। ভিজা কাঠের উনানে ফুঁ দিতে চোখে জল আসে। তাতে দুঃখ নেই কামিনীর। কাঁদবার এ একটা ভালো অছিলা।

বাপমায়ের আদরের মেয়ে ছিল কামিনী। একমাত্র সন্তান—তাই অভিমানী ছিল সে বড়। অনেক খোঁজ করে বাবামা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন হরিপদ পণ্ডিতের বড় ছেলের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত মহোপাধ্যায় বংশ। অনিমেষ ছেলেও ভালো। তখন পড়ত কলেজে। আম-জামের বাগান ঘেরা ওদের বসত বাড়ীটা দেখে কন্যাদায়গ্রস্থ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—অভিমানী মেয়েটার অন্তত খাওয়া-পরার কষ্ট থাকবে না।

কিন্তু কোথা থেকে কি যে হ'য়ে গেল!

টিপি টিপি বৃষ্টি নামলো। মাথায় একটা গামছা চাপিয়ে হরিপদ মাস্টার র‍্যাশান আনতে বেরিয়ে গেলেন।

: বাবলু কোথায়? কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনিমেষ। ওর কণ্ঠস্বরে চম্‌কে ওঠে কামিনী। বলে: কি জানি সে তো বেরিয়ে যায়, সেই কাক-ডাকা ভোরে।

: আর ফেরে বুঝি সেই প্যাঁচা-ডাকা মাঝরাত্রে?

কামিনী জবাব দেয় না। আপন মনেই বকতে থাকে অনিমেষ : ছেলে-মানুষ তো আর নয়। দশ এগারো বছর বয়স হ'ল। সংসারের অবস্থাটা তারও বোঝা উচিত। অন্ধ বাপ বৃষ্টি মাথায় ক'রে র‍্যাশান আনতে যায়—আর নবাবপুত্র কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।

এত দুঃখেও কামিনীর হাসি আসে। বলে : গাল দিচ্ছ কাকে ?

: নবাব খাঞ্জা খাঁর বেটা তোমার আদরের দেওরটিকে। আদর দিয়ে দিয়ে যার মাথা খেয়েছ তাকে।

অনিমেষের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। বাব্‌লু যে তার বৌদির আদরেই উৎসন্নে যেতে বসেছে এটুকু অনিমেষ বর্ণে বর্ণে বোঝে। তাই খোঁচা দিয়েই বক্তব্যটা শেষ ক'রে।

কামিনী রাগ করে না। দেওরের প্রতি তার স্নেহের আতিশয্যটা যে বাড়ীশুদ্ধ সকলে মাথা খাওয়ার পর্যায়ে ফেলে এটুকু তার জানা কথা। তাই হাসিমুখেই সে জবাব দেয় : তা যেন বুঝলাম, কিন্তু জ্বর গায়ে ভাইকে গাল দিতে বসে আসলে কাকে গাল দিচ্ছ তা কি ভেবে দেখেছ ?

: কাকে ?—প্রশ্নটা বোধগম্য হয় না অনিমেষের রোগদুর্বল মস্তিষ্কে।

: তোর বাপকে রে অন্থ, তোর বাপকে। ঐ যে তুই গরীব ইস্কুল মাস্টারকে নবাব খাঞ্জা খাঁ বল্লি না, তাই বৌমার মুখে হাসি আর ধরছে না। আসল নবাবের ঘরের মেয়ে কিনা তাই শ্বশুরের খোয়ারে আনন্দের আর পরিসীমে নেই !

কামিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার আঁচল তুলে দেয়। বিন্দুবাসিনী। কঠোর সত্যটা অকস্মাৎ মুখব্যাদান ক'রে দাঁড়িয়েছে। একই ঘরে বাস ক'রে ওরা। শ্বশুর-শাশুড়ী, পুত্র-পুত্রবধু ! মাঝের টাঙ্গানো বস্ত্রখণ্ডটি গোরা যে কখন টেনে নামিয়েছে তা খেয়ালই হয়নি কারও। দৃশ্যান্তরের অসময়ে মঞ্চাধিপের অনবধানতায় ড্রপসীন উঠে গেলে—যেমন করে ছুটে পালায় সীন সিফ্‌টারেরা, তেমনি দ্রুতপদেই নিষ্ক্রান্ত হ'তে চায় কামিনী ঘর থেকে। বাধা পায় সেদিক থেকে নমিতা প্রবেশ করায়। নমিতার হাতে এক বাটি বার্লি। অনিমেষের

তক্তাপোশে সেটা নামিয়ে রেখে মায়ের দিকে ফিরে বলে : তুমি আবার ওদের কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছ মা? একখানা ঘর—ওরা কি স্বামী-স্ত্রীতে কোন কথাও বল্‌তে পারবে না তোমার জ্বালায়?

: অন্যায় হয়ে গেছে মা, মাপ চাইছি। তবে চোখ-কানের সামনেই এসব হ'তে দেখলে সব সময় স্থির থাকতে পারি না। কি করব! কপাল আমার!

আপন মনে গজ গজ করতে করতে তিনি চলে যান। নমিতা এবার কামিনীকে বলে : আর তোমাকেও বলি বৌদি। জানো তো একখানি মাত্র ঘর। ওসব কথাগুলো কি চেঁচিয়ে না বল্লেই নয়?

কামিনী বলে : কপাল আমারও ঠাকুরঝি। শাশুড়ী ননদ যে সব সময় আড়ি পেতে আছেন এটা মনে থাকে না আমারও।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় নমিতা। যেন কিছু বলবে সে। তাবপর রোগজীর্ণ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয় নিজেকে। চলে যায় ধীব পদে। কামিনীও অনুসরণ করে।

অনিমেষ চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। আজ দু'মাস সে শয্যাগত। তাব আগে সেও বেরিয়ে যেত সেই কাকডাকা ভোরে—আর ফিরত সাড়ে দশটার শেষ লোকালের প্যাসেঞ্জার দেখে পেঁচাডাকা মাঝরাত্রেই! অনিমেষ ভাবে তাড়াতাড়ি সব বদল হ'য়ে যাচ্ছে। শুধু তাদের আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, মানুষ-গুলো পর্যন্ত। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তী তো আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। শুধু দেহে নয় মনেও। সত্যাশ্রয়ী আদর্শবাদী হবিপদ পণ্ডিতের যে প্রেতাত্মা আজ উদয়নগর কলোনীর ডোলভুক্ ভিক্ষাজীবী তাকে চেনা যায় না। বদলে গেছেন বিন্দুবাসিনীও। উচ্ছল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন তিনি। গোয়ালঘরে গোমাতার সেবা থেকে আহারান্তে পণ্ডিতের হাতে খড়কে কাটিটি এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজটুকু তিনি নিজে হাতে করতে চাইতেন। নববধূ কামিনীকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এ বাড়ীব কুলাচার। নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন তিনি। কটুকথা কেউ কখনও শুনতো না তাঁর মুখ থেকে। পুত্রবধূর সঙ্গে মুখোমুখী ঝগড়া করা তো

স্বপ্নকথা। বদলেছে নমিতাও। কামিনীর সঙ্গে ওর বয়সের তফাৎ নেই। দুই অন্তরঙ্গ সখীর মতোই ছিল ওরা ওপারে। আজ তাদের সামান্যতম জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। দোষ অনিমেষ দেবে কাকে? একটু আগে বকছিল বাবলুকে। কিন্তু বাবলুই কি এ রকম ছিল চিরকাল? ছেলেবেলার বাবলুকে মনে পড়ে। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। নিটোল স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। ডাগর চোখ দুটির অন্তরালে যেন কোন অতলস্পর্শ গভীরতা আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দুঃখ কষ্টই পেয়েছে এতদিন। ওপারের জীবনটা তার কাছে গল্পকথা। নিজের বাল্যকালের সঙ্গে ভাইয়ের শৈশব তুলনা করে এতদিন শুধু কষ্টই পেয়েছে। উমাশশী গার্লস স্কুলের হেড পণ্ডিতের বেতন যাই হ'ক সংসারে প্রাচুর্য ছিল যথেষ্টই। অপর্যাপ্ত মাছ, অঢেল আম-জাম-কলা। খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে—খিদে পেলে অনুভূতিটা কেমন হয় অনিমেষ জানতে পারেনি এপারে পা দেবার আগে। বাড়ীর সামনে ছিল একটা কলা আর একটা কালোজামের গাছ। নীল হ'য়ে থাকত গাছের তলাটা পাকা ফলের প্রাচুর্যে। পেড়ে কুড়িয়ে নিঃশেষিত করা যেত না তার অকৃপণ দান। মানুষের পদদলনে নীলাভ হ'য়ে থাকতো পাকা জামের রসে পথ চলতি সড়ক। আর আজ জাম বিক্রি হয় পয়সায় চারটে। বড় বড় ডাগর চোখে লোলুপতা ফুটে ওঠে বাবলুর। দাদা বলে: জাম খাবি বাবলু? যা এক পয়সার কিনে আন।

: ভারি তো জাম—ঠোঁট উল্টে জবাব দিত বাবলু।

এত বুঝমান ছিল সে। খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখটা—তবু খেতে চায়নি। অতটুকু ছেলেমানুষ বুঝে নিয়েছিল এ সংসারের অসহায়তা। শুধু বড্ড বেশী খিদে পেলে বৌদির কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে সলজ্জে জিজ্ঞেসা ক'রেছে: আজ ফ্যান রাখনি বৌদি?

জবাব দিতে পারে না হয়তো কামিনী। সে কি করে বোঝাবে অতটুকু ছেলেকে—যে ফ্যানটা আলাদা করে রাখলে ভাতের পরিমাণ যায় কমে। সহজে হজম হয়ে অল্প সময়েই খিদে পায়। তাই ভাত থেকে ফ্যানটাকে

বিমুক্ত করা আর সম্ভব হ'চ্ছে না এ সংসারে। বৌদির মুখ দেখেই বুঝে নেয় বাবলু। তাড়াতাড়ি শুকনো ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলে: বাঁচিয়েছ বৌদি; ও ফ্যান সত্যিই গিলতে পারি না আমি। মাগো! মানুষে খায় নাকি শুধু ফ্যান নুন দিয়ে!

ওর হাসি দেখে চোখে জল আসে হয়তো কামিনীর!

সেই বাবলু!

অনিমেষ উত্তপ্ত মস্তিকে বসে বসে তাই ভাবে। সেই বাবলুর এতবড় পরিবর্তন হয় কি ক'রে? শত চেষ্টাতেও ওকে বই নিয়ে বসানো যায় না। ব'লে, ব'কে, মেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন হরিপদ মাস্টার। নমিতাও বোধহয় আশা ত্যাগ করেছে। 'ও গাধাটার কিছু হবে না' বলেছেন পণ্ডিত। অনেক গাধাকে যিনি পিটিয়ে মানুষ করেছেন—এবং বাবলুর মেধা আর অধ্যবসায় নিয়ে যাঁর গর্বের অন্ত ছিল না, এক সপ্তাহে তার অক্ষর পরিচয় শেষ হয়েছিল বলে যে পণ্ডিতের প্রশংসার ভাষা জোগায়নি—তিনিই শেষ পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্-বানী ক'রে বসলেন একদিন। সংসারের কোনও কাজ করবে না। আজকাল কারও সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না। কোন ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় কেউ টেরই পায় না। দুপুরে ফিরে কোনও দিন খায় কিনা তা ওর বৌদিই জানে। সারাদিন ওর দেখা নেই। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ও গুটিগুটি এসে শুয়ে পড়ে ওর নির্দিষ্ট মাদুরে। হয়তো ঘুম ভেঙ্গে যায় নমিতার অথবা বিন্দুবাসিনীর। কিন্তু মধ্যরাত্রে আর কে ছেলে শাসন করতে বসে। সুতরাং লালয়েৎ, তাড়য়েৎ কোনটাই হ'য়ে ওঠে না। এগারো বছরের এক ফোঁটা বাবলু সংসারের শাসন শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে।

অনিমেষ কি করতে পারে? বাবলু তো ছেলে, অল্প বয়স। লতুটাকেই কি শাসন করতে পারে? ঐ বোধহয় একমাত্র মেয়ে যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এপারে আসার সময় কতই বা বয়স ছিল ওর। বছর সাত আটের একটা চঞ্চল ফুটফুটে মেয়ে ছিল। আজ ওর বয়স পনেরর কোঠায়। গড়নটা বাড়ন্ত নয় বলে আজও ফ্রক পড়ে। কিন্তু বয়স তো ছেলেমানুষের নয়। লতু

বোধহয় দেহে মনে আজও সেই লতুই আছে। সেই কিশোরী বালিকা। শুধু কিছু বাজে নভেল প'ড়ে অকালপক্ক হয়েছে ইতিমধ্যে। লেখা পড়ার ধার সেও ধারল না! লতুর জন্যে ভেবে আর কি হবে? সব গুণের অধিকারিণী হওয়া সত্যেও নমিতারই যখন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না—তখন লতুর আর কি হ'তে পারত? কিন্তু বাবলুটার উপর বড় ভরসা ছিল যে! অনিমেষ অবাক হ'য়ে ভাবে—সংসারের সব কাজে কামিনীর এত বুদ্ধি, এত বিচক্ষণতা, আর এই সোজা কথাটা কেন সে বোঝে না? কামিনী কেন বোঝে না যে ঐ একফোঁটা ছেলেটার দিকে চেয়েই দিন গুনছে এতগুলো লোক। সে মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে, চাকরি বাকরি ক'রে এই ভেঙ্গে পড়া সংসারটাকে আবার খাড়া করে তুলবে! মহোপাধ্যায় বংশের শেষ সম্মানটুকু হয়তো ওই পারতো উদ্ধার করতে; অন্ধ হরিপদপণ্ডিতকে এ উঞ্ছবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারতো অন্তত শেষের কটা দিনের জন্য।

: ওমা, বার্লিটুকু এখনও খাওনি? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে? কামিনী এসে দাঁড়ায়।

: মা কোথায়? —অনিমেষ প্রতিপ্রশ্ন করে।

: মা জল আনতে গেছেন।

রাস্তার ধারে নলকূপ। এতদিন কামিনী অথবা নমিতাই জল নিয়ে আসতো। সম্প্রতি এ দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী অথবা নমিতা প্রতিবাদ করেনি। করবার উপায়ও ছিল না। নতুন একখানা শাড়ি না কেনা পর্যন্ত তাদের দুজনের কারও পক্ষে সম্ভব নয় রাস্তার কল থেকে জল তুলে আনা। বাইরে বের হবার অর্থাৎ জল আনতে যাবার একটি মাত্র এজমালি শাড়ি ছিল—কোনদিন কামিনী কোনদিন নমিতা সেখানি পরেই জল নিয়ে আসতো। সেটিও জীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া টিউব-ওয়েলের ঠিক সামনেই জয়হিন্দ কেবিন। চায়ের দোকান। ডি-ব্লকের সেক্রেটারি বিষ্টুপদ মজুমদারের রেস্তোরাঁ। যত রাজ্যের বেকার বকাটে ছোঁড়ার আড্ডা সেটা। স্বয়ং বিষ্টুপদও কম না। এটা অনুভব করেছেন বলেই বিন্দুবাসিনী

স্বেচ্ছায় এ দায়িত্বটা নিয়েছেন। লতু অবশ্য এ কাজটা ক'রে দিতে পারতো সংসারের। করেও মাঝে মাঝে কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ভুলেও যায়। এই 'মাঝে মাঝে' ব্যাপারটা এত ঘন ঘন ঘটতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী আর ওর উপর ভরসা করতে রাজী নন। পানীয় জলটা মাঝে মাঝে ভুলে গেলে সংসারটাও মাঝে মাঝে অচল হ'য়ে ওঠে!

এতকথা অনিমেষ জানে না। বলে: মা জল আনতে গেছেন? কেন? জলটুকুও তুলে আনতে পার না তুমি? নমু পারে না, লতু পারে না?

একটু ইতস্তত করে কামিনী। তারপর বলে: লতুর কথা জানি না কিন্তু ঠাকুরঝি বা আমার লজ্জা করে—এ শাড়িটা—

: ও। তা ই'য়ে, বাবলুকেও তো বলতে পার সংসারের এটুকু কাজ ক'রে দিতে। ষাট বছরের বুড়িটাকে সেও তো একটু সাহায্য করতে পারে। আমরা তার নাগাল না পেলেও তুমি তো তার দেখা পাও।

: আচ্ছা বলব অখন! কিন্তু বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!

: না খাব না। আগে আমার কথার জবাব দাও। সত্যি তুমি কি ভেবেছ মনে? এ ভাবে বাউণ্ডুলে হ'য়ে যাবে ছেলেটা? লেখাপড়া শিখবে না? মানুষ হ'বে না?

কামিনী কি যেন ভাবে একটু। তারপর বসে পড়ে ওর চৌকির একপ্রান্তে। ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে: কথাটা তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব ভাবছিলাম। দেখলে তো, ওর লেখাপড়া হবে না। বাবা আর ঠাকুরঝি যতই কেন না বকাঝকা করুন ও বই নিয়ে কিছুতেই বসবে না। ও চাইলে বিষ্টুর দোকানে কাজ করতে। এক বেলার খোরাকি আর মাসে পাঁচটাকা নগদ! অথচ তোমরা রাজী হ'লে না। তোমরা মত দাও ওকে আমি ঐ চাকরিই নিতে বলি। যা হোক সংসারের আয় তো হবে!

নমিতা বসেছিল ঘরের প্রায় চৌকাঠের কাছে। উঠে আসে সে। আর সহ্য হয় না তার। বলে: বাবা আর ঠাকুরঝির বকাঝকায় কেন কাজ

হয় না তা তো তোমার অজানা নেই বৌদি। বাড়িতে একজন যদি অনবরত আশকারা দিয়ে যায় তবে তাকে শাসন করে কে? বাবলু হবে চায়ের দোকানের বয়? ওর লেখাপড়া হবে না। কেন হবেনা? জানো, বাবা বলতেন ওঁর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বাবলুর মত মেধাবী ছেলে একটিও দেখেননি। পড়লে ও নিশ্চয়ই বৃত্তি পাবে পরীক্ষায়।

: সে কি আমিই জানি না ঠাকুরঝি? পড়াতে পারলে তুমিও এতদিনে বি. এ. পাশ ক'রে চাকরি করতে—তোমার দাদাও হয়তো ওকালতি করতে পারতো। কিন্তু তা তো হ'চ্ছে না। ইচ্ছা থাকতেও তোমরা পড়াশুনা চালাতে পারলে না—আর ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা পণ্ডিত করে তুলবে?

নমিতা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কামিনী তার যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে: তাছাড়া সংসারটাতো চালাতে হ'বে? তোমার দাদা আজ দু'মাস বিছানায় পড়ে। মানুষতো কমগুলি নই আমরা সংসারে?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। অনিমেষও কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এতদিন সংসারটা চল্‌ছে কি ক'রে সেই এক বিস্ময়। অবস্থা অবশ্য চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু অচল হ'য়ে তো পড়েনি। চল্‌ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অভাগীদের এ সংসারটাও।

: তোমরা বুঝিয়ে বল বাবাকে। ঠাকুরপোকে বিষ্টুর দোকানেই ঢুকতে দাও!

: না! হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে অনিমেষ: জীবনে অনেক নিচে নেমেছি; কিন্তু আর নামতে পারব না।

কামিনী জবাব দেয় না। সে জানে আসল অভিমানটা কোথায়! সামাজিক মর্যাদার অভিমান। জাতের অভিমান। মতিগঞ্জ স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র মহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণচন্দ্র ভিষগ্‌রত্নের পৌত্র—চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করবে—নিষিদ্ধ মাংসের উচ্ছিষ্ট প্লেট ধুয়ে মুছে তুলবে—এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁরা।

অবস্থায় ফেরে পণ্ডিতগিন্নি আজ রাস্তার নলকূপে জল আনতে যান—পণ্ডিত-মশাই গিয়ে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে ডোল অফিসে—পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—যাকে ওকালতি পড়াবার বাসনা ছিল পণ্ডিতদম্পতীর সে আজ রিকশা চালায় ; কিন্তু ব্যাস! ওর নিচে আর নামা যায় না।

: বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!

অনিমেষ আর আপত্তি করে না। চটা-ওঠা কলাই করা বাটিটা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে।

জলভরা ঘড়াটা সশব্দে উঠানে নামিয়ে হাঁপাতে থাকেন বিন্দুবাসিনী। বয়স হয়েছে, অতবড় ঘড়াটা বয়ে আনতে তাঁর সত্যিই কষ্ট হয়।

বাইরে কে যেন ডাকে : পণ্ডিতমশয় রইছেন নাকি ঘরে?

: কে? ভিতরে আসুন। সাড়া দেয় অনিমেষ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বিষ্টুপদ। ভি-ব্লকের সেক্রেটারি তথা জয়হিন্দ-কেবিনের মালিক স্বনামধন্য বিষ্টুপদ মজুমদার। কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। দরজার কাছেই বিষ্টুপদ দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হ'য়ে পড়ে পিঠের আধখানা—ছিন্ন কাপড়ের ফাঁকে। সেটা অনুভব করে সে। তাড়াতাড়ি সেটুকু ঢাকতে গিয়ে ঘোমটাটা নামিয়ে দিতে হয়। বিষ্টুপদের সঙ্গে চোখা-চোখি হয় ফলে। অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিষ্টুপদ হাসে : আরে আমাকে দেইখ্যা ফির লজ্জা পাও ক্যারে? আমি তো ঘরেরই লুক।

: আসুন. এখানে এসে বসুন।—অনিমেষ আহ্বান করে ওঁকে চৌকিতে এসে বসতে। বিষ্টুপদ কিন্তু এগিয়ে আসে না, দ্বার ছেড়ে। সেখান থেকেই বলে : বৌমারে এক্‌খান শাড়ি কিন্যা দাও সে অনিমেষ! ঘরের লক্ষ্মীকে এক্কেরে উদামগা কইর‍্যা রাখছ, মা লক্ষ্মীতো বেবাক্ অখুশী অইবই!

আপাদমস্তক জ্বালা ক'রে ওঠে অনিমেষের। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে·

: ওকে যেতে দিন। দরজা ছেড়ে বসুন এখানে এসে!

এবার বিষ্টুপদকে এগিয়ে আসতে হয়। কামিনী দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয় ঘর থেকে। যেন কৌরবসভা ত্যাগ করলেন যাজ্ঞসেনী।

: মাস্টার মশয় কই ? বাবলুরে দেখিনা ?

: বাবা র‍্যাশান আনতে গেছেন। বাবলু বাড়ি নেই। কি বলছিলেন বলুন।

: কইৎ ছিলাম কি বাবা অন্ধ বুড়াটারে ক্যান পাঠাও ভোল অফিসে ? বউডারে না পাঠাও বুইন ডুডার একটারেও তো পাঠাইতে পার ?

: কেন পারিনা তা তো আপনার জানা উচিত মজুমদারবাবু। দু দুবার ডি-ব্লকে শাড়ি বিলি হ'ল অথচ আমাদের বাড়ি বাদ পড়ল। আপনি সেক্রেটারি, আপনার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় ?

: কি করুম কও! পাচখান শাড়ি তো পঞ্চাশ জন পরিবার। কারে দিয়া কারে রাখুম কও ?

: যাক্ যা বলতে এসেছেন বলুন।

: বাবলুরে আমারেই দাও। দুকানে একডা ভালো ছুকরা খুঁজতাছিলাম। চাইর হারামজাদরে রাখছি—চারডারেই তাড়াইছি। হালারা সব চোর! বুঝলা না বাবা, পিছন ফিরছি কি মুখে ঢুকাইছে খাওন।

বলতে বলতে পানের ডিবা থেকে একখিলি পান নিয়ে নিজেও মুখে দেন তিনি। তারপর সুরু করেন: বাবলুডা হাজার হউক চোর অইবনা, পণ্ডিতের পোলা, আর যা শিখুক চুরি বিদ্যাটা শিখে নাই—না কি কও? ...আরে ক্যা ও নমু? নমুদিদি! আমারে টুক্ চুন দাও সে নমুদিদি!

: আপনাকে তো আগেই বলেছি মজুমদার মশাই। ওকে আমরা লেখা-পড়া শেখাব। চাকরি করতে দেবনা।

: আরে দাদু কও তো ভালই—কিন্তু পারতেইটা কই ? কোনও কাজ কামের মধ্যে ঢুকায়ে দাও। বদমাইসিডা কমব। তাছাড়া দু পয়সা রুজগারও হইব সংসারে। পাচডাটাকা মাস মাস তাই বা আয়ে কুখিক্যা ?

ঘরের হাল্‌তো দ্যাখতেছ ? .বুইনগুলার বিয়া দ্যাওন লাগবো। নমুর দিকে তো চক্ষু তুল্যা চাওন যায়না। ···আরে এ্যাই যে চুন আনছ দেহি !

নমিতা চুনের পাত্রটা হাতে প্রবেশ করেছে একটু আগেই। বিষ্টুপদ সেটি গ্রহণ করেনা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে একবার চেটে নেয়। নমিতা চূণের পাত্রটা নামিয়ে রেখে চলে যায়।

ঃ হ্যাঁ কি জান্‌ কইৎছিলাম ? নাকি চাওন যায় না ! তারপর ধর গিয়া রুজগারের পথ দেখাইলেও যুদি না লও তোমরা, তখন ত ফ্রি র‍্যাশন মিলব না ! টারভেসান তো সবার জুন্তি নয় !

হাসে অনিমেষ—পাণ্ডুর হাসি। বিষ্টুপদ প্যাঁচ কষছে। কলোনীতে যারা বেকার—কোন রোজগারের ব্যবস্থাই যারা ক'রে উঠতে পারেনি, সেই সব দুঃস্থ পরিবারকে স্টারভেশন ডোল দেবার ব্যবস্থা আছে। র‍্যাশান কার্ড বিলি করেন 'আর. ও'-সাহেব। তিনি সরকারি কর্মচারি। তবে কে কার্ড পাবে কে পাবেনা এটা স্থির করেন তিনি ব্লক-সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। ব্লক-সেক্রেটারিরা কলোনীরই লোক। কিছুটা স্বায়ত্ব-শাসন দেওয়া হ'য়েছে আর কি। তাই ব্লক-সেক্রেটারি দরখাস্তগুলি নিয়ে তদন্ত ক'রে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিচার করা হয় কোনও পরিবার ফ্রি র‍্যাশন পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কিনা। বিষ্টুপদ ইচ্ছা করলে এঁদের ফ্রি র‍্যাশন পাবার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে পারে। সেই ইঙ্গিতই যে সে করছে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না অনিমেষের। নিরুদ্ধ আক্রোশে সে ফুলতে থাকে। সে বুঝে নিয়েছে বিষ্টুপদর কারসাজি। অল্প মাহিনায় বিশ্বস্ত একটি ছোকরা চাকর পাওয়ার লোভে এই প্যাঁচ কষছে।

বিষ্টুপদর উদ্দেশ্য কিন্তু আরও গভীর। সে চায় এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে। তার শ্বাপদ চক্ষুর দৃষ্টি ফিরছিল ওপাশের ছেঁচা বেড়ার ঘরখানির আশে পাশে। অসংবৃত বসনে যেখানে ঘরকন্নার কাজ করছে কামিনী। ডি-ব্লকের টিউব-ওয়েলটা জয়হিন্দ কেবিনের ঠিক উল্টো দিকেই। চায়ের

দোকানে বসেই বিষ্টুপদ লক্ষ্য করে পাড়ার মেয়েদের জল নেওয়া। কামিনীর সঙ্গে কয়েকবার তার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। মেয়েটার যে বয়স হয়েছে তা যেন বোঝাই যায় না। বছর চব্বিশ পঁচিশের কম হবে না। এক ছেলের মা। কিন্তু হ'লে কি হ'বে, মেয়েটার একটা অদ্ভুত আকর্ষনী শক্তি আছে। পাড়ার অনূঢ়া ষোড়শী অষ্টাদশীদের কাউকে দেখতে তো বাকি নেই তার। ডলি, শেফালী, সরমা, নমিতা,—সবাইকেই তো দেখে ওখানে বসে, কিন্তু এক ছেলের মা এই মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারে কেউ? রঙটা শ্যামবর্ণ নয়, কালোই। তা হ'ক, স্বাস্থ্য কিন্তু তার অটুট। আজ মাসখানেক মেয়েটা জল নিতে আসছে না কল থেকে। বাবলুটাকে দোকানে ঢোকাতে পারলে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। গরজটা বিষ্টুপদর তাই বড় বালাই হয়ে পড়েছে। বাংলা উপন্যাস যথেষ্ট পড়া আছে বিষ্টুপদর। কণ্ঠস্থ আছে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রসস্থ অনুচ্ছেদ। পরকীয়া প্রেম অসিদ্ধ—হিঁদুঘরের কেউ এ অনাচার সহ্য করবেনা! অন্তত বিষ্টুপদর তাই ধারণা।

অনিমেষ ধীরে ধীরে বলে : ও কথাটা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বিষ্টুবাবু। এ বাড়িতে কেউ উপার্জনক্ষম নেই ব'লে আমরা স্টারভেশন ডোলপাই। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের ওটা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এটা আমার মনে আছে!

: আরে কি কও! সব কথারই তুমি বাঁকা অর্থ লও দেহি। তোমাগো ভালবাসি তাই না টারভেসন ব্যবস্থা কর্‌ল্যা দিছি। ...আরে এ ছিছি চুণ বেশী লইয়া লিছি দেহি। মুখ একেরে পুড়্যা গেছে। আরে অ নমু! কই গেল এ্যারা? বৌমা, অ বৌমা!

অসহায় অনিমেষ বক্র দৃষ্টি মেখে শুয়ে থাকে। ঘরে এসে ঢোকে নতু। বছর পনের বয়স। বাড়ন্ত চেহারা নয়—আজও ফ্রক পরে। চোখে মুখে কথা ফোটে তার। সংসারের কোন কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। এসেই বলে : কি হ'য়েছে দাদুর? চুণে মুখ পুড়েছে বুঝি!

: হু!

লতু খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে!

: আরে অই! হাস্‌তেছ ক্যান?

: চুণে কি আপনার মুখ পুড়েছে? পুড়েছে অন্য কিছুতে?

: কি কও?

: কই কি যে চুণেও মুখ পোড়েনা—কালিতেও মুখ পোড়েনা। এমন কি চুণ কালি একসঙ্গে মুখে পড়লেও অনেক নির্লজ্জের মুখ কিছুতেই পুড়তে চায়না কিনা!

অনিমেষ ধমক দিয়ে ওঠে: কি হ'চ্ছে—এই লতু!

: তা তুমি রাগ করলে কি হ'বে। দাদু আমাদের রসিকতা ঠিকই বোঝে—না দাদু? তা জল দেবো? মুখটা ধুয়ে ফেলবে? এখন জলই চাও—চুণ-কালি যা চাও সব জোগাড় দেব আমি! দিদিও আসবেনা—বৌদিও না!

: তুই যা বলছি—যা এখান থেকে! ধমকে ওঠে অনিমেষ। হাস্‌তে হাস্‌তে লতু চলে যায়।

মুখখানা কালি ক'রে ব'সে থাকে বিষ্টুপদ। তারপর হঠাৎ হেসে সে লঘু করে ব্যাপারটা: আরে লতুর কথা ধর ক্যান্। এ্যাক্কেরে পোলাপান! তা যাউক! কাল থিকা বাবলুরে দুকানে পাঠাইবা তো?

হরিপদ পণ্ডিত ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন। সমস্ত শরীরটা তাঁর ভিজে গেছে। বৃষ্টির জলে না ঘামে তা তিনিই জানেন। উত্তেজনায় পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বিষ্টুপদর প্রস্তাবটা কানে গিয়েছিল তাঁর। তাই উঠান থেকেই বল্লেন: না!

: না? না—ক্যান?

: কারণ ব্রাহ্মণের ছেলে কোন জন্মে শূদ্রের দোকানে চাকরের কাজ করে না তাই।

: অ;—বুঝছি। তা বামুন ঠাকুরের ভিক্ষার অন্ন তো মিষ্ট লাগবই।

বামুনের ব্যবসাই যে ভিক্ষা। অখন আমার টাহাডা দিয়া জান আমি চইল্যা যাই।

: টাকা? কিসের টাকা?

বিষ্টুপদ পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার ক'রে মেলে ধরে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। এগারো বছরের বাবলুর আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা, "দশটাকা ধার হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম। বাবলু।"

প্রথমটা বাক্যস্ফূর্তি হয়না কারও। অনিমেষ সামলে নেয় নিজেকে। বলে: আপনি ছেলেমানুষ নন বিষ্টুবাবু। এগারো বছরের ছেলের যে হাতচিঠি দিয়ে টাকা ধার করার অধিকার নেই—আর নিলেও যে তার জন্য তার বাবা দাদা দায়ী হয় না—এ সহজে কথাটা আপনার জানা উচিত।

: আপনারা টাহা দিবান না?

: না! একবার নয়—একশ'বার না! অনিমেষ উত্তেজিত। হরিপদ নীরব।

: বেশ অখন আর আমারে দুষবান না। আমি আদায় করবাম!

: আদায় করতে পারেন করবেন। গায়ের জামাকাপড় খুলে নিতে পারেন। ধার সে শোধ দেবে কেমন করে?

হাহা করে হাসে বিষ্টুপদ।

: টাহা আদায়ের ফন্দিও কিছু জানা আছে দাদু! উগুলের কথা না ভাইব্যা টাহা দি' নাই! আচ্ছা চলি!

ভিজা ছাতাটা তুলে নিয়ে বিষ্টুপদ রওনা দেয়। দৃঢ় পদক্ষেপ তার। সে পদক্ষেপে টাকা আদায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে ব'লে মনে হয় না। অনিমেষ বিস্মিত হয়। হরিপদের বোধহয় বিস্মিত হবার মতোও মানসিক অবস্থা নেই। বিন্দুবাসিনী বলেন: বাবলু টাকা ধার করেছে? এক-আধ নয় দশটাকা? আজ আসুক ছেলে ঘরে।

কেউ সে কথার জবাব দেয় না।

বিষ্টুপদ ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার আগেই কে তাকে ডাকে পিছন থেকে : শুনুন!

অনতিদূরে কামিনী! আশ্চর্য! যে মেয়েটা তাকে দেখলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, ভুলেও মুখ তুলে তাকায় না,—সেই আজ তাকে পিছন থেকে ডাকছে! বিষ্টুপদ ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ায়। একটু পিছিয়ে দাঁড়ায় কামিনী।

: বাবলুকে কিছু বলবেন না—সে আপনার টাকা ফেরত দেবে।

কি কও! আজ দেড় মাস হয়্যা গেছে এক পয়সা দেয় নাই—এ্যারে আর বিশ্বাস কি?

: আমি কথা দিচ্ছি। আমি আপনার টাকা শোধ দেব।

: তুমি? তুমি কই পাইবা?

: সে কথা যাক। আপনি কথা দিন বাবলুকে মারধর করবেন না। হঠাৎ খুশীতে হাসি উথলে ওঠে বিষ্টুপদর সর্পচক্ষুতে। এ ব্যাপার তো আশা করা যায়নি। এ যে গাছে না উঠ্‌তেই এককাঁদি! ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বিষ্টুপদ : এডা কি কও, তুমি দিবা টাহা আর তাই আমি হাত পাইত্যা নিবাম?

কামিনী সতর্ক হ'য়ে স'রে দাঁড়ায়।

: তুমি ভরসা দিলি আর আমার ভয়ডা কি?

কামিনী এবারও নিরুত্তর।

: জল আনবার যাওনা দেহি—ক্যারে? বিষ্টুপদ একেবারে বিগলিত। কামিনী একটা কঠিন জবাব দেবার আগেই পিছন থেকে ডাক শোনে : বৌমা!

তিন পা পিছিয়ে দাড়ায় বিষ্টুপদ। বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন। দ্রুতপদে বিষ্টুপদ গলিটা পার হয়ে যায়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।

: অনেক সহ্য করেছি বৌমা—অনেক নিচে নেমে গেছি আমরা! শেষ আঘাতটা বোধহয় তোমার হাতেই পাওনা ছিল! ছিঃ!

কামিনী শিউরে ওঠে! এ কী কথা—আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যায় : এ কি বলছেন আপনি! মা, আমি আমি—কথাটা শেষ করতে পারেনা।

: ঠিকই বলছি বৌমা। বলবারও আর কিছু নেই তোমার—বুঝবারও বাকি নেই কিছু আমার। কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথা নয়। দ্বিতীয়বার যেন এ দৃশ্য আমাকে না দেখতে হয়। দ্রুতপদে বিন্দুবাসিনী ফিরে যান বাড়ির দিকে।

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে কামিনী। মৃণ্ময়ী মূর্তি। কিসের থেকে কি হ'য়ে গেল—যেন বুঝতেই পারেনা।

কথা হচ্ছিল নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায়।

যোগেন নায়েক বল্লে: যে যাই বলুক ঠাকুর্দা, আমার মত আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখা।

ঠাকুর্দা অর্থাৎ বৃদ্ধ নিতাই কবিরাজ জবাব দেন না। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে টুলের উপর উবু হ'য়ে বসে নিমীলিত লোচনে বিড়ি টেনে চলেন। জবাব দেয় প্রমোদ পাল। বলে: কি ভাবে চেষ্টা করতে চাও তুমি?

: সেই সনাতন পদ্ধতিতে। চল সবাই মিলে গিয়ে দরবার করি ডি. এম্. এর সাথে। হয় কাজ দাও, নয় ডোল দাও—নয় ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে শেষ ক'রে দাও আমাদের। তোমরাও বাঁচ, আমরাও বাঁচি।

ভূষণ বলে: এ গান তো গাওয়া হ'য়ে গেছে বাবা। বারবার একটি কেত্তন কি ভালো লাগবে ওঁদের?

: তা ছাড়া আর কি করা যায় বল'? আমরা কি সখ ক'রে এককথা বারবার বলি? সেবার বলেছিলাম, ওঁরা কায়দা ক'রে ফিরিয়ে দিলেন আমাদের। মনে ভাবলাম—বুঝি ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। তাই আবার একই সুরে গাওনা সুরু করতে চাইছি।

বিড়িটাতে একটা অন্তিম টান দিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দেন ঠাকুর্দা। গুছিয়ে বসে বলেন: ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ যোগেন। সেবার আমরা সবাই এক রা কেটেছিলাম। বুড়ো বাচ্ছা মায় ঘরের বউ পর্যন্ত গলা মিলিয়ে হেঁকে

ছিল কাজ দাও ব'লে। এবার আমাদের দল ভেঙ্গে গেছে! সেবার যারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবার তারাই দাঁড়িয়েছে আমাদের বাধা হ'য়ে। কলোনীরই লোক তারা এবং বেশ ক্ষমতাশালীই। তারা আমাদের বিপক্ষে যাবে।

প্রমোদ বলে : ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল! সত্যিই এবার আমরা কিছুতেই এক হ'তে পারব না।

ঠাকুরদা বলেন : আর তাছাড়া মনে ক'রে দেখ সেবারকার কষ্টটা। এবার অনেকেই যা হ'ক ক'রে খাচ্ছে। তারা কেন সে কষ্ট সহ্য করতে যাবে? কষ্টটাও তো কম নয়? বলি সেবারকার কথা ভুলে গেলে নাকি সব? কি হে যোগেন মনে পড়ে? ভূষণ?

লোকগুলি জবাব দেয় না। দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? না কি মুখে স্বীকার না করলেই মুছে যাবে সেদিনের স্মৃতি মন থেকে।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

কলোনীতে তখন নতুন এসে বসেছে উদ্বাস্তরা। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পের নরকবাস যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন এই লোকগুলো স্বপ্ন দেখতো পুনর্বাসনের। পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ক্যাম্পে এদের ছিলনা কোন মানবিক সংজ্ঞা। সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছিল মিলিটারীদের তৈরী বড় বড় গুদাম ঘরে। সেখানে থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল এরা। সেখানে ওদের না ছিল কোন সামাজিক বন্ধন, না মানবিক মর্যাদা। শেয়ালদ' হাওড়া স্টেশনের জনপ্রবাহের মধ্যে মাদুরটাকে উঁচু ক'রে ধরে ছেলে কোলে ব'সে থাকতো ওরা। কখনও রাত কাটতো গাছের তলায়, কখনও দেড় হাত উঁচু তাঁবুর মধ্যে। লরী বোঝাই ক'রে হয়তো নিয়ে গিয়ে তুলতো কোনও পি. এল ক্যাম্পে। গোলাকৃতি লাহোর সেডের অন্ধকূপে আশ্রয় পেত নতুন ক'রে। সেখানে ওদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌তো। মাথার উপর একখানা নিজস্ব চালার জন্য লোকগুলো উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। 'যাবৎ

জীবেৎ ভোল ভক্ষেৎ’ এই অপূর্ব ব্যবস্থাটা সকলে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। যারা ওটা মেনে নিতে পারলো তারা মানবজীবনের চরম মোক্ষলাভ করলো সন্দেহ নেই। তারা হ’য়ে উঠলো দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। যাকে ব’লে একেবারে স্থিতপ্রজ্ঞ। রোজগারের ধান্দা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, সপ্তাহান্তে ডোলটি নিয়ে এসে বাকি সময় ভগবান অথবা সরকারকে গাল পাড়া। দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর যারা এ স্বর্গে বাস করেছে তাদের ইহকাল তো বটেই পরকালটিও বোধকরি ঝরঝরে হ’য়ে গেল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিতে পারেনা। অনেকে বিদ্রোহ করে। তারা চায় পুনর্বাসন। মানুষের মতো বাঁচতে। তারা যখন শুনলো যে সরকার পাঁচ কাঠা ক’রে জমি দেবে, বাড়ি করবার জন্য ঋণ দেবে—তখন যেন ওরা হাতে স্বর্গ পেল। মনে হ’ল জীবনের এই একমাত্র কাম্য। পায়ের নীচে এক মুঠো নিজস্ব জমি,—যেখানে লাউ কুমড়ো-শাক-আলু-বিলাতি বেগুন লাগাতে পারবে। মাথার উপর একটা নিজস্ব ছাদ—যেটাকে ‘আমার বাড়ি’ ব’লে পরিচয় দেওয়া যাবে। লোকগুলো ছুটে এলো পুনর্বসতির লোভে। বাড়ি তৈরী করার প্রথম ইন্সটলমেণ্ট-ঋণ এলো। কিছুটা খরচ হ’ল অবুঝ পোড়া পেটের চাহিদা মেটাতে—কিছু সত্যিই বাড়ি তৈরী করতে। এমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে ওদের প্রায় সকলেই মাথা গোঁজার একটা ক’রে আশ্রয় খাড়া করল। এতদিনে সত্যিই তাহ’লে হ’ল বাড়ি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

এবার দেখা দিল আসল সমস্যা! দশ-পনের-হাজার লোক এসে বসেছে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে। মাঠ হয়েছে জনপদ—উদয় নগর উদ্বাস্তু কলোনী! কিন্তু রোজগার কই? খাবো কি? বাজারে দোকান দিল কেউ—কিন্তু কিনবে কে? ক্রেতা কই? জংসনের মহাজনের কাছ থেকে ভাড়া খাটবে বলে সাইকেল রিক্সা নিয়ে এলো কেউ—কিন্তু চড়বে কে? সকলেই বলে কাজ দাও; কাজ নাও বলবার মতো উদ্বৃত্ত পয়সা নেই কারও হাতে।

ব'সে খেলে কুবেরেরও ধন ফুরায়। গৃহ-নির্মাণ ঋণের উদ্বৃত্ত অর্থ আর কতটুকু? প্রথমে আবেদন নিবেদন। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে লাগলেন। পরিকল্পনা করতে সময় লাগবে। 'পরিসংখ্যান' সংগ্রহ করতেই বছর ঘুরে যায়! কিন্তু অভাব, অসুখ আর মৃত্যু তো সময়ের জন্য বসে থাকবেনা। মৃত্যু প্রবেশ করল কলোনীতে।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। খাবো কি? রোজগার কই? ধীরে ধীরে গড়া বাড়ি খুলে ফেল্‌লে—তিলে তিলে বিক্রয় হয়ে গেল সব। জানালা দরজা-করোগেটটিন-সিমেন্টেরবোরা-ইঁট। কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে কতক ফিরে গেল পি এল ক্যাম্পের ভূস্বর্গে। যারা রইল তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো অনশন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। প্রথমে অসুখ। এ বাড়ি ও বাড়ি লোকে জ্বরে পড়লো। যুঝলে কিছুদিন কেউ বা—তারপর সরে গেল দুনিয়া থেকে। কাঁদলে পরিজনবর্গ অন্নের একজন ভাগীদার কমে যাওয়ার সৌভাগ্য সত্ত্বেও! কর্তৃপক্ষ বিচলিত হ'লেন। এত অসুখ বিসুখ হ'চ্ছে কেন? দ্রুতগতিতে এসে পৌছালো এক মোবাইল মেডিক্যাল য়ুনিট।

অষুধ দেবে কি? এদের একমাত্র অসুখ অনাহার। পথ্য চাই। ডাক্তার ছিলেন একটু ছিট গ্রস্ত মানুষ। সিবিল সার্জেন জানতে চাইলেন কি কি অষুধ চাই তার ফর্দ। ডাক্তার জবাব দিলে—সপ্তাহে এক ওয়াগন চাল!

বদলি হয়ে গেল পাগলা ডাক্তার!

সরকারি পরিকল্পনার আগেই মহাকালের স্কীম রূপায়িত হল একের পর এক। এল অভাব, অসুখ, মৃত্যু, মহামারী! গ্রহণের পূর্বে ধূসর বর্ণের ছায়াপাতে যেমন করে ম্লান হ'য়ে যায় চন্দ্রহাস তেমনি করেই লোকগুলোর নতুন-বসতি-পাওয়া আনন্দ পূর্ণিমার উপর প্রথমেই হল অনাহার মৃত্যুর করাল ছায়াপাত। আকাশের বুক থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারে নেমে আসে শকুনের দল। হাতি পোতার বিল কলোনীর দিকে হাত বাড়ায়। কলোনীর কাছে পিঠে নদী নেই। ওটাই শ্মশান!

যে ভগবানের কথা মনে হ'ত দেশে থাকতে দাঙ্গার সময় মধ্যরাত্রে অজুর

আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠতে দেখলে—যে ভগবানের কথা মনে পড়েছিল পার্টিসানের পর দেশ ছেড়ে রওনা দেবার সময়, যে ভগবানের নাম মনে পড়েছিল শেয়ালদ' স্টেশনে অনাহার মৃত্যুতে মুখোমুখী দেখে—তার কথাই উঠে পড়ে আবার!

: ভগমান! আর কত দূরে তুমি?

: নাই, নাই! ভগমান নাই! থাহকৃলেও তুমি কানা—তুমি বোবা!

: ছিঃ! ও কথা কওন নাই বাবা। ভগমান দীনের দয়াল!

: কওন নাই? ক্যান কওন নাই? হাজারবার কইবাম। বারো বিঘা নাবি ধানের জমি আছিল। দু জোড়া গাই! আমার খাওনের অভাব। তোমাগো দীনের দয়াল ক্যান আমার এ দশা করল কও? কি অপরাধ করছিলাম আমি?

ও পক্ষ নির্বাক। সেই শাশ্বত চক্রাবর্তন। সুখের দিনে মনে পড়েনা তাঁকে, মনে পড়ে দুঃখরাত্রে। আর দুর্দশা যখন চরম সীমায় এসে মর্মের মাঝখানে বসিয়ে দেয় তীক্ষ্ণশলাকা তখন জেগে ওঠে মনের কালাপাহাড়! 'থাহকৃলেও তুমি কানা তুমি বোবা'।

অসহায় মানুষগুলো জোট বাঁধলো। কাজ চাই। অন্ন চাই! সার বেঁধে ওরা চলল সদরে। যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কিশোর-কিশোরী। সন্তান-বক্ষা সদ্যজননী—মৃতবৎসা নারী। জেলা সমাহর্তার বাড়ি ঘেরাও করল ওরা।

: কি চাই?

: কি চাই! চাই অন্ন-বস্ত্র-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংসার-সদ্ধর্ম-আনন্দ। চাই মানুষের মত বাঁচতে। আপাতত চাই কাজ। শ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন।

একসঙ্গে সবাই চিৎকার করলে কাজ হয় না। দলপতিহীন জনতা তাড়াতাড়ি বেছে নিয়ে পাঠালো পাঁচজনকে ওদের প্রতিনিধি ক'রে। যারা বেশ চালাক-চতুর—দু কথা গুছিয়ে বলতে জানে। গোকুল দাশ, বিষ্টুপদ, নবীন পতিতণ্ডি—আরও দুজনকে। দীর্ঘ আলোচনা হল। দুদিন, তিন দিন।

জনতা বাইরের বাগানে পথের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। সহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ দিলে দুধ, কেউ জল। স্কুল কলেজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মুষ্টি ভিক্ষা তুলে এনে দিলে। তিন দিন ওরা পড়ে রইল জেলা শাসকের বাড়ির আশে পাশে। সেখানেই একজনের মৃত্যু হল। সে মৃত্যু মহান। একই কারণে কলোনীতে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে সে মৃত্যু যন্ত্রণার বোধকরি কোনও তফাৎ ছিল না, কিন্তু মৃত্যু দৃশ্যের তফাৎ ছিল। স্থান মাহাত্ম্যে মৃত ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেল। জেলা শাসকের ফটকের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ভাগ্যবানটি। কেউ বল্লে অনাহাব-জনিত মৃত্যু—কেউ বল্লে উদরাময়। খববের কাগজের রিপোর্টারেরা এসে ফটো তুলে নিয়ে গেল। কাগজে বার হল বিস্তারিত বিবরণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা এই মৃত্যু সংবাদে ছুটে এলেন। যেন এটি হচ্ছিল না ব'লেই এতক্ষণ আসরে নামতে পারছিলেন না তাঁরা। ধর্মঘট পরিচালনাব দায়িত্ব তাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইলেন। এসে পৌছালো কয়েকটি পতাকা আর মাইক। ওরা বলে: এ্যাদ্দিন আছিলেন কই? র'ণ মশয় র'ণ। আমাগো বিচার আমরাই কবমু।

এঁরা বল্লেন: তবে মর বেটারা।

অভিশম্পাত সত্ত্বেও কিন্তু মরল না আর কেউ।

তিনদিন পরে পঞ্চায়েত জানালেন ওদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছেন। অবিলম্বে সুরু হবে টেস্ট রিলিফের কাজ। যারা অশক্ত পঙ্গু তাদের ফ্রি স্টারভেশন ডোল দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

ওরা বলে: রও রও, ব্যাপারটা বুঝ্যা লই।

এরা বলে: আরে ব্যাপার তো সবই বুঝাইবাম। অখন খাওনের বন্দোবস্ত হৈছে খায়্যা লও!

এরপর আর কথা চলে না। লপ্‌সি প্রস্তুত। চাল ডাল মিশ্রিত খিচুরী। সারি সারি ওরা বসে যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। ধর্মঘট প্রত্যাহারের সর্তগুলির আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকে। অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালগুলোর

অনেকেই পরিমাণের অতিরিক্ত আহার ক'রে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ওরা ফিরে আসে।

সুরু হয় টেস্ট-রিলিফের কাজ। মাটি কাটার কাজ। পাঁচটি ব্লকে বিভক্ত করা হ'ল কলোনীকে। এ, বি, সি, ডি, ই। পাঁচজন সেক্রেটারি তার। ওরাই যাদের মনোনয়ন করে পাঠিয়েছিল তারাই। সেই গোকুল বিষ্টু নবীন!

ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর—তিনি রেকমেণ্ড করলে পেতেও পার স্টারভেশন ডোল। ট্রাকে ক'রে বড় বড় ড্রাম এসে পৌঁছালো—গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পীসবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গায়ে লেখা আমেরিকার দেশবাসীরা এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারিরা অনুগ্রহ করেন। র‍্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায়; কিছু পায় ডোল ফ্রি র‍্যাশান। গোকুলদাস পায় কয়লার ডিপো খোলার অনুমতি—বিষ্টুর জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে—নবীন পতিতুন্ডি মহাজনী ব্যবসা সুরু করেন। এঁরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হলনা কারও।

সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? নাকি মুখে স্বীকার না করলেই সেদিনের স্মৃতি মুছে যাবে মন থেকে? লোকগুলো নীরবে বসে থাকে।

নিতাই কবিরাজ তাই আবার বলেন: তাই ব'লছিলাম প্রমোদ, দল বেঁধে যদি দরবার করতে যেতে চাও তবে কী তোমাদের দাবী তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।

: দাবী আর কি? দাবী কাজ। টেস্ট-রিলিফের কাজ তো আজ দু বছর বন্ধ। তা ছাড়া আমরা চাই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। আমরা চেঁচামেচি করব আর ওঁরা দু এক মাসের টেস্ট-রিলিফ করবেন তা চলবে না।

: বুঝলাম। তা স্থায়ী ব্যবস্থাটা কি রকম হ'বে?

: সেটা আমরা কেন বলব? সরকার বলবে। আমাদের এখানে একটা কারখানা হ'তে পারে। কাপড়ের মিল, চিনির কল, কাগজের

কারখানা। কি সম্ভবপর তা সরকারি বিশেষজ্ঞেরা বলুক। তাতেই তিন চার হাজার লোক কাজ পেতে পারে। তাছাড়া ধরুন ঠাকুর্দা, আমাদের মধ্যে ছুতোর আছে—কামার আছে—তাঁতি আছে; তাদের দিয়ে একটা কোয়াপারেটিভ হ'তে পারে। আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিক— মজুরী দিক্।

ঠাকুর্দা হাসেন: কিছু মনে করিসনা ভূষণ, কিন্তু কোয়াপারেটিভের সেক্রেটারি করবি কাকে? টাকাটা কাকে নাড়াচাড়া করতে দিবি?

আপনিই বিবেচনা ক'রে বলুন। যাকে সবাই মিলে বিশ্বাস ক'রে দেবে তাকেই। আপনি ভার নিতে চান আপনাকেই দেব। তবে তহবিল তছরূপ হ'লে আমরা থানা পুলিশ করতে পারবনা। স্রেফ মাথা ফাটিয়ে হাতি পোতায় পুঁতে দিয়ে আসব। হাতি পোতা কলোনীর অদূরবর্তী জলাটা। সেইটাই কলোনীর শ্মশান।

: কিন্তু তোদের হ'য়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে কে? সবাই একবাক্যে বলে: তুমি ঠাকুর্দা, তুমি।

নিতাই কবিরাজ আর একটা বিড়ি ধরান: কোন অধিকারে? আমি তো কলোনী পঞ্চায়েতের কেউ নই?

ওরা আবার বলে: আমরা তোমাকে নির্বাচিত করলাম কলোনীর পক্ষ থেকে। পঞ্চায়েতকে আমরা মানিনা।

ঠাকুর্দা আবার একই প্রশ্ন করেন: কোন অধিকারে?

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ঠাকুর্দা বুঝিয়ে বলেন: বাপুহে, গোটা কলোনীর দশ-পনের হাজার লোকের পক্ষ থেকে আমাকে নির্বাচন করার অধিকারটা তোমরা পেলে কোথা থেকে?

ভূষণ রায় অত ঘোরপ্যাচ ভালবাসেনা। বলে: ওসব বুঝিনা ঠাকুর্দা। তাহলে তুমি বল কি করতে হ'বে?

: আমি বলি এরকম হঠাৎ কিছু করাটা ঠিক নয়। কথাবার্তা যে বলতে যাবে সে একজন সর্ববাদিসম্মত নেতা হওয়া চাই। সরকারকে বুঝিয়ে দিতে

হ'বে যে, যে পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়েত গড়া হ'য়েছে তাদের উপর আমাদের আস্থা নেই।

: আমরাও তো তাই বলছি—তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বল'।

: না! আমাকে যদি সবাই পাঠায় তবেই আমি যাবো। তোমাদের কথায় নয়। তোমরা বরং প্রত্যেক ব্লকে গিয়ে ব'লে এস। একটা নির্দিষ্ট দিনে সবাই জমায়েত হ'ক। সেখানে ওদের পাঁচজনকেও নিমন্ত্রণ করব আমরা। আমাদের অভাব অভিযোগ আমরা পেশ করব। ওরা পাঁচজন ইচ্ছা করলে জবাবদিহি করতে পারে। সে সুযোগ দেব আমরা। তারপর সেই সভাতেই আমরা তিনজনকে মনোনীত করব। তারা তিনজন কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাবে আমাদের অভাব অভিযোগ। তাহলে আর কারও আপত্তি হ'তে পারে না।

ভূষণ উৎসাহে ঠাকুরর্দার পায়ের ধূলোই নিয়ে ফেলে, বলে: তবে শুভস্য শীঘ্রং ঠাকুর্দা। আজ বিকালেই সভা হক।

: না আজ বিষু-দ্-বার, তায় অমাবস্যা। আজ নয়। রবিবারে, রবিবার বিকাল পাঁচটায়—খেলার মাঠে।

ওরা তাতেই রাজি।

মনে মনে হাসে ভূষণ। ই-ব্লকের ভূষণ রায়। ঠাকুর্দাকে ওরা সবাই মেনে চলে। আর ঠাকুর্দা মেনে চলেন পাঁজির আদেশ, হাঁচি টিক্‌টিকির নির্দেশ! বিংশশতাব্দীর জননেতা হবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর্দা রয়ে গেছেন উনবিংশ শতাব্দীর মনোবৃত্তি নিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই জেলে জেলে কেটেছে। গঠনমূলক কাজে ছিলেন চিরকালই। মহাত্মাজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন তিনি। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, একমাথা রুক্ষ চুল—গায়ে একটা এণ্ডির চাদর, চোখে নিকেলের চশমা। স্কুলে পড়বার সুযোগ পান নি। তবে দীর্ঘদিন রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সহবন্দীদের সাহচর্যে পড়াশুনাটা করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি-সমাজনীতি সম্বন্ধে পড়াশুনা করলে কি হ'বে—পৈত্রিক কবিরাজীতেই তাঁর বিশ্বাস বেশী—এ্যালোপ্যাথির চেয়ে। দশহাজার লোকের

নেতৃত্ব দেবার আহ্বান এসে পৌঁচেছে যাঁর কাছে তিনি বিচার করতে বসেছেন তিথি আর বার! তবু ভূষণ ওঁকেই নেতা বলে মেনে নেয়। মেনে নেয় প্রমোদ, কানাই, যোগেন। ওরা জানে,—পারলে এই হাঁচি টিকটিকি-অশ্লেষা-মঘা বিজড়িত ঠাকুর্দাই পারবে এই দশ পনের হাজার লোককে লক্ষ্যে পৌছে দিতে। লোকটাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালবাসে। আর যাই হ'ক মানুষটা খাঁটি। একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি। রাজনীতির মধ্যে এমন খাঁটি মানুষ দিয়ে কারবার চালান মুশ্‌কিল। পাকা সোনা দিয়ে যেমন গহনা গড়ানো চলে না —একটু খাদ মেশাতেই হয়—আত্যন্ত খাঁটি মানুষ দিয়েও তেমনি রাজনীতি চলে না। একটু শঠতার খাদ না মেশালে প্রতিপক্ষকে বাগে আনা যায় না— ভূষণ এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই দশ পনের হাজার লোকের নেতৃত্ব দেওয়ার মত ক্ষমতাশালী একচ্ছত্র·নেতাই বা কোথায় পাওয়া যায়? ভূষণ, কানাই, যোগেন প্রভৃতি নব্যপন্থীরা তাই ঠাকুর্দার হাতেই তুলে দিতে চায়—সে গুরু দায়িত্ব।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠ্‌ছে। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। অনিমেষ ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে গোরাও। সন্তর্পণে দ্বার খুলে বার হ'য়ে আসে কামিনী। পূব আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হ'য়ে আসছে। হিম হিম একটা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বারান্দার একটা কোণায় কোঁচার খুঁটে আপাদমস্তক ঢেকে মাদুরের উপর ঘুমাচ্ছে বাবলু। কামিনী লণ্ঠনটা জ্বালে। চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। তালা খুলে ভিতরে ঢোকে। কুলুঙ্গির উপর থেকে একটা টিনের কৌটা বার করে। সেটি বার করার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় কোন গোপন জিনিস। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। আবার কি মনে করে ফিরে যায়। একটা মুখ ঢাকা হাঁড়ির ভিতর থেকে বার করে গোটা চারেক মোয়া। আঁচলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শিকল তুলে দেয় রান্নাঘরে। তারপর ঠেলে তোলে বাবলুকে।

ঘুমের চোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বাবলু : দিদিরা উঠেছে ?

: না কেউ ওঠেনি। এই নে—টিনের বাক্সটা দেয় ওর হাতে। বাব্‌লু উঠে বসে।

: এগুলোও নিয়ে যা—মোয়াগুলো দেয় ওর চাদরে ঢেলে। বলে : একটা সতেরোর লোকাল চলে গেলে খিড়কির দোরে আসিস্।

বাব্‌লু হাসে। চুরি করার আনন্দে দুষ্টু ছেলেরা যেভাবে হাসে! এ যেন একটা ভারি মজার খেলা! দুজনে যায় দরজার কাছ পর্যন্ত। খিড়কি খুলে বাব্‌লু বেরিয়ে যায়। কামিনী ডাকে : শোন! চলতি ট্রেনে ওঠানামা করবি না কখনও। আমার মাথার দিব্যি দেওয়া আছে—মনে থাকে যেন। আর শোন, ফেরার পথে বিষ্টু দোকানীকে গোটাদুই টাকা দিয়ে আসিস্।

বাব্‌লু ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। রাস্তার টিউব-ওয়েলে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। কামিনী ওর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে

: বৌদি!

: কে? পিছন ফিরে কামিনী দেখে নমিতা উঠে এসেছে।

: কথা বলছিলে কার সঙ্গে?

বাব্‌লুর মুখ ধোওয়া শেষ হয় না। একছুটে অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। কামিনী বলে : কই না তো?

: কই না তো! এই যে গোটা দুই টাকার কথা কি বলছিলে কাকে! কামিনী ইতস্তত ক'রে বলে : তোমরা সবাই দেখি কান শুনতে ধান শোন!

: তা কানই হ'ক আর ধানই হ'ক, কথা বলছিলে তো? কার সঙ্গে? কামিনী ওর কৌতূহল দেখে কৌতুক বোধ করে। বলে : ভূতের সঙ্গে!

গম্ভীর হয়ে যায় নমিতা।

অচল সংসারটিকে কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা কামিনীর। সংসারের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গভীর রাত্রে সে চিড়ে ভাজে। চীনাবাদাম মটরভাজা মিশিয়ে পাতলা টিস্যু-পেপারে মুড়ে রেখে

দেয়। সকালবেলা বাবলু সেগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের কামরায় কামরায় ফেরি করে : উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সাড়ে-চার-ভাজা। টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। এক প্যাকেট এক আনা, তিনটে দু আনা।

কথাটা গোপন থাকে দেবর-বৌদির মধ্যেই। ওরা জানে এটা বাড়ির কেউই অনুমোদন করবে না। কি করে করবে? বাব্‌লু করবে চানাচুর ফেরি? ওর লেখাপড়া হবে না? অসম্ভব। সকালবেলা বাব্‌লু রওনা হয়ে যায়। কামিনী সংসারের কাজে ডুবে যায়। ওর মনটা পিষতে থাকে লোকাল ট্রেনের চাকায়। কর্মব্যস্ত ঘন্টাগুলোর মধ্যে অবসর পেলেই মনে মনে বলে : ঠাকুর! তুমি ওকে দেখ! ঐটুকু ছেলে! বিপদ আপদে তুমিই রক্ষা ক'র ঠাকুর।

বেলা বাড়তে থাকে।

বাব্‌লু ওদিকে পৌছে যায় তার কর্মস্থলে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভর্তি লোকাল ট্রেণের কামরা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে টিস্যু-পেপারে মোড়া কয়েকটি প্যাকেট হাতে নিয়ে আর অন্য হাতে জানালার গরাদ ধরে ধরে বাব্‌লু চলন্ত কামরার বাইরে দিয়ে এঘর ওঘর করে।

: উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সাড়ে-চার-ভাজা। টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি। বাব্‌লুর এ ব্যবসাও নিরঙ্কুশ নয়। দুরন্ত প্রতিযোগিতা চলে এ ব্যবসায়ে। আরও চার পাঁচ জন হকার ফেরি করে। রোজই তারা বিক্রি করে এই ট্রেণগুলিতে। ওরা বরদাস্ত করতে চায় না এই নবাগত নাবালকটিকে। এরা জানে ডেলি প্যাসেঞ্জারের একটা ক্ষুদ্রতম অংশই কেনে খুচরা পয়সার সওদা চলন্ত ট্রেণের কামরায়। তার জন্যে নতুন ভাগিদার ওরা কিছুতেই মেনে নেবে না।

লোকগুলো কি নির্বিকার! ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেও ওদের মনটা দ্রব হয় না। নেড়াদা বক্‌তে থাকে

: আপনার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মনে হচ্ছে কে যেন রগের দুটো পাশ চেপে ধরে আছে। অথবা পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে। কিম্বা

শরীরের কোন অংশে এমন বেদনা হ'চ্ছে যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগছে আপনার মনে—এ অবস্থায় আপনি একটি বড়ি জল দিয়ে খেয়ে ফেলুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শান্ত হ'য়ে যাবে।

লোকগুলো নির্বিকার ভাবে বসে থাকে। নেড়া থামতেই বাব্লু সুরু করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর মাথায় এক প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসে আর একজন হকার। মর্টনের লজেন্স ফিরি করছিল সে। হেঁকে ওঠে: বিখ্যাত মর্টন কোম্পানীর আনারসের লজেন্স!

বাব্লু মার খেয়ে হজম করতে চায় না। প্রতিবাদ করে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে ওপাশ থেকে আরও দুজন হকার। মশলামুড়ি আর হাতকাটা তেল। বাব্লু জানে ওরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। তাই যে কামরায় সে ওঠে সেখানেই ভীড় করে ওঠে ওরা কজন। প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়াবার মতলব। কত মতলবই আছে ওদের! বাব্লুর তো জানতে বাকি নেই কিছু। দুই হকারে মিথ্যা ঝগড়া করে। নিলামের ডাকের মতো ডাকাডাকি করে কমিয়ে দেয় জিনিসের দর। যেন ঝোঁকের মাথায় ভুলে খুব কম দর হেঁকে বসেছে। দু'টাকার জিনিস ছয় আনায় বিক্রি হ'চ্ছে দেখলে গ্রাম্য প্যাসেঞ্জার লোভে পড়ে কিনে ফেলে সে মাল। বাব্লু নেমে যায় পরের স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরাটায়। হাতকাটা-তেল কি একটা ইঙ্গিত করে মশলা-মুড়িকে। মশলা-মুড়িরও বয়স অল্প। বাব্লুর চেয়ে বছর চারেক বড় হ'বে। কলোনীরই ছেলে। ওরা হাসে দুজনে। তারাও নামে সেই স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরায়। বাব্লু সেখানে সবে হাঁকতে সুরু করেছিল। থামিয়ে দেয় মর্টন লজেন্স।

বাব্লু বলে: বারে! আমি যে কামরায় যাবো—তোমরাও সেখানে উঠ্বে।

: চুপ্ বে! বেশী চেল্লালে দেবো ঠেলে লাইনের তলায়। সত্যিই ছোট-খাট একটা ধাক্কা দেয় সে। বাবলুর হাত থেকে পড়ে যায় মোয়া কটা।

একজন বৃদ্ধ যাত্রী বাব্লুকে সমর্থন করে বলেন: তা বাপু তোমরা

ওকে এরকম কেন কর বলত ? আমি তো রোজই এই লোকালে ক'লকাতা যাই, আর পাচটা পঞ্চাশে ফিরি—রোজই দেখি ছেলেটিকে তোমরা উত্যক্ত কর।

মর্টন লজেন্স বলে : ওর লাইসেন্স নেই স্যার। টিকিটও নেই। ঐ দেখুন রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করুন !

বৃদ্ধ ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেন : তোমার লাইসেন্স আছে ?

: আলবৎ !

: কই দেখি ?

: এই দেখুন স্যার ! এ আবার কি রসিকতা। বল্লাম লাইসেন্স আছে ; তা নয় কই দেখি ! এ রকম তো নিয়ম নয় স্যার। আপনি তো রোজই এই ট্রেনে শ্যালদ' যান আর পাঁচটা পঞ্চান্নে ফেরেন। গেটে রোজই দেখি বুক পকেটে হাত চেপে ধরে বলেন মান্থলি। গেট-কীপার কোনদিন বলে কি—কই দেখি ?

ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীকে বলেন—কথায় এদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠ্‌বেন না মশাই !

বাব্‌লু বিষণ্ণ মুখে নেমে যায়।

গাড়ী থেমেছে পরের স্টেশনে।

এদিকেও বেলা বাড়তে থাকে। নমিতা রান্নাঘরের কাজ ক'রে চলে। মুখ তার গম্ভীর। কামিনী গোরাকে তেল মাখাচ্ছে। নাচতে নাচতে ঢুকলো লতু। হাতে তার একখানা চিঠি। নমিতা ডাকে : লতু এদিকে আয় কোথায় বেরিয়েছিলি সাত সকালে ?

: বা রে ! আমি তো এখানেই ছিলাম !

: এখানেই ছিলি ! তখন থেকে যে ডাকছি—মশলাটা বেটে দিতে।

: ও লঙ্কা বাপু আমি বাটতে পারি না। বড় হাত জ্বালা করে।

কামিনী বলে : আমি দিচ্ছি ঠাকুরঝি।

: না থাক্। আমিই ক'রে নিচ্ছি।

নমিতা সরিয়ে দেয় কামিনীকে। ওকে যেন সহ্য করতে পারছে না সে। কামিনী মৃদু আপত্তি জানায়: থাক্ কেন ঠাকুরঝি? দিচ্ছি বেটে আমি—

: আর জ্বালিও না বৌদি। ছেলেকে তোয়াজ করছ তাই কর। আমারই হয়েছে যত খোয়াড়। সকাল থেকে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করলাম—তো বলে এখানেই ছিলাম। সবই ভূতুড়ে কাণ্ড। সবাই ভূতের সঙ্গে কথা বলে এ বাড়িতে।

কামিনী আর কিছু বলে না।

লতু কাছে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে: দিদি?

নমিতা বিরক্ত হ'য়ে বলে: আঃ কি হ'চ্ছে?

: তুই কাকে চিঠি লিখেছিলি রে?

: কী?

: কাকে তুই চিঠি লিখেছিলি রে দিদি?

: চিঠি লিখেছিলাম? কাকে? কই না তো?

: কই না তো? আমি যে দেখলাম—চোখে চশমা, দোহারা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল—তুই তাকে চিঠি লিখছিলি?

নমিতা রেগে ওঠে—কি বক্‌ছিস্ পাগলের মত? নভেল পড়ে পড়ে কি তোর মাথা একেবারে খাওয়া হ'য়ে গেছে? শুধু পাড়ায় পাড়ায় বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে—

: বেশ কাউকে লিখিস নি তো? এটা তবে কি? কে জবাব দিল? লতু একখানা বন্ধ খাম বার ক'রে দেখায়। পড়ে: শ্রীনমিতা চক্রবর্তী, C/o, শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্লট ১১০৭, ডি-ব্লক, উদয় নগর!

নমিতা উঠে আসে বিস্মিত হ'য়ে। লতু লুকিয়ে ফেলে চিঠিখানা।

: তুমি ডুবে ডুবে জল খাও ব'লে—মনে ভাবো আমরা কিছুই বুঝি না?

নমিতা এক ধমক দিয়ে চিঠিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। কামিনীও কৌতূহলী হ'য়ে ঘনিয়ে আসে। নমিতা সকলের সামনেই খোলে চিঠিখানা।

ইংরাজি টাইপ করা চিঠি। মনে মনে পড়ে যায়। মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ওর।

কামিনী প্রশ্ন না ক'রে পারে না: কার চিঠি ঠাকুরঝি?

নমিতা চল্‌তে সুরু করেছিল। হঠাৎ ঘুরে বলে: ভূতের চিঠি নয় বৌদি!

কামিনী দ্বারের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নমিতা এসে পৌছায় অনিমেষের কাছে। রোগজীর্ণ অনিমেমেষের মাথার কাছে বসে বৃদ্ধ হরিপদ ওর জ্বরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

নমিতা বলে: বাবা, স্কুল অথরিটি আমাকেই সিলেক্ট করেছে। অবিলম্বে জয়েন করতে বলেছে!

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে অন্ধের মুখ। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করেন তিনি।

রাত দশটা বেজে গেছে। কেরোসিন সাশ্রয়ের জন্য সবাই সন্ধ্যারাত্রেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে দোরে খিল দেয়। কলোনী ঘুমাচ্ছে। দূরে দূরে এক আধটা বাতি জ্বলছে এখানে ওখানে। সন্ধ্যা থেকে বর্ষা নেমেছে। চারিদিকেই জমেছে কাদা। টেস্ট-রিলিফের কাজে রাস্তাগুলোয় শুধু মাটি ফেলাই হ'য়েছিল. জলনিকাশের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এক এক জায়গায় এক হাঁটু কাদা জমে যায় বর্ষাকালে। টিপ্ টিপ্ ক'রে ইল্‌সেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছেই। ব্যাঙ ডেকে চলেছে একটানা। সভ্য জগতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু রেলগাড়ীর যাতায়াত। স্টেশন কলোনী থেকে দূরে নয়। বস্তুত কলোনীর একান্ত দিয়ে রেল লাইনটা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নিয়মিত গাড়ী এসে দাঁড়ায়—স্টেশনের কল-কোলাহল ভেসে আসে কলোনীতে। ওরা টের পায় সভ্য জগতের সঙ্গে ওদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ওদের দিনগুলো ঘণ্টার হিসাবে ভাগ করা নয়। ট্রেণ-টাইমিংএ ভাগ করা। লৌহ-শকটগুলোই ওদের ঘড়ি। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কটা বেজেছে? বলে, একটা সতেরো চলে গেছে?

ছ্যাচা বেড়ার রান্নাঘরে বসে কামিনী একরাশ চিড়ে ভাজছিল। বাড়িশুদ্ধ

সবাই ঘুমাচ্ছে। বাড়ির একটা ছেলে যে এখনও ফেরেনি সে বিষয়ে যেন কারও কোনও দুশ্চিন্তা নেই। থাকবে কেন? নিয়মিত যে ছেলে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ি ফেরে—রাত হ'লে তার জন্যই ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক; আর যে ছেলের গৃহ প্রত্যাগমনের নিয়মিত সময়ই হ'চ্ছে মধ্যরাত্র তার জন্য ভেবে লাভ কি? হোক সে বালক! কামিনী কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। দায়িত্বটা তারই। সেই ওকে পাঠায় এ দুরূহ কাজে। তাছাড়া এই সময়েই ও চানাচুর ভেজে রাখে।

ঘরে কয়েকটা মাটির পাত্র। খুঁজলে এক আধখানা কলাইয়ের অথবা এ্যালুমিনিয়ামের তৈজসও মিলতে পারে। উনানের ও পাশে কাঠগুলো গাদা দিয়ে সাজানো। উনানের আগুনে যতটা শুকিয়ে যায়। কামিনীর মুখের একপাশ উনানের উত্তাপে রক্তাভ। ফেলে আসা জীবনের কথাই বুঝি ভাবছে বসে ও। বধূ হয়ে যখন সে প্রথম আসে চক্রবর্তীর উচ্ছল সংসারে তখন নব-বধূটির কী সমাদর! কি আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো। লতু তখন ছেলেমানুষ। নমিতা কিন্তু ওর সমবয়সী। নববিবাহিতের গোপন-জীবন সম্বন্ধে তার কত কৌতূহল। নমিতার বিবাহও স্থির হ'য়েছিল। অনিমেষের বিয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের তারিখের কিছুদিন আগে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই অনিমেষের বিয়েটাই হ'ল সেবার। তারপর কিন্তু নমিতার বিয়ে দেওয়া ঘটে উঠল না। কত পাত্রপক্ষ এসে দেখে গেল। কতদূর অগ্রসর হয়েও ভেঙে গেছে সম্বন্ধ। কামিনীর ভারি দুঃখ হ'ত। কেন হয় না নমিতার বিয়ে? লেখাপড়া জানা সুন্দরী, সদ্বংশজাত কুমারী কন্যা। কেন তার বিয়ে হচ্ছে না? তারপরেই হল বঙ্গ-বিভাগ।

চলে এল ওরা এপারে। পি. এল. ক্যাম্পে থাকার সময় একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন হরিপদ মাস্টার। তখন দৃষ্টিহীন হয়েছেন তিনি। ক্যাম্পেরই একটি ছেলে রাজি হয় নমিতাকে দেখে। ছেলেটির না ছিল রূপ না গুণ। বিড়ির দোকান ছিল তার একটা। গলায় একটা সিল্কের রুমাল বেঁধে কোথা থেকে-জোগাড়-করা মাডগার্ডহীন উল্টো-হাতল একটা রেসিং সাইকেলে চড়ে

চক্কর দিয়ে বেড়াতো সারা ক্যাম্পটা। গান গাইত—আধুনিক হিন্দি সিনেমা-সঙ্গীত। ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মনেই হ'ত না। হরিপদ চুপ করে রইলেন। অনিমেষ নিয়ে এল পাত্রকে। নমিতাকে যাচাই করে নিল সে দেখতে এসে। পছন্দ হয়ে গেল তার। নগদ পাঁচশ টাকা বরপণ পেলে সে রাজি আছে পণ্ডিতকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে। হরিপদ অর্থনৈতিক অজুহাত তুলে আপত্তি জানালেন। অনিমেষ কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছিল বোনের বিবাহ ব্যাপারে। অনেক ধরাধরি ক'রে সে জোগাড় করলে একটা ম্যারেজ গ্রাণ্ট। অনাথা উদ্বাস্তু মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করেন ক্ষেত্র বিশেষে। পাত্র বরপণের টাকাটা আগাম চাইলে। রাজি হ'ল না অনিমেষ। মাত্র দু'শ টাকা সে দিল আগাম খরচ বাবদ। ঐ টাকাটা নিয়েই সে পালাল। বিড়ির দোকান সে আগেই বিক্রি করেছিল।

তারপর থেকে হরিপদ আর চেষ্টা করেন নি। অনিমেষ চেষ্টা করছিল জানতে পেরে নমিতা এসে প্রতিবাদ করে। বিয়ে সে করবে না। অন্ধ বাপের সেবায় সে কাটিয়ে দেবে জীবন। হরিপদ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—বৃদ্ধের জীবনের চেয়ে নমিতার জীবনের বিস্তারটা বড়। বৃদ্ধের অবর্তমানেও নমিতাকে দুনিয়াদারী করতে হবে। নমিতা কিন্তু অটল। বয়স হয়েছে তার। তার কথারও দাম দিতে হয়। সে দৃঢ় আপত্তি জানালো যখন তখন চুপ ক'রে যেতে হল অনিমেষকেও। মনকে সে বোঝালে বোনের বিবাহ ত সে ব্যবস্থা করতে পারতই শুধু—নমিতা রাজি নয় যে।

তাই নমিতার প্রতি একটা গোপন মমতা ছিল কামিনীর। আহা বেচারী জানতেই পারল না কি মধুময় এ জীবন! নমিতা রূঢ় কথা বললেও সহ্য ক'রে যেত কামিনী, যতটা পারে। পুরানো দিনের কথাতেই একেবারে বিভোর হ'য়ে যায় সে।

খুট ক'রে শব্দ হয় বাইরে। চমকে ওঠে কামিনী।

: বৌদি আমি!

কামিনী তাড়াতাড়ি ঝাঁপটা সরিয়ে দেয়। ঘরে ঢোকে বাবলু। জলে

ভিজে হি হি করে কাঁপছে সে শীতে। কামিনী ওকে জড়িয়ে ধরে। ঝাঁপটা টেনে বাবলুকে এনে বসায় উনানের পাড়ে। সযত্নে মুছে নেয় ওর ঝাঁকড়া চুলগুলো আঁচল দিয়ে।

: এত রাত করে? ইস্ একেবারে ভিজে গেছিস যে! ছি ছি; না বাপু আর তোকে পাঠাব না এ কাজে।

: আরে দূর। এটুকু ভিজলে কি হয়? কিন্তু বৌদি, প্যাকেটগুলো বোধ হয় সব নষ্ট হ'ল।

উনুনের উত্তাপে বাবলু এটু সামলে নিয়েছে। হাতের ব্যাগটা উবুড় করে ঢালে মেজেতে। কামিনী গুনে গুনে তুলতে থাকে। হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে খুচরা পয়সা বার ক'রে দেয় বাবলু। কামিনী প্রশ্ন করে: আজ ছুপুরে খেতে এলিনে যে বড়?

: সে অনেক কথা।

কামিনীর গোনা শেষ হয়। খুচরা পয়সার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলে: মাত্র পাঁচ প্যাকেট চানাচুর খেয়ে আছিস সারাদিন? পাঁচ প্যাকেটের দাম কম দেখছি?

: আরে দূর, আমি চানাচুর খাব কোন দুঃখে? ময়রাতে কি সন্দেশ খায়? বন্ধুদের খাইয়েছি। আজ ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল যে।

: কাদের সঙ্গে?

: আর যারা ফেরি করে। মর্টন দা, হাতকাটা তেল দা, মসলামুড়ি আর মিঠাবাংলা দা।

: মিঠাবাংলাদা কি রে? তোর বন্ধুর নাম?

: দূর, নাম হবে কেন? আমরা ঐ বলে ডাকি? ওরা আমাকে ডাকে সাড়ে-চার-ভাজা বলে।

: তা ভাল; কিন্তু তুই যে বড় খেতে এলি না? এমনি করলে কিন্তু কাল থেকে যেতে দেব না।

বাবলু প্রতিবাদ করে: বারে, তুমি যে মোয়া দিলে সঙ্গে?

: তা হোক, রোজ দুপুরে খেতে আসতে হবে।

: তা আসব না হয়, এখন খেতে দাও দিকি। পেটের মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

: দিচ্ছি, দাঁড়া আগে তোর প্যান্টটা ছাড়াই।

কামিনী উঠে যায় ওঘর থেকে বাবলুর একটা প্যান্ট আনতে। বাবলু উনানের ধারে বসে হাত পা-গুলো সেঁকে নেয়। আজ তার মনে স্ফূর্তির জোয়ার এসেছে। ব্যবসার বাজারে যারা ছিল তার প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে সন্ধি হ'য়ে গেল। ব্যবসায়ী হিসাবে বাবলুর কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয়। একটু পরে কামিনী ফিরে আসে তার একখানা শায়া হাতে ক'রে, বলে: তোর প্যান্ট এখনও শুকায় নি। এখানাই পর।

: দূর! প্রতিবাদ করে বাবলু—ও কি পুরুষ মানুষে পরে নাকি? আমার লজ্জা করে না বুঝি।

কামিনী হাসি লুকিয়ে বলে—নে, আর পাগলামি করিস না। এটাই প'রে খেয়ে নে। বাহাদুরী দেখাতে হবে না।

ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে বাবলু দৃঢ় স্বরে বলে: না, ও আমি কিছুতেই পরব না।

: বাবলু!!

কামিনীর ঐ একটি আহ্বানে নিখাদে নেমে আসে বাবলুর কণ্ঠস্বর: বা—রে তোমার সব তাতেই ধমক। আজকে কেমন মজা হ'ল তা শুনবে না— সারাদিন পর বাড়ি ফিরলাম,—তা কেবল ধমকই দিচ্ছ।

বলে বটে, তবে হাতটাও বাড়ায়। বৌদির দিকে পিছন ফিরে ভিজে প্যান্টটা ছেড়ে শায়াটা পরে। তারপর পিঁড়িতে এসে বসে। কামিনীর সঙ্গে চোখাচোখী হ'তেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে কামিনী। ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে: এই তো লক্ষ্মী মেয়ে,—থুড়ি ছেলে!

লাফ্ দিয়ে উঠে পড়ে বাবলু। কামিনী চট ক'রে ধরে ফেলে তাকে: কি হ'ল?

: দূর, শুধু এই পরে থাকা যায় নাকি!

: কেন? লজ্জা করে?

: করে না?

: শুধু এইটা পরে লজ্জা ক'রছে তা বল্‌লেই হয় বাপু। তা দিচ্ছি এনে…

: কী?

: আর বাকি সবগুলো, যা চাইছ। শাড়ি, ব্লাউস, বডিস…

এবার বাবলুকে ধরে রাখা সত্যিই শক্ত হয় কামিনীর পক্ষে। কিন্তু হাতটা সে ছাড়ে না। জোর ক'রে কাছে টেনে নেয়। ওর ডান হাতটা এঁটো, বাঁ হাতে আঁচল দিয়ে ভিজে মাথাটা আর একবার মুছে নিয়ে মিষ্টি ক'রে বলে: আমার কাছে আবার লজ্জা কিরে? তোকে যে এইটুকু বেলা থেকে মানুষ ক'রলাম। গোরা কি আমার কাছে লজ্জা পায়? লক্ষী ভাইটি আমার, রাগ করিস না। আচ্ছা আয়, তোকে খাইয়ে দেই।

বাবলু বোধ হয় একটু নরম হয়। আর প্রতিবাদ করে না। খেতে বসে। ভাতের গরাস পাকিয়ে বাবলুর মুখে তুলে দিয়ে কামিনী ডাকে: বাবলু।

: উঁ?

: আমি ভাবছিলাম, এবার তোর ব্যবসার কথা বাবাকে বলি,—কেমন?

: ওরে বাস্‌রে, অমন কাজও ক'র না বৌদি। তাহলেই আমাদের ব্যবসার গণেশ উল্টোবে। বাবা কিছুতেই আমাকে বিক্রি করতে দেবে না। তা কি হয়। বাবলু হবে চানাচুরওয়ালা! ওর লেখাপড়া হবে না? ও পণ্ডিত হবে না?

কামিনী ওর নকল করা কণ্ঠস্বরে হেসে ফেলে। তবু বলে: কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। হ্যাঁরে, সত্যিই লেখাপড়া শেখা হবে না তোর?

: ছেলেমানুষের মতো কথা ব'ল না বৌদি। লেখাপড়া শিখে মানুষও হ'তে কি আমারই অসাধ? কিন্তু কি করবে বল? সংসারটা তো চালাতে হ'বে? এতগুলো লোককে তুমি কি খেতে দেবে যদি আমরা ব্যবসাটা বন্ধ ক'রে দেই?

: বন্ধ করতে তো বলছি না আমি। কিন্তু সকলকে লুকিয়ে এ কাজটা করা কি ঠিক হচ্ছে?

: কেন নয়? ওরা সবাই সমান। দাদা-দিদি-মা সব সব। জানতে পারলে এখনি সবাই উপদেশ দিতে ছুটে আসবে। বাবলু শুধু লেখাপড়া করবে, আর কিছু নয়!

কথাটা কামিনীরও অজানা নয়। এই জন্যই এতদিন সাহস করে বলতে পারেনি কাউকে। বাবলুর আশঙ্কা মিথ্যা নয়; কিন্তু তবু সকলকে না জানিয়ে এই যৌথ ব্যবসাটা চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সে একা নিতেও চায় না আর। একটু ইতস্ততঃ ক'রে তাই বলে: কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু!

: কেন তোমার আবার কি হ'ল?

: তুই এই সংসারের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছিস্ অথচ ওঁরা মনে করেন —তুই বুঝি আড্ডা মেরে বেড়াস্ সারাদিন। সব সময় সবাই তোকে গালাগালি দেয়। শুনলে আমার কষ্ট হয় না?

ভাতের দলাটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে বাবলু হেসে ওঠে: আরে দূর। ওদের ওসব ছেলেমানুষী কথায় কান দিতে গেলে চলে?

হাসে কামিনীও, বলে: তোর ধারণা, তুই ছাড়া এ বাড়িতে সবাই ছেলে-মানুষ, না রে?

বাবলু কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কামিনী প্রসঙ্গটা বদলে নেয়। বলে: তা হ্যাঁরে, আজ তোদের রেলের কামরায় কি হ'য়েছে বলবি বলছিলি যে তখন। কি হ'য়েছে আজ?

আজ কি হয়েছে? আজ যা হ'য়েছে তাতে বাবলু হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আর সেই কথাটাই বিস্তারিত ক'রে বলবার জন্য ওর অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্ করছিল এতক্ষণ। সবার দৃষ্টির আড়ালে দেবর-বৌদির এই যে যৌথ ব্যবসা এর বিরুদ্ধে বাধা আছে অনেক। বাবলুর মতে বাধা তিনটি, প্রথমত মূলধন, দ্বিতীয়তঃ ব্যাপারটার গোপনীয়তা। কিন্তু এ ছাড়াও ব্যবসাটার আর একটা বড় বাধা

ছিল। সেটা উৎপাদন ক্ষেত্র নয়—বিক্রয়-কেন্দ্রে। সেটা হ'চ্ছে স[illegible] প্রতিকূলতা। এই সুদর্শন বালকটিকে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ওরা কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে এসেছিল প্রথম দিন। মশলামুড়ি, মর্টন আর হাত-কাটা তেল। কাকের বাসায় কোকিল শাবককে দেখে যেমন ক'রে এগিয়ে আসে বায়সকুল। তারপর যেই বোঝা গেল আগন্তুক ছেলেটিও ফেরি করতে চায় তখন উপমাটার পুরা তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। বায়সচঞ্চুর তাড়নায় জর্জরিত বাবলু এ কয়দিন শুধু এ কামরা ও কামরাই করেছে। আজ দুপুরেও তার অবস্থা কাহিল হ'য়ে উঠেছিল। ভাবলেও বুকটা ঢিপ ঢিপ করে এখনও।

তখনও মেঘলা করেনি। প্রচণ্ড রৌদ্রে স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে উত্তাপ। ঝিম্ ঝিম্ করছে সারা স্টেশন। ওভার ব্রীজের নীচে লোহার কাঠামোর একটা টি আয়রণের উপর বসে ছিল বাবলু বিষণ্ণ হয়ে। সারা সকালে মাত্র এক প্যাকেট বিক্রি হয়েছে তার। করবে কি ক'রে? যখন যেখনে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার উদয়নগরের স্পেশাল ব্র্যাণ্ড চানাচুরের বাণ্ডিল নিয়ে, সেখানেই দেখা দেয় ওরা। বাধা দেয় নানাভাবে। উত্যক্ত করে। বাবলু লক্ষ্য করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মশলামুড়ি, হাতকাটা তেল, তানসেনগুলি আর মর্টন।

মর্টন বলে: কি বে? হকারি করার সখ মিটল?

বাবলু চুপ ক'রে থাকে। জানে, কথা বললেই ওরা আরও পিছনে লাগবে। হাতকাটা তেল বলে: আর কেন বাওয়া! এ লাইনটা ছাড় না চাঁদু!

তানসেনগুলি ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে ফোড়ন কাটে: যা বে বাড়ি যা। মায়ের আঁচলের তলায় বসে লালটুকটুক্ রাজকন্তের গপ্প শোন গে!

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই।

আর সহ্য হয় না বাবলুর। উঠে দাঁড়ায়, বলে: কেন তোমরা এমন করছ বলত? আমি কি করেছি তোমাদের?

: কি করেছ? পাকাধানে মই দিতে এসেছ দাদু। শোন্ বে, এ

লাইনে আর আমরা হকার বাড়াতে দেব না। এমনিতেই গ্গা যত মক্কিচুষ ডেলি-প্যাসেঞ্জারের লাইন।

সগর্জনে সবুজ রঙের পাকিস্তান মেল প্রবেশ করে প্ল্যাটফর্মে।

মর্টন বলে: চল্ চল্। বাবলুর দিকে ঘুরে বলে: কি বে খোকাবাবু? তুইও আসবি নাকি? দেবো ঠেলে ফেলে ঐ লাইনের তলায়।

ওরা এগিয়ে যায়। বাবলু সাহস পায় না। ধীরে ধীরে সে চলে যায় ইঞ্জিনের দিকে। ইঞ্জিন! ঐ যন্ত্রটা চিরদিনই আকর্ষণ করে বাবলুকে। কী আছে ওর লৌহকন্দরে? কেমন ক'রে টেনে নিয়ে চলে এতবড় লোক বোঝাই এই বিরাট রেলগাড়ীটাকে? ঝক্‌ঝক করে তামার পাইপগুলো। নীল পোষাক পরা একটা লোক কালো রঙের একটা তেল লাগায়। তারপর একটা হাতুড়ি দিয়ে অহেতুক ভাবে প্রত্যেক গাড়ির চাকায় একবার ক'রে পিটিয়ে চলে যায়। অবাক বিস্ময়ে বাবলু ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলি দেখতে থাকে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার ওকে ডাকে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে বাবলু। ড্রাইভার ওর থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে: কেৎনা করকে? বাবলু ইংরাজি করে জবাব দেয়: ওয়ান এ্যানা স্যার!

: টু পাইস?

: নো স্যার!

কপট ধমক লাগায় ড্রাইভার! বাবলু চমকে পিছিয়ে যায়। ড্রাইভার কৌতুক বোধ করে। বয়লারের ঢালাটা খুলে বলে…দু পয়সায় না দিলে ফেলে দেবে ওর ভিতর।

বাবলু তিন লাফে সড়ে পড়ে!

হা হা করে হাসে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার!

এগিয়ে আসে মশলামুড়ি।

ড্রাইভার তাকেও ডাকে: হাউমাচ্ এ প্যাকেট?

: এক আনা স্যার!

: টু পাইস?

: টু পাইস ফাদার মাদার স্যার, কিন্তু বাপ মা ছাড়াও দুনিয়ায় মানুষ আছে স্যার! তাই এ্যানাদার টু পাইস ফর মাই সুইট হার্ট!

হা হা ক'রে হাসে সাহেব। বয়লারের প্রচণ্ড উত্তাপ আর বাইরের রুক্ষ প্রকৃতির দাবদাহের মধ্যে এমন রসঘন রসিকতায় প্রাণটা সরস হ'য়ে ওঠে ওর। এক প্যাকেট মশলামুড়ি নিয়ে ফেলে দেয় একটা দোয়ানি: ওয়ান এ্যানা ফর ইয়োর প্যাকেট এ্যাণ্ড এ্যানাদার ফর ইয়োর জোকস্!

মশলামুড়ি সেলাম করে সাহেবকে। দোয়ানিটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর বাবলুকে অহেতুক একটা ভেংচি কেটে চলে যায় ফেরি করতে। বাবলু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে! এগারো বছরের বালকটির সঙ্গে যেন সবাই শত্রুতা করছে।

হুইসিল দিয়ে ট্রেনটা ছাড়লো একটু পরেই। বাবলু তখনও ইঞ্জিনের কাছে প্ল্যাটফর্মের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে মর্টনদা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আর অপস্রয়মান গাড়ীটার জানালা থেকে মুখ বার করা পাকিস্তানযাত্রী একজনকে বলছে—

: আর দু আনা, আর দু আনা!

লোকটা দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে ভেঙচি কাটলে মর্টনদাকে। গাড়ীর গতিবৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রীটি দেশান্তর যাত্রার আগে শেষ ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়েছে এপারের মানুষকে। মর্টন ছুটে গেল লোকটার দিকে। ফাঁকি বাজি! যাত্রীটির কাছে গিয়ে পৌছতেই সে দিলে এক ধাক্কা। মর্টন পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর! অল্পের জন্য চাকার নিচে পড়ল না! লজেন্সের শিশিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল সবুজ রঙের লজেন্স সারা প্ল্যাটফর্মে! হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল লোকটা! অপমানে, আঘাতে আর লোকসানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মর্টনের। হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে তার!

বাবলুর মুখেও ফুটে উঠ্‌ল একটা অসহায়তার হাহাকার! মুহূর্তে সে মুখে

ফিরে এল একটা প্রতিহিংসার কাঠিন্য। লোকটার পৈশাচিক উল্লাসদীপ্ত অট্টহাস্য আর ভূলুণ্ঠিত মর্টনদার অসহায় মূর্তি যেন আগুন ধরিয়ে দিল এগার বছরের বালকটির মাথায়। পর মুহূর্তেই জানালা থেকে বার করা অট্টহাস্যরত মুখখানা এসে গেল বাবলুর নাগালের মধ্যে। প্রাণপণ শক্তিতে বাবলু মেরে বসল ওর দাড়ি-ওয়ালা গালে একটা প্রচণ্ড চড়!

দুই বিপরীত গতির বেগে সেও ঘুরে পড়ল প্লাটফর্মে। হাতটা তার ঝিম্-ঝিম্ করছে। হেসে উঠ্‌ল প্ল্যাটফর্ম সুদ্ধ লোক। অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তারা খুশী হ'ল। বেশ করেছে ছোকরা। বাহাদুর! মর্টন ভাজা শিশির দুঃখ ভুলে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে ওঠে: এই মেঠাইওলা! লাও শিগ্‌গির আধসের রসগোল্লা। শ্লা সারাদিন উপোস ক'রে আছে! হাতকাটা-তেল চট করে বাবলুর পাশে বসে টেনে নেয় ওর হাতখানা। বাবলুর হাতটা লাল হ'য়ে উঠেছে। রক্ত জমে গেছে! নিজের ব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বার ক'রে মালিশ করতে লেগে যায়। বলে: বাবলুর যখন এতটা বেজেছে ও শ্লা বোধহয় বাপের নাম ভুলে গেছে মাইরি!

অতি দুঃখেও বন্ধুরা হো হো ক'রে হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। বাবলুও!

এই গল্পটাই বিস্তারিত ক'রে বল্‌তে যাচ্ছিল বাবলু। কিন্তু বাধা পড়ল তাতে।

ওঘর থেকে বিন্দুবাসিনী সাড়া দেন: বৌমা, কথা বলছ কার সঙ্গে রান্নাঘরে?

বাবলু একেবারে চুপ। ছড়ানো চানাচুরের প্যাকেটগুলো কামিনী কুড়িয়ে নেয়। রাখে তুলে একটা মাটির হাঁড়িতে।

: কি হ'ল বৌমা? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

ও ঘর থেকেই তাঁকে থামিয়ে দেয় নমিতা: তোমার বৌ আজকাল ভূতের সঙ্গে কথা বলে মা। ওতে কান দিতে নেই!

বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন দ্বারপ্রান্তে : ও! দেওরটি ফিরে এসেছেন বুঝি?

জবাব দেয় না কেউ!

: তুই বেষ্টামুদির কাছে দশটাকা ধার করেছিস?

বাবলুর খাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। চুপ করে থাকে। কামিনী বলে : এখন কেন মা? আগে ওর খাওয়াটা মিটে যাক্। সারাদিন না খেয়ে আছে ছেলেটা!

: তুমি চুপ কর বৌমা। সারাদিন না খেয়ে থাকবারই ছেলে বটে ও! বাপ-মা না খেয়ে মরছে আর ও বাজারে ধার করছে! এক আধ পয়সা নয়—দশ টাকা! বল হতভাগা!

এগিয়ে আসেন উনি দ্বার ছেড়ে বাবলুর দিকে। বাবলু কি ভাবলে সেই জানে। হঠাৎ পিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বিন্দুবাসিনী ওকে ধরবার জন্ত বাড়িয়ে দেন একটা হাত। যাবার সময় বাধ্য হয়ে বাবলুকে একটা ধাক্কা মেরে যেতে হল। পড়তে পড়তে সামলে নেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী এগিয়ে আসে। বিন্দুবাসিনী থামিয়ে দেন : থাক্! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি! দুধের ছেলেটাকে পর্যন্ত মন্ত্র পড়ে বস করেছে ডাইনি!

ক্ষুধার্ত বাবলুর অর্ধভুক্ত থালাখানার দিকে চেয়ে কামিনী বলে : দুধের ছেলেকে বশ করতে হ'লে মন্ত্রের দরকার হয় না মা। ও একটু স্নেহের কাঙ্গাল। আমার কাছে সেটুকু পায় বলেই ছুটে আসে আমার কাছে!

নমিতাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে : তা তো বুঝলাম, কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে—তাকে কি বলে জান বৌঠান?

: জানি ঠাকুরঝি, বলে ডা'ন! কিন্তু সারাদিন উপোস ক'রে যে মাকে দেখে বাড়া ভাত ফেলে ছেলে ছুটে পালাল তাকে—

: কী! কী বল্লে তুমি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ছোটলোকের ঘর থেকে এসেছ ব'লে মনে কর তোমার সব ইতরামোই সহ্য করব আমরা! তোমার আশকারাতেই না ও সাহস পেয়েছে বেষ্টামুদির কাছে টাকা ধার

করতে? আমি ঠিক জানি—ঐ ভাইনির পরামর্শেই দুধের বাছা টাকা ধার করেছে! কী? অস্বীকার করতে পার একথা?

: অস্বীকার করব কেন মা? টাকা এনে ও আমাকেই দিয়েছে!

নমিতা বলে ওঠে: বাঃ! কী গৌরবের কথা! শ্বশুর জানলো না—স্বামী জানলো না আর বাড়ির বৌ টাকা ধার করলেন বাইরের লোকের কাছে। ধার তো করলে বৌদি, শোধ দেবে কে?

: আমিই শোধ দেব ঠাকুরঝি। তোমার মাইনের টাকায় হাত দেব না!

বিন্দুবাসিনী বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠেন: তা তো দেবেই বাছা! শোধ যে কি ক'রে দেবে তা তো কাল সকালেই দেখেছি! গলির মধ্যে তাই এত ঢলাঢলি!

নমিতা যোগ দেয়: আর শেষরাতে খিড়কিতে দাঁড়িয়ে ভূতেব সঙ্গে হাসাহাসি!

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যায়! চিৎকার করে ওঠে: ঠাকুরঝি! কী বলছ? এত ইতর মন তোমাদের? তুমি না শিক্ষিত!

নমিতা শ্লেষের সঙ্গে বলে: আমরাই ইতর নয়? আর শিক্ষার কথা তুলছ বৌদি? মুদির সঙ্গে পীরিত ক'রে সংসার চালাবার শিক্ষা তো স্কুলে শেখায় না! ওটা বুঝি তোমার মায়ের কাছে শিখেছ বৌঠান?

: কি বল্লে?

: তুমি বেট্টামুদির সঙ্গে পীরিত ক'রে রোজগার করবে আব সেই অন্ন আমরা খাব মনে করেছ?

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে যায়। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে ছিল সে! মায়ের কথা মনে পড়ে যায়! যাদের জন্যে সে এত করছে তারাই যখন তাকে আঘাত করলে, নারীত্বের চরম অবমাননাকর ইঙ্গিত ক'রে তাকে ধূলার সাথে মিশিয়ে দিলে—এমনকি তার স্বর্গগতা মায়ের নামেও লেপন করলে চরম কলঙ্কের কালিমা, তখন কামিনীর হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে

গেল! বল্লে : তাই তো দেখতে পাই ঠাকুরঝি! কি ক'রে সংসারটা চল্‌ছে তা দেখ্‌ছি তোমরা সকলেই জেনে ফেলেছ! কই অন্নজল তো কারও মুখে আটকাচ্ছে না! খেতে দিলে না এক ফোঁটা ছেলেটাকেই!

ডুগরে কেঁদে উঠ্‌লেন বিন্দুবাসিনী!

: বৌমা!

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিপদ পণ্ডিত—অন্ধ পদক্ষেপে। তাঁর ঐ কণ্ঠস্বর, কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঐ উঠে আসার ভঙ্গিটায় সম্বিত ফিরে পায় কামিনী! মনে পড়ে এতক্ষণ কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। কি নিয়ে ঝগড়া করছিল! সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে ওর।

: তোমার শাশুড়ী আর ননদ সব জেনেই অন্ন গ্রহণ করেছেন—বলছিলে তুমি। বিশ্বাস কর বৌমা—আমি এ কথা জানতাম না। জানলে, তোমার এভাবে রোজগার করা অন্ন হরিপদ পণ্ডিতের গলা দিয়ে নামতো না! কিন্তু যে কথা তুমি নিজমুখে স্বীকার করলে আর তাই নিয়ে বড়াই করলে—সে কথা জানার পরেও যদি তোমার রোজগার করা অন্নে ভাগ বসাই তবে সে অন্ন আমার কাছে গোমাংস! কিন্তু রাত অনেক হ'য়েছে—এভাবে—

কথাটা শেষ হ'ল না। হরিপদ পণ্ডিতের কথা শেষ হবার আগেই অনশনক্লিষ্ট কামিনীর সংজ্ঞাহারা দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেজের উপর।

বাবলুর অভুক্ত অন্নপাত্রটা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অন্নলক্ষ্মী ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরময়।

ও ঘর থেকে রোগজীর্ণ অনিমেষ শুধু প্রশ্ন করে : কী হ'ল?

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে!

দিন আর কাটে না কামিনীর। কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল। এ কয়টা বছর আঘাত সে কম পায়নি। গোছান সংসার, ঘর বাড়ি সব ছেড়ে এসেছে। অভাব অনটনের তীব্র কষাঘাতে সংসার যখন জর্জরিত হ'য়ে পড়েছে তখন দক্ষ নাবিকের মতই সে চালিয়ে এসেছে সংসার তরণীটিকে।

শাশুড়ী ছিলেন, তাঁর গায়ে অভাব অনটনের উত্তাপ লাগতে দেয়নি। ননদ ছিল কিন্তু অবিবাহিত মেয়েকে সীমন্তিনী মাত্রেই ভাবে নাবালিকা ব'লে। তাই কামিনীই নিজে থেকে নিয়েছিল গোটা সংসারটাকে চালিয়ে নেওয়ার ভার। জরাগ্রস্ত শ্বশুর, রোগাক্রান্ত স্বামী, নাবালক দেবর, এদের নিয়ে সে যে কি করে চালিয়ে এসেছে এতদিন কেউ তা জানে না। বোধকরি যিনি সব জানতে পারেন একমাত্র তিনিই খবর রাখতেন এই নিরলস বধূটির অতন্দ্র সাধনার। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সাধ-আহ্লাদের কথা মনেও পড়েনি এতদিন। দিনের শেষে দুটি শাকান্ন রেঁধে দিতে পেরেছে প্রিয়জনকে এইটুকুই ছিল ওর পরম সান্ত্বনা। সেই ছিল ওর একমাত্র সুখ। সে সুখেও বুঝি বঞ্চিত করলেন ওকে ভগবান।

হরিপদ মাস্টার সস্ত্রীক সকন্যা পৃথক হ'য়ে গেলেন।

হরিশ মিত্রের প্লটের অসমাপ্ত বাড়িটায় উঠে গেছেন ওঁরা। হরিশ মিত্রও ডেসার্টার। ওঁরা ভিন্ন কার্ড করাবার দরখাস্ত করেছেন।

অনিমেষ জানতে চেয়েছিল একবার কারণটা।

হরিপদ বলেছিলেন: তোমার রোজগার নেই—কি ক'রে টানবে আমাদের সবাইকে। তাছাড়া এখানে থাকলে বৌমার স্নেহের আতিশয্যে বাবলুকে মানুষ করতে পারব না আমরা। ওই তো এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

অনিমেষের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে, বলে: রোজগার তো আমাদের কারও নেই বাবা। যদি না খেয়েই মরতে হয় তবে সবাই মিলে একসঙ্গে মরি না কেন?

: না। উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনিমেষ। পুত্র উপযুক্ত হ'লে তাকে পৃথক সংসার করতে দিতে হয়। সংসারের এই নিয়ম। তুমি দুঃখ কর না।

অনিমেষ চুপ ক'রে থাকে।

: আর তাছাড়া কারও কোনও উপার্জন নেই এ কথাও তো সত্য নয়। নমিতা স্কুল-মাস্টারির চাকরিটা পেয়েছে। সেও তোমাদের সংসারে মাসিক কিছু ক'রে পাঠাবে।

অনিমেষ বলে: আমরা কি কোন অপরাধ করলাম? তাই কি আমাদের ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

ওর মাথায় একখানা হাত রেখে হরিপদ পণ্ডিত বলেন: তোকে এই অসুস্থ শরীরে ফেলে যেতে হ'চ্ছে—এ কি আমারই কম দুঃখ? তুই ভালো হ'য়ে ওঠ!

হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী।

বাইরের উঠানে কয়েকটি বাক্স বিছানা বাঁধা। একখানা গোরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। মালপত্র উঠ্‌ছে তাতে। নতু আর নমিতা দেখে শুনে মালপত্র ওঠাচ্ছে। বাবলু অনুপস্থিত। দ্বারের কাছে পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে কামিনী। একটা কথাও বলতে পারেনি। সমস্ত জিনিসটা যেন তার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না। অভিমানের বসে রাগের মাথায় সে যদি একটা কথা বলেই ফেলে—তাই ধ্রুব সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে? আর সে যে ছেঁচাবেড়ার রান্নাঘরের চতুঃসীমায় তিলে তিলে বছরের পর বছর আত্মদান করে এলো;—জীবনের সব সুখ সব আহ্লাদ বলি দিয়ে এই সংসারটিকে ভারবাহী বলদের মত নীরবে চালিয়ে নিয়ে এল তার কোনও মর্যাদা এরা দেবেনা। বিন্দুবাসিনীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নমিতা না হয় নতুন চাকরির মোহে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, কিন্তু ওর শ্বশুর? হরিপদ পণ্ডিত মশাই? তিনি কি ক'রে বিশ্বাস করলেন এতবড় ঘৃণিত মিথ্যা অভিযোগ। মা, আর মালক্ষ্মী ছাড়া ডাকেননি কোনদিন—আর আজ এক মুহূর্তে উনি ধরে নিলেন যে পুত্রবধূর অশুচি উপার্জনের অন্নে চলছে তাঁর সংসার! দুরন্ত অভিমানে কামিনীর অন্তঃকরণ স্ফুটনোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত থরথর করে কাঁপছিল।

হরিপদ বলেন: উঠে এসো বড় বউ। আমাদের যাবার সময় হ'ল।

বিন্দুবাসিনী অশ্রুসিক্ত মুখটা মুছে উঠে বসেন। বলেন: ওকে ওই সর্বনাশীর হাতে ছেড়ে যেতে হ'বে—ভাবলেও আমার হাত পা হিম হ'য়ে যাচ্ছে।

অনিমেষ ঊর্ধ্বে চেয়ে থাকে। কামিনী নীরব।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই কামিনী প্রণাম করে।

হরিপদ যন্ত্রচালিতের মতো বলেন : কল্যাণমস্তু।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারেনা, বলে : কেন, কেন আপনি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন ? আমি দেব না যেতে। সমস্ত মিথ্যা কথা।

: মিথ্যাই হ'ক বৌমা! আমি আশীর্বাদ করছি তোমার সুমতি হ'ক।

: সুমতি হ'ক!

কান্নায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে অভিমানিনী মেয়েটির কণ্ঠ! সুমতি হ'ক? অর্থাৎ কাল রাত্রে তার শ্বশুর যা বলেছেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, মনের কথা। রাগের মাথায় কথাগুলি ব'লে ফেলেননি তিনি—এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তিনিও ধরে নিয়েছেন অসৎ উপায়ে উপার্জন করছে কামিনী! তবু একবার সে শেষ চেষ্টা করে : আমার সমস্ত কথা শুনবেন না আপনি ?

নমিতা বলে ওঠে : যাবার সময় আবার কেন ওসব কথা তুলছ বৌদি। আমাদের যেতে দাও।

ম্লান হাসে কামিনী। দুরন্ত অভিমানে তার অন্তঃকরণ ছাই হ'য়ে যাচ্ছিল। বলে : বুঝেছি ঠাকুরঝি। এস তোমরা। যাওয়াটা তোমাদের প্রয়োজন —যুক্তিতে তো তোমরা এখন কান দেবে না ?

নমিতা বলে : মানে ?

: মানে আমরাই এখন. তোমাদের বোঝা। তুমিই এখন একমাত্র উপার্জনক্ষম এ বাড়িতে। তাই আলাদা হওয়াটা তোমার প্রয়োজন।

নমিতা বলে : তুমি বলেই একথা ভাবতে পারলে আর মুখে বলতেও আটকালো না ; কিন্তু উপার্জন তো তোমারও আছে বৌদি!

: নমিতা !!—গর্জন ক'রে ওঠেন হরিপদ পণ্ডিত!

চমকে ওঠে নমিতা, কামিনীও। এ কণ্ঠস্বর ওরা চেনে। ওরা বোঝে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে দেবেন না অন্ধ বৃদ্ধ। যাবেন তিনি নিশ্চয়ই —তবে নীরবেই যেতে চান। কামিনীর দিকে অন্ধ হস্তক্ষেপে তিনি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেন: সতীত্বের জোরে সাবিত্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন

সত্যবানকে, লক্ষীন্দরকে বেহুলা। তুমি অনিমেষকে সারিয়ে তোল এই আশীর্বাদই করে গেলাম।

ওঁরা চলে যান!

কামিনী চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমস্ত দিন অনিমেষ একটা কথাও বলে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্যের দিকে। দিন কারও বসে থাকে না। সংসারের নানান দাবী আছে। আছে শিশুপুত্রের আহার—আছে রোগীর পথ্য। কামিনী মনকে শক্ত করে। উনান জ্বালে। দুটি ভাত ফুটিয়ে আর একটা বেগুন সেদ্ধ ক'রে ছেলেকে খাওয়ায়। গোরাও বোধহয় বুঝেছে—কী একটা হ'য়েছে আজ। অন্যান্য দিনের মত কোনও দুষ্টামি করে না। মায়ের কাছে দুটি খেয়ে নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়ে বাপের পাশটিতে। কামিনী একবাটি বার্লি গরম ক'রে নিয়ে আসে অনিমেষের কাছে। ওকে খেতে বলে। অনিমেষ পাত্রটা নেয় না। হাত নেড়ে জানায় যে সে খাবে না।

যে স্বামীর কাছে কামিনীর অদেয় কিছুই নেই—যে স্বামী তার হৃদয়ের সমস্ত কথার খবর রাখে—যার কাছে দেহমনের গোপনতম সংবাদ উজার ক'রে ঢেলে দিয়েছে কামিনী—নিঃসঙ্কোচে; সেই স্বামীর কাছেই আজ সে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কি জানি ও কি বুঝেছে। কী ভেবেছে! কতটুকু বিশ্বাস করেছে তাই বা কে বলতে পারে। তরঙ্গমুখর নদীবক্ষে নিমজ্জমান লোক যখন সবলে আঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া কাঠ—তখন চোখ খুলে সে দেখতে চায় না—ওটা ভাসাকাঠ না কুমীর! কামিনীও তার শেষ অবলম্বনটাকে যাচাই ক'রে উঠ্‌তে সাহস পায় না। অন্তরের সখী নমিতা বিশ্বাস করেছে, মাতৃসমা শ্বাশুড়ী বিশ্বাস ক'রেছেন, হরিপদ পণ্ডিতের মত দেবতুল্য লোক পর্যন্ত অবিশ্বাস করেন নি এরপর কোন সাহসে কামিনী যাচাই করতে যাবে তার শেষ আশ্রয়স্থলকে! বার্লির বাটিটা নামিয়ে রেখে সে চলে আসে রান্নাঘরে। উনানে জল ঢেলে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে।

অনিমেষ ওকে ডাকে : শোন।

যন্ত্রচালিতের মত কামিনী এসে দাঁড়ায় ওর শয্যাপার্শ্বে।

: কি হয়েছে বলতো? কি মিথ্যা অভিযোগের কথা বলছিলে তুমি! কালরাত্রে হ'লই বা কি?

আর স্থির রাখতে পারে না কামিনী নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অনিমেষ বুঝেছে ওকে এখন খানিকটা কাঁদতে দিতে হবে। তাই চুপ ক'রে থাকে। অনেকটা কেঁদে কামিনী একটু হাল্‌কা বোধ করে। অনিমেষ আবার বলে : কি হ'য়েছে বলো। কেন বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ওঠ, মুখ তোল।

কামিনী ওর বুকের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে বলে : ওঁরা বিশ্বাস করেছেন যে আমি অসৎ উপায়ে উপার্জন করে তোমাদের এ সংসারটা চালাচ্ছিলাম এতদিন—

: অসৎ উপায়? চুরি ক'রে?

: ওগো না, না! আমি আমি—

: বুঝেছি থাক।

কান্নার প্লাবনে বুঝি ভেসে যাবে কামিনী।

অনিমেষ শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে : ওঠো বউ, আমি বিশ্বাস করিনি। ওঁরা না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। ওঠো, আমার বালি নিয়ে এস। আমাকে বাঁচতে হবে। আমার রোগ মুক্তিতেই একমাত্র—, আমি মরব না, আমি মরতে পারি না!

কামিনী ওকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে। একটাও কথা বলে না!

নিজেকে কামিনী সামলে নেয়। তার সবকিছু তাহ'লে ফুরিয়ে যায় নি। তার স্বামী, তার জীবনমরণের সাথী তাকে অবিশ্বাস করেনি। অনিমেষ বেঁচে উঠ্‌তে চায়। অনিমেষ বেঁচে উঠ্‌বে। ব্রত-উপবাস নয়, সেবা দিয়ে, পরিচর্যা ক'রে, শুশ্রূষা ক'রে সে মৃতকল্প স্বামীকে সারিয়ে তুলবে। যতবড় সত্যাশ্রয়ীই হ'ন হরিপদ পণ্ডিত, যত শ্রদ্ধাস্পদ-পূজ্য ব্যক্তিই হ'ন তিনি—সে সতীত্বের

মহিমময় মর্যাদার সামনে তাঁকেও এসে স্বীকার করতে হবে ত্রুটি। এই ভাঙ্গা সংসার জোড়া দেওয়াই হ'বে কামিনীর জীবনের ব্রত।

দ্বিগুণ উৎসাহে জলে ওঠে কামিনী। তাকে লড়াই ক'রে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু লড়বে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে—সেই দারিদ্র্য যে অসীম শক্তিশালী। অনিমেষের অসুখটা কি তাই জানা যায়নি আজও। একমাসের উপর সে শয্যাশায়ী। কোনও চিকিৎসক এসে দেখেন নি তাকে। মোবাইল য়ুনিটের ডাক্তারখানায় হরিপদ পণ্ডিত গিয়ে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করতেন আর মনকে-প্রবোধ-দেওয়া লাল-নীল জল নিয়ে আসতেন। তাই খাওয়ান হ'ত অনিমেষকে। মায়ের চরণামৃত ছিল এ ছাড়াও।

কামিনী স্থির করল যেমন ক'রে হ'ক ডাক্তার দিয়ে অনিমেষকে দেখাতে হবে। কলোনীর বড় ডাক্তার লালুবাবু। তাঁর দর্শনী বেশী। চৌধুরী ডাক্তারও বাড়িতে এসে দেখলে দু'টাকা নেন। এক আছেন নিতাই ঠাকুর্দা। অনেক ক্ষেত্রে বিনা দর্শনীতেই রোগী দেখেন তিনি,—কামিনী শুনেছে একথা। কিন্তু নিতাই কবিরাজ থাকেন কালোনীর একেবারে অপর প্রান্তে—ই-ব্লকে। কে ডেকে আনবে তাঁকে? তাছাড়া কামিনীর সংসারে চাল ডাল সবই ফুরিয়ে এসেছে। বিষ্টুপদর কাছে যে দশটা টাকা ধার করা আছে তাও শোধ করা হয়নি। অন্তত একখানা শাড়ি তাকে কিনতে হবে এ মাসেই। এখানা ব্যবহারের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছে।

কামিনী অবাক হ'য়ে ভাবে কি ক'রে এ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন হরিপদ মাস্টার? ধরে নেওয়া যাক্ তাঁর অনুমান সত্য, তিনি জানতে পেরে-ছিলেন যে তাঁর পুত্রবধূ চক্রবর্তী পরিবারের সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপথেই পা বাড়িয়েছিল। বেশ কথা। কিন্তু কেন সে গিয়েছিল ও পথে? তাঁদের সংসারের মুখ চেয়েই তো? সে উপার্জনে কি ওঁর পুত্রবধূ গহনা গড়েছে? তবে? তাহ'লে কেন তিনি তিরস্কার ক'রে ওকে সৎপথে আনবার চেষ্টা করলেন না? স্কুলের কোনও ছেলে দুষ্টুমি করলে কি তিনি তাকে শোধরাবার চেষ্টা করতেন না? বিপথেই যদি যাত্রা সুরু ক'রে থাকে সে তবে

তাকে এভাবে একলা রেখে যাওয়াটা কি সেই পাপপথে যাত্রার ব্যবস্থাটাই সুগম ক'রে দেওয়া নয়? এ কথা কি হরিপদ পণ্ডিত বোঝেন না? আর তা ছাড়া কামিনী যদি বিপথে যায় তাহ'লে কি অনিমেষকে ত্যাগ করতে হবে? অনিমেষের অপরাধটা কি? তিনি কি বিশ্বাস করেন অনিমেষের অনুমোদন আছে কামিনীর এ ব্যবস্থায়? রোগজীর্ণ পাণ্ডুর ঐ মানুষটার সম্বন্ধে একথা ভাবতে পারলেন তিনি? তাছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম পরিচয় কি রেখে গেলেন না ওঁরা। একজন অসুস্থ মানুষ—একটি শিশু আর একজন যুবতী নারীর পক্ষে বিনা রোজগারে কি ক'রে চলবে সংসার? কে জলটা তুলে আনবে? চালটা নুনটা কিনে আনবে? অন্ততঃ লতুকে কিংবা বাবলুকে এ পরিবারে দিয়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না ওঁদের? অভিমানে মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কামিনীর। আর বাবলুটাই বা কি? ভুলেও একবার আসে না বৌদির কাছে! একবার মনেও পড়ে না দাদা বৌদির কথা! মনে পড়বে কেন? এখন যে দিদি রোজগার করছে! বৌদির ফ্যান-ভাতের কথা আর মনে পড়বে কেন। উঃ! কি নেমকহারাম ছেলেটা! দুনিয়ার উপর শ্রদ্ধা হারায় কামিনী। শুধু স্বার্থ! আর কিছু চায় না কেউ! মানুষে মানুষে এত যে মধুর সম্বন্ধ—যা নিয়ে গড়ে উঠেছে এত সাহিত্য এত কাব্য—তা শুধু স্বার্থের খাতিরেই। প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার হবে অন্তরের সমস্ত কোমলবৃত্তিগুলি!

ওঁরা যেদিন চলে যান সেদিন রাত্রেই একবার এসেছিল বাবলু। তারপর থেকে ভুলেও এ পথ মাড়ায়নি। সেদিন সকালেই ওঁরা চলে গেছেন। রাত্রে অনিমেষ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর একখানা হাত গোরার গায়ের উপর। গোরাও ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে ওর বাপকে। ওদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার ছবিখানি বসে বসে দেখছিল কামিনী। হঠাৎ বাইরে কে ডাকল : বৌদি!

জানালা দিয়ে উঁকি মারে বাবলু।

পরক্ষণেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বৌদিকে।

কাদামাখা খালি পা, ছেঁড়া সার্ট আর হাফপ্যাণ্ট। হাতে জড়ান কামিনীর

শায়াটা। কয়লার গুঁড়োতে বাবলুর মাথাটা ভর্তি। সেগুলি ঝাড়তে ঝাড়তে কামিনী বলে: তুই কোত্থেকে রে?

বাবলু প্রতিপ্রশ্ন করে: বাবা মা নাকি চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?

: সে কি রে? তুই জানিস না? হরিশ মিত্রের প্লটে। তুই যাসনি সেখানে?

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে বাবলু জানায়—না।

: তবে জামা কাপড় পেলি কোথায়? কাল তো পালিয়ে গেলি আমার শায়া পরে।

: এগুলো মশলামুড়ির। আমার সব কথা শুনে একদিনের জন্যে ধার দিয়েছে ও। বৌদি, আমি এখানে থাক্‌ব—ও বাড়ি যাব না কিন্তু।

ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কামিনী বলে: ছি বাবলু, ওকথা বলতে নেই। ওঁরা বাপ মা, ওঁরা গুরুজন। ওঁদের কাছেই থাকতে হবে তোমাকে।

: তুমিও তো গুরুজন—দাদাও তো গুরুজন।

: সে তো ঠিক কথাই। তবে বাবা বলেছেন আমাদের ডিউটি ভাগ হ'য়ে গেছে। তুই বাবা মাকে দেখবি, আমি দেখব তোর দাদা আর গোরাকে। তোর দাদা ভালো হয়ে গেলেই আবার আমরা সব এক হব।

বাবলু বড় বড় চোখে মাতৃসমা বৌদির কথাটা প্রণিধান করবার প্রয়াস পায়।

: কি রে পারবি না?

: কিন্তু দিদিরাই তো দেখতে পারে বাবা মাকে। তাছাড়া সবাই এক সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি হ'ত।

: ক্ষতি হ'ত। সব কথা তো তুই বুঝবি না ভাই। কি রে পারবি না বাবা মাকে মানুষ করতে?

বাবলু গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে। এগারো বছরের বাবলু বাপমাকে মানুষ করার দায়িত্ব নেয়। পকেট থেকে কিছু খুচরা পয়সা বার ক'রে বলে: এটা নাও। আর নতুন কত প্যাকেট বানিয়েছ দাও।

কামিনী পয়সাটা নিতে পারে না। বলে : ও পয়সা তোর কাছেই থাক বাবলু। তোদের সংসারে খরচ করিস। মাকে সব কথা খুলে বলিস। তাঁকেই পয়সাটা দিস্।

: মাকে বল্লে মা আমাকে চানাচুর বিক্রি করতে দেবে না।

: তবে দিদিকে দিস্। আর বলিস সমস্ত কথা খুলে। বুঝেছিস ?

: ওরা সবাই সমান। জানতে পারলে রক্ষা রাখবে না কি ?

: না রে ! কথাটা এখন বলে দেওয়াই দরকার। আমিই বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বলা হয়নি। তুই বল্লে হয়তো সব মিটে যাবে। বলবি তো ?

: আচ্ছা বলব অখন। তাহলে নতুন প্যাকেটগুলো দাও !

: আর ভাজিনি আমি।

: তবে কালকের সেই ফেরত দেওয়া প্যাকেটগুলোই দাও।

কামিনী চুপ করে থাকে। বাবলু রান্নাঘরের ও কোনা থেকে মাটির হাঁড়ি উবুড় ক'রে বার করে প্যাকেটগুলো।

কামিনীর মনে পড়ে যায়—'তোমার রোজগার করা অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে সে অন্ন আমার কাছে গোমাংস !'

: ওগুলো নিস্নে বাবলু।

: বারে ! তুমি নতুনও ভাজবে না—পুরানোগুলোও দেবে না। তবে আমার বিক্রি বন্ধ থাক্ কালকে !

কামিনী চুপ ক'রে থাকে। কি বলতে পারে সে ? কি করেই বা বোঝাবে তাকে—কেন সে আজ আর সাহায্য করতে পারে না এই ক্ষুদে ব্যবসায়ীকে।

: কাল তাহলে এসে নতুন প্যাকেট নিয়ে যাবো। বেশী করে ভেজে রেখ কিন্তু।

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : আমি আর চিড়ে ভাজব না বাবলু !

বাবলুর মুখের ভাব বদলে যায়। অস্ফুটে বলে : ভাজবে না ? ও

ভাজবে না! তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলে : তবে আমার ব্যবসা উঠে যাক্। আমরা না খেয়ে মরি! তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে—কিছু বল্লাম না। টাকা নিলে না তাও কিছু বল্লাম না—ভাজা প্যাকেটগুলো চাইলাম তাও দিলে না! এখন বলছ চিঁড়ে ভেজে দেবে না। আমি কি নিজে ভাজ্‌তে পারি? তুমি কি চাও আমরা সবাই না খেয়ে মরি!

কামিনী ওকে বুকে টেনে নেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হু হু করে কেঁদে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে। ভারী গলায় ওকে বলে : আজ তুই অনেক কথাই বুঝবি না বাবলু। বড় হ'লে যখন এসব কথা মনে পড়বে তখন অন্তত এটুকু বিশ্বাস করিস তোর বৌদি কখনও কোন মন্দ কাজ করেনি। আমাকে আর কাঁদাসনে বাবলু। বাড়ি যা! ঠাকুরঝিকে বলিস চিঁড়ে ভেজে দিতে।

বাবলুর রাগে একতিলও কমে না এ কথায়। দুরন্ত অভিমানে চানাচুরের প্যাকেটগুলো মেজেয় ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঝড়ের মতো।

সেই শেষ।

আর আসেনি বাবলু!

কামিনী অবাক হ'য়ে যায়। বাবলু নিশ্চয়ই অনুরোধ করেছে নমিতাকে চিড়ে ভেজে দিতে। কথা প্রসঙ্গে সবই জানাজানি হ'য়ে যাওয়া উচিত। আজ সাত দিন হ'য়ে গেছে। এতদিনে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন ওঁরা কি ভাবে রোজগার করত ওরা দেবর-বৌদি। তবু এল না নমিতা অথবা লতু বৌদির কাছে ক্ষমা চাইতে। একবার বাবলুকেও পাঠালো না জানতে অনিমেষ কেমন আছে! কারও যেন কোনও দায়িত্ব নেই। এই ছুতো ক'রে বেকার পুত্রকে ফেলে পালিয়েছেন ওঁরা ধার্মিক সেজে! কামিনী গলায় দড়ি দেবে তবু গিয়ে দাঁড়াবে না সেখানে ভিখারীর বেশে! কখনই না!

কলোনীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটা লম্বা টিনের ঘর। দেওয়াল, জানালা, দরজা, ছাদ সমস্ত টিনের। এটি মেয়েদের স্কুল। দারুণ গ্রীষ্মে যখন টিনের নিচু-চালার তলায়, ছাত্রীদের ব্লাউস-ফ্রক ভিজে ওঠে তখনও নিরবচ্ছিন্ন

ধারায় চলতে থাকে অধ্যয়ন-অধ্যাপন। আবার যখন টিনের চালে পড়ে চড়বড় করে বৃষ্টি তখনও ছাত্রীরা মুখস্থ করতে থাকে—'আফ্রিকার উত্তরে সাহারা মরুভূমি…পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি!' ছাত্রীদের অধ্যয়নই যখন তপশ্চর্যা তখন কঠিন তপস্যাই করছে তারা বলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডের উপর উপবেশন করে যদি গাজনের সন্ন্যাসী মোক্ষপথের পাশপোর্ট পায় তবে এই টিনের চালার দাবদাহে অর্ধসিদ্ধ কোমলাঙ্গী মেয়েগুলি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে, মা সরস্বতী খুশীমনেই ওদের অন্তত পাশ মার্কটা পাইয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যবস্থাটায় খুশী হ'তে পারেন নি সুরেখা ঘোষ—মেয়েস্কুলের নবনিযুক্ত হেডমিস্ট্রেস।

এই নিয়েই কথা হচ্ছিল টিচারস্ রুমে। হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীর বয়স অল্প; কিন্তু রাশভারী মহিলা তিনি। শোনা যায় যে বড় ঘরের মেয়ে সখ ক'রে চাকরি করতে এসেছেন। তিনিই বলছিলেন: আপনারা কি বলেন? আমি আজ ছ'মাস হ'ল এসে চার্জ নিয়েছি, কিন্তু স্কুলের হালচাল দেখে বুঝেছি এর উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য। এক একটা পায়রার খোপের মত ঘরে গাদাগাদি ক'রে বসে ছাত্রীরা। একটা ম্যাপ নেই, লাইব্রারী রেফারেন্স নেই, টিচারদের বসবার চেয়ারের পায়া ভাঙ্গা, নিচু ক্লাসে বেঞ্চি পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এই টিনের চালার উত্তাপে মেয়েদের পক্ষে পড়ায় মন দেওয়াও কষ্টকর। আমি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বহুবার বলেছি; কিন্তু কোনই ব্যবস্থা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কি করণীয়? আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। এ ব্লকের শোভনাদিই বয়োজ্যেষ্ঠা। তিনিই উঠে দাঁড়ান: কথা তো নতুন নয়। আমাগো ইস্কুলের আজ পাঁচ বচ্ছর এই হাল। কর্তৃপক্ষ যখন শুনতাছেন না তখন আর কি করন? এমনিই চলুক।

: এটা তো সহজ যুক্তি। কিন্তু যেটা চলা উচিত নয়—সেটা এতদিন চলেছে বলেই তো তাকে চিরদিন মেনে নেব না আমরা।

: তয় কি ইস্কুল বন্ধ কর‍্যা দিবার কথা কন না কি?

: দরকার হ'লে তাও করতে হবে।

অল্প আলোচনার পরেই কিন্তু বোঝা গেল প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে অন্যান্য সকলে একমত নন। এই টিনের ঘরখানি আছে বলে মাস গেলে গ্রাসাচ্ছাদনের যা হ'ক একটা ব্যবস্থা হয় এঁদের। মেয়েগুলো তবু কিছু লেখাপড়া শেখে, গৌন হ'লেও, সেটাও ত ধরতে হবে। স্কুলকে যদি উনি উন্নত করতে পারেন তো করুন—কিন্তু উন্নত করতে গিয়ে যদি স্কুলটা বন্ধই ক'রে দিতে হয় তা'হলে আর উন্নতি কি হ'ল? হেডমিস্ট্রেস্ স্পষ্টই বিরক্ত হলেন। আলোচনা সেখানেই বন্ধ রেখে রওনা হলেন বাড়ির দিকে। শোভনাদি মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করেন: ঘর যাইতা না?

: যাইতাম না? এইহানো বইয়া করবামটা কি?

একে একে সকলেই রওনা হ'য়ে পড়ে। ডি. ব্লকের নমিতা চক্রবর্তী নূতন চাকরি পেয়েছে। প্রথম মাসের মাইনেটাই আগাম নিতে হয়েছে। আজকের আলোচনায় বেচারী দমে গেল। অনেক আশা ভরসা নিয়ে এসেছে সে চাকরি করতে। এই চাকরিটি দিয়েই সে রক্ষা করবে একটা গোটা পরিবারকে। অন্ধ বাপ, বৃদ্ধা মা, ছোট ভাই বোনদের। তাছাড়া মাসিক কিছু সাহায্য করতে হবে দাদাকে, যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠে সে। নিজের জন্য দুঃখ নাই তার। একলা মানুষ হ'লে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু সমস্ত পরিবারটার কথা ভেবে মনটা ভারি হয়ে উঠল। নিজে সে বিবাহ করবে না— অন্ধ বাপের পরিচর্যায় বিকিয়ে দেবে জীবনটা; কিন্তু লতু? কে বলবে পনের বছরের মেয়ে? না বেড়েছে দেহে, না মনে। এখনও কিশোরী বালিকার মত পাড়ায় পাড়ায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।

পায়ে পায়ে সে বাড়ির দিকে চলে আসে। হঠাৎ ভীষণ রাগ হ'য়ে গেল হেড মিস্ট্রেসের উপর। কি দরকার বাপু আপনার একটা গড়া জিনিস ভেঙ্গে দেওয়ার? সখের চাকরি করতে এসেছেন, ভালো না লাগে তাহ'লে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই পারেন। কিন্তু লতুটাকে এবার শাসনে আনতে হবে। এমন পাগলির মত পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে দেওয়া উচিত

নয়। বাবা মাকে সে কোনও দিনই মানে না—দিদিকেই বরং ভয় করে তবু একটু। লতুর আদর আবদারও সহ্য করতে হ'য়েছে অনেক নমিতাকে। সব জিনিসেরই কিন্তু সীমা থাকা উচিত। লতুরও বোঝা উচিত সে আর ছেলেমানুষ নেই। এভাবে ছেড়ে দিলে বিপদ হ'তেই বা কতক্ষণ? অবশ্য লতু খুব চালাক মেয়ে। বাংলা উপন্যাস পড়ে পড়ে অনেক কিছুই বুঝে ফেলেছে সে। তবু সাবধানের মার নেই।

: কে, লতু বুঝি?

: না বাবা, আমি।

: ও নমু। লতু কোথায় রে? দুপুর বেলা সেই যে বেরিয়েছে এখনও এল না তো?

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। স্নান ঘরে গিয়ে দেখে জলটাও তুলে রেখে যায়নি লতু। এক ফোঁটা জল নেই বাল্‌তিতে।

বিন্দুবাসিনী বলেন: ওমা একটুও জল নেই? আমি দেখছি।

: থাক্ আমিই নিয়ে আসছি, দাও।

মায়ের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নমিতা বেরিয়ে যায়। টিউব ওয়েল অনেকটা দূরে। ভীষণ রাগ হয় লতুটার উপর। কচি খুকি তো নয়। সারাদিন স্কুলে গরমে সেদ্ধ হ'য়ে দিদি ফিরবে—অথচ ঘরের একটি কাজও ক'রে রেখে যায়নি। হয় মা, নয় দিদি কেউ করুক! সকালবেলা যে ছেঁড়া কাপড়খানা কেচে জলচৌকির উপর রেখে গিয়েছিল সেখানাও মেলে দেওয়া হয়নি। ফলে স্কুলের ফর্সা কাপড়টা ছেড়ে রাখবার উপায়ও নেই। আর কেউ না জানুক মা তো জানে ওর বাইরে বেরুবার জন্য এই একখানা মাত্র শাড়ি। এটি কিনতে বাধ্য হ'য়েছে সে চাকরি পাওয়ার পর। মায়ের নাকছাবিটা হারাতে হয়েছে এজন্যেই। অথচ কেউ সংসারের কথা একটু ভাবে না! অন্যদিন স্কুল থেকে ফিরে সে এখানা খুলে রাখে। সন্তর্পণে ভাঁজ ক'রে রেখে দেয়। পরে ছেঁড়া শাড়িটা। আজ বাধ্য হ'য়ে এটাই পরে থাকতে হ'ল।

ডি/১১৫১ নম্বর বাড়িখানায় সম্প্রতি উঠে এসেছেন হরিপদ পণ্ডিত।

বাড়িটার লিন্টেল লেভেল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছিল। অর্থাৎ দরজা জানালায় মাথা পর্যন্ত। দু-খানি ঘর। 'ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের' অনুগ্রহে এর মাথায় খান-কয়েক করোগেটেড টিন চাপাতে পেরেছেন পণ্ডিত। ঘরের ভিতর ঢুকে তাই ভালো করে মাথা খাড়া ক'রে উঠে দাঁড়ানো যায় না। হরিশবাবু তেমন্যার্টার, বাড়িটা তিনি শেষ করেন নি বটে কিন্তু কয়েকটি গাঁদা ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে গেছেন। শুকিয়ে রয়েছে সেগুলো। লাগিয়েছিলেন কয়েকটা রজনীগন্ধাও। ফুল ধরেনি তাতে। সবুজ সতেজ ডাঁটা বেরিয়ে এসেছে তার ভিতর থেকে। তার মাথায় ঈষৎ লালচে-সবুজ কলির গুচ্ছ। আষাঢ় মাস পড়ে গেছে—তবু ফুল ধরেনি অযত্নের গাছে। সব গাছে যখন ফুল ঝরাবার সময় হ'য়ে এল তখন ফুল ফোটাতে বোধ হয় লজ্জাই পাচ্ছে ওর চারা গাছ। ভাবে নমিতা—নিজের দিকে চেয়েই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে বাপের কাছে।

প্রশ্ন করে: খেয়েছ কিছু?

: এখন আবার খাই না কি আমি?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে বৃদ্ধ বলেন: বাগানে যাবি না? চল ডাঁটা গাছগুলোর তলায় আগাছাগুলো তুলে দিই গে।

হরিশ মিত্রই লাগিয়েছিলেন ডাঁটা গাছগুলো।

নমিতা হেসে বলে: সে আমিই তুলব অখন রবিবারে। তুমি যেন তুলতে ব'স না। তাহ'লে আগাছা বলে ডাঁটা গাছগুলোই তুলে ফেলবে শেষে।

বৃদ্ধ হাসেন। তারপর আবার বলেন: তুই একটু বুঝিয়ে বলিস লতুকে। কি ধিঙ্গির মত সারাদিন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভালো লাগে না একটু। আমার কথা শোনে না—তোর মায়ের কথা তো কানেই তোলে না—কলোনীর ছেলেদের তো জানিস! অতবড় মেয়ে—বদনাম রটতে কতক্ষণ!

নমিতা প্রশ্ন করে: বাবলু এসেছিল আজ?

: ওই আর এক ছেলে! হতভাগা কোথাকার! আজ দশদিন হ'য়ে গেল

—এলনা একবার এ বাড়ি! লতুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল রাস্তায়। লতুকে বলেছে—সে সুখেই আছে—আসবে না এ বাড়ি।

: এটা বৌদির ভারি অন্যায়। এভাবে বাবলুকে আটকে রাখা।

: কিন্তু সেই বা কি করে? অনু তো বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারে না। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কে আছে যে জলটা তুলে আনে—বাজারটা ক'রে দেয়। থাক্ বাব্‌লু ওখানেই।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন: কিন্তু ওখানে থাকলে তো ও মানুষ হবে না। তুমিই তো আসবার সময় অনুকে বললে বাবলুকে মানুষ করবার জন্য আলাদা হ'চ্ছি আমরা!

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন: অসুস্থ মানুষটাকে সত্য কথা ব'লে এলেই কি খুশী হ'তে তোমরা?

নমিতা বলে: কিন্তু তাই বলে বাবলুকে কি একবার খোঁজ নিতেও পাঠাতে পারত না এ দশ দিনে?

বৃদ্ধ চুপ করে থাকেন। তারপর আবার প্রশ্ন করেন: টাকাটা পাঠিয়েছিস?

: হ্যাঁ বাবা।

: কবে?

: আজই।

: অনু কেমন আছে?

: তা তো জানি না।

: তা তো জানি না! কে নিয়ে গিয়েছিল টাকাটা। তুই না লতু?

: আমি মনি-অর্ডার করেছি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন বৃদ্ধ: কাজটা ভালো করিসনি নমু। লতুকে পাঠালেই পারতিস। অনুটা কেমন আছে জেনে আসত।

: সেও তো একটা খবর পাঠাতে পারত? তারও তো উচিত ছিল বাবলুকে এ বাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে একটা খবর দেওয়া!

নীরব থাকেন চক্রবর্তী।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : তার নিজেরই আসা উচিত ছিল বাবলুর হাত ধরে। অভাবের তাড়নায় অন্যায় যদি করেই থাকে কিছু—তার কি উচিত ছিলনা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ?

নমিতাও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, চুপ ক'রে গেল। একজন অপরিচিত যুবক এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করে। নমিতাও প্রতিনমস্কার করে। যুবকটির দেহাবয়ব সুগঠিত। চুলগুলি অযত্নবিন্যস্ত। জামাটার হাতা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। চোখে চশমা—খালি পা। নমিতা একটা মোড়া এগিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী উঠে যান ভিতরে। যুবকটি বলে : নমিতা চক্রবর্তী কার নাম ?

উত্তর দেন বৃদ্ধ : কে ?

প্রতি প্রশ্ন করে ভূষণ : আপনিই হরিপদ চক্রবর্তী মশাই ?

: হাঁ, বসুন। আপনি ?

বসেই ছিল যুবকটি। বলে : আমার নাম ভূষণ, ভূষণ রায়। এ ব্লকে ৭২৪নং প্লটে থাকি আমি। তা আপনার ঠিকানা শুনেছিলাম ২০৭ ?

: হাঁ, আমরা সম্প্রতি উঠে এসেছি।

: ও। দেখুন আমি এসেছিলাম আপনার মেয়ের কাছে। নমিতা দেবীর কাছে। আপনিই আশা করি।

নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

: ক'লকাতায় গোলদিঘীর ধারে হকার্স কর্নারে আমার একটা দোকান আছে। রেডিমেট-ফ্রক, ব্লাউস, ইজেরের দোকান। আপনাদের মত মেয়েদের দিয়ে আমরা জামা কাপড় বানিয়ে নিই। বিক্রি করি সেই দোকানে। অনেক মেয়ে আমাদের সরবরাহ দেয়। যারা সেলাই করতে জানে, সময়ও আছে যথেষ্ট, অথচ নেই মূলধন অথবা বিক্রি করার ব্যবস্থা, তারা এভাবে আমাদের সাহায্য করে। বিনিময়ে আমরাও মজুরি দিয়ে সাহায্য করি তাদের। আমার আছে কাপড়, আছে দোকান—আপনার আছে সেলাই শিক্ষা, আছে অধ্যবসায় ; আমি—

ওকে থামিয়ে দিয়ে নমিতা বলে : প্রথমত আমি সেলাই করতে জানি একথা জানলেন কার কাছে? আর দ্বিতীয়ত আমার অখণ্ড অবসর আছে এটাই বা ধরে নিলেন কি করে?

লোকটি একটুও অপ্রতিভ হয় না, বলে : এবার কঠিন প্রশ্ন করেছেন। আপনার এক নম্বর প্রশ্নের জবাব আমরা জহরী—ঠিক চিনে নিতে পারি। ক'দিন আগে সি. ডি. পি. এক্সিবিসনে আপনার কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা দেখি। সেখানেই আপনার ঠিকানা পাই। আর দ্বিতীয়ত অবসর না থাকার কোনও কারণ নেই। সংসারের কাজ ছাড়া দুপুরটা সব গৃহস্থ মেয়ের কাছেই অখণ্ড অবসর।

বৃদ্ধ হরিপদ যোগ দেন : নমিতা স্কুলে পড়ায়।

: নমিতা স্কুলে পড়ায়! টিচার! সর্বনাশ! মাপ করবেন—আমি জানতাম না। আচ্ছা আসি আমি।

সত্যিই উঠে দাঁড়ায় ভদ্রলোক। নমিতা ওর ভাবগতিক দেখে হেসে ফেলে। বলে : তা বলে পালাবার কি আছে?

: আছে নমিতা দেবী, আছে! কিছু মনে করবেন না আপনি—ঐ স্কুল-মাস্টার জীবটিকে আমি শৃঙ্গী, দন্তী প্রভৃতির পর্যায়েই ফেলি এবং চাণক্য বাক্য স্মরণ করে শত হস্ত দূর দিয়ে চলি—

স্কুলমাস্টার হরিপদ পণ্ডিত কথাটা বোধ হয় সহ্য করতে পারেন না। সংশোধন করে দেন : চাণক্য পণ্ডিত কিন্তু মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে সরে যেতে বলেন নি—

: কারণ তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। আমি মূর্খ মানুষ; মাস্টার মশাইদের ভয় করি! ছেলেবেলায় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

: তাই বুঝি আজও টিচার দেখলে দাঁড়িয়ে ওঠেন?—বলে নমিতা।

বসে পড়ে ভূষণ : নাঃ! আপনি আমাকে আবার বসিয়ে দিলেন দেখছি।

: বসিয়েছি বটে, তবে পথে বসাইনি। যদিও স্কুলে আমার অনেকটা সময়

কাটে, তবু রাত্রে আপনার কাজটা ক'রে দিতে পারব। সংসারের অবস্থা তো বুঝতে পারেন—যেটুকু আয় বাড়ানো যায়।

ভূষণ ঘনিয়ে বসে। নিজের পরিচয় দেয়। ভূষণের আদি নিবাস কুষ্টিয়া। কলোনীতে এসেছে একেবারে আদি পর্বেই। হাউস-বিল্ডিং লোন দিয়ে গড়ে তুলেছে একখানা বাড়ি। স্মল-ট্রেড লোনের অর্থে সুরু করেছে এই জামা কাপড়ের ব্যবসা। বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা পিসী আর মা-হারা দু বছরের মিঠুয়া। একটা হাতকল ছিল। মিঠুয়ার মা সুবালা একা হাতেই ভূষণের দোকানের জন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল সরবরাহ করত। অক্লান্ত পরিশ্রম করত সুবালা। সে মারা যাবার পর পিসীই চালায় কলটা; কিন্তু আজকাল বৃদ্ধার পক্ষে আর সম্ভব হ'চ্ছে না এতটা পরিশ্রম। মা-হারা নাতনীটাকে মানুষ করাই কঠিন হ'য়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া চোখে ছানিও পড়েছে। এদিকে ফ্যাসানও পালটাচ্ছে অনবরত। নূতন নমুনা এনে দিলে তার সেলাই খুলে 'কাট' বুঝে নিয়ে নতুন জামা কাটার মতো শিক্ষা নেই পিসীর। অথচ মামুলি জামার চাহিদা গেছে কমে। ফলে ভূষণ বিপদে পড়েছে। দিন কয়েক আগে উদয়নগরের অনতিদূরে সি. ডি. পি. টাউনসিপে একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল ভূষণ। সেখানে ওর নজরে পড়ে কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা। উদয়নগর কলোনীর নমিতা চক্রবর্তীর হাতের কাজ। খোঁজ নিতে নিতে ঠিক এসে পৌচেছে সন্ধানী ভূষণ।

নমিতা প্রশ্ন করে: সুবালা দেবী কতদিন মারা গেছেন?

: বছর দুই।

: সে কি, এই যে বল্লেন মিঠুয়ার বয়সও দু'বছর।

: হ্যাঁ, মিঠুয়া হবার সময় মারা যায় সে।

: তাহ'লে আবার বিয়ে করেন নি কেন এতদিনে?

ভূষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। প্রশ্নটার জবাব দিতে পারে না। নমিতাই বরং লজ্জিত হয়। এত অল্প পরিচয়ে এ রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা নিশ্চয়ই অশোভন হয়েছে তার তরফে। তাই

শুধ্‌রে নেবার জন্ত বলে : মানে, মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে আপনাকে।

কৈফিয়ৎটা নিজের কাছেও খুব জোরদার মনে হয় না। হরিপদ পণ্ডিতও বোধকরি কথাবার্তার ধরনটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, উনি বলে বসেন : সে কথা যাক্‌, এখন সেলাইয়ের কথা কি হচ্ছিল যেন···

নমিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলোচনাটা ভিন্ন পথে মোড় ঘোরায়। তাড়াতাড়ি কাজের কথা পাড়ে। কি জাতীয় জামা চাই। আগে তার নমুনা দেখাতে হবে। মজুরি কত পাওয়া যাবে সে কথাও নিঃসঙ্কোচে জেনে নেয়। ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে সমস্ত জেনে বুঝে কাজে হাত দেওয়া ভালো। বৃদ্ধ আবার যোগ দেন আলোচনায় : রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, তার উপর স্কুল। এর পরেও কি পারবি ও কাজ।

নমিতা ভূষণকেই প্রশ্ন করে : কি পরিমাণ মাল সরবরাহ চাই আপনার ?

: ধরুণ সপ্তাহে আধ ডজন ফ্রক, ছটা ব্লাউস আর ডজন খানেক ইজের বা সায়া।

: মাত্র ? এতেই চলবে আপনার দোকান ? এ থেকেই সব খরচ মিটিয়ে চলবে আপনার আমার সংসার ?

: ভুল করছেন নমিতা দেবী। আমার দোকানে অন্তত শ' চারেক টাকার মাল জমে আছে। সেটা তো খাপাতে হবে। আপনাকে দিয়ে কিছু চটকদার মাল বানিয়ে নেব যাতে তাই দেখে লোক দোকানে ভেড়ে। তারপর যখন দাম শুনে পিছপাও হ'বে তখন বার করব আমার ঐ মাল। তাছাড়া আপনার মত অনেক মেয়েই জামা সরবরাহ করে আমাকে।

আবার সুরু হয় গভীর আলোচনা। সেলাই কলটা পৌছে দিয়ে যাবে ভূষণ কালকেই—সেই সঙ্গে দিয়ে যাবে কিছু নতুন নমুনাও—আর ছিটের কাপড়।

আলোচনার মাঝখানেই এল লতু। প্রায় নাচতে নাচতেই এল। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটা লক্ষ্য হয়নি তার। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। এসেই বলে :

এই দিদি, তোকে একটা লোক খুঁজছিল। ঠিক যেমন বলেছিলাম আমি। চোখে চশমা, কোঁকড়া চুল।

হঠাৎ ভূত দেখার মতোই ভূষণকে দেখে একহাত জিব কাটে!

ভূষণ বলে: আপনার বোন বুঝি? দেখি দেখি খুকি—এদিকে এসোতো! এ জামাটা বুঝি আপনারই করা? প্রশ্নটা নমিতাকে।

খুকি।

লতু একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চলে যায় ভিতরে।

: কি হ'ল? —বিস্ময় ফুটে ওঠে ভূষণের চোখে।

: আপনি ওকে খুকি বলেছেন, তাই। উনি হ'চ্ছেন শ্রীমতী লতিকা দেবী!

: ও হো হো! বড় ভুল হ'য়ে গেছে তো! এই দেখুন—লেখা পড়া তো শিখিনি—তাই বিদ্যাসাগর মশায়ের উপদেশটা মনে থাকে না 'কানাকে কানা বলিও না, খুকিকে খুকি বলিও না'।

হরিপদ চক্রবর্তী জাত মাস্টার। ভুল উদ্ধৃতিটা আবার সংশোধন ক'রে দেন তিনি: না না, বিদ্যাসাগর মশাই ঠিক ও কথা বলেন নি।

ভূষণও মেনে নেয়, বলে: আজ্ঞে না, তিনি পণ্ডিত মানুষ, কানাকে কানা বলবেন কেন? তিনি কানাকে বলতেন পদ্মপলাশলোচন, খোঁড়াকে বলতেন তেনজিং নোরকে আর খুকিদের বলতেন শ্রীযুক্তেশ্বরী ঠান্‌দিদি মহাশয়া।

সশব্দে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। নমিতাও মুখ নিচু করে হাসি গোপন করতে। আর পাশের ঘরে ফুলতে থাকে লতু। আচ্ছা এর শোধ সে নেবে।

নমিতার যেন নতুন জীবন সুরু হ'য়েছে। উদয়াস্ত পরিশ্রম। সকালে, বিকালে, রাত্রে খচখচ খচখচ ক'রে কল চালায়। সুবালার কলটা পৌঁছে দিয়ে গেছে ভূষণ নমিতাদের বাড়ি। প্রথম সপ্তাহের শেষে ভূষণ এসে জামা-কাপড়গুলো হাতে নিয়ে কি খুসী। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নমিতার শিল্পকে। বলে,—এ রকম জিনিস দিতে পারলে যত দেবেন ততই নেব আমি।

আর কাটতি বাড়লে আমারও লাভ আপনারও লাভ।

: নিশ্চয়ই। পরস্পরের সাহায্যের জন্তই তো এ ব্যবস্থা।

নমিতা একটু ইতস্তত করে। মজুরিটা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার, কিন্তু এ পার্থিব প্রশ্নটা করতে কেমন যেন মন সরছে না। বিমুগ্ধ ভূষণ একটির পর একটি জামা পাট ভেঙ্গে দেখল আর সত্যিকারের শিল্প সমালোচকের মতোই প্রশংসা করল—ঠিক তার পরেই মজুরির কথাটা তোলা কেমন যেন বেমানান লাগে।

বিন্দুবাসিনী এসে দাঁড়ান দ্বারপ্রান্তে।

নমিতা বলে : আমার মা।

ভূষণ পায়ের ধুলো নিয়ে বলে : আজ আসি তবে ?

বিন্দুবাসিনী বলেন : এখনি যাবে ? তাড়া আছে কোন ?

: না তাড়া আর কিসের ?

: তবে একটু ব'সে যাওনা বাবা। উনি এখুনি এসে পড়বেন। আমি চায়ের জলটাও বসিয়ে দিই।

ভূষণ বলে : আপনার মেয়ের সেলাইয়ের হাত ভারি সুন্দর। আমার দোকান তো ডুবতে বসেছিল। এ যাত্রা বোধহয় উনিই রক্ষা করলেন।

নমিতা প্রতিবাদ করে : সে কি কথা ভূষণবাবু ? আপনি মজুরি দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। দুঃখীর সংসারে আপনিই বরং সাহায্য করছেন। আপনিই বাঁচালেন আমাদের।

লতু দরজার ওপাশ থেকে বলে : তবে বোধহয় দুটি প্রাণই দুজনের জন্ত বেঁচে আছে !

ওরা চম্‌কে ওঠে। ভূষণ বলে : কে ঠান্‌দি না ?

নমিতা জবাব দিতে পারে না। সেলাইয়ের কাপড়গুলো নিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে লতু বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। নমিতা বলে : একেবারে গোল্লায় গেছিস তুই। কাকে কি বলতে হয় তাও জানিস না !

জবাব দেবার মত অবস্থা নয় লতুর। সে ভুসরে ভুসরে হাসছে খালি।

সেলাইগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নমিতা বলে : নে, এগুলো বেঁধে দে। আমি চায়ের জলটা বসিয়ে দিই।

লতু বলে : দায় পড়েছে আমার !

নমিতা চলে যায়। লতু কি ভাবে এক মিনিট। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে চট ক'রে কি যেন লেখে। কাগজটা ভাঁজ ক'রে রেখে দেয় একটা ব্লাউসের ভিতর। তারপর সবগুলো পাট ক'রে বেঁধে দেয়।

ভূষণ একাই বসে ছিল বাইরে। বিন্দুবাসিনী সন্ধ্যা জ্বালতে উঠে গেছেন। হরিপদ এখনও ফেরেননি। এককাপ চা আর দু'টো নারকেলের নাড়ু একটা প্লেটে নিয়ে প্রবেশ করে নমিতা। প্যাকেটটাও এগিয়ে দেয়।

ভূষণ বলে : একটা কথা। ঐ হলুদ রঙের বেবি ফ্রকটার কিন্তু মজুরি পাবেন না।

: কেন ? আমার অপরাধ ?

: ওটা মিঠুকে দেবে তার মাসিমা।

: ও, তা বেশ তো। তাহ'লে কিন্তু একটা সর্ত আছে। মিঠুকে নিয়ে আসতে হ'বে। তার মাসিমাই নিজে হাতে দেবে জামাটা।

ভূষণ রাজি হয়। পরের দিন মিঠুকে আসবে বলে কথা দেয়। তারপর ভূষণ বলতে থাকে তার সংসারের কথা। সুখ দুঃখের ইতিহাস। ক্রমে ওঠে কলোনীর সামগ্রিক ভালমন্দের কথা।

রবিবারে মিটিং করা হ'চ্ছে। সকলকে ষোলো আনার ডাকে আসবার জন্য আহ্বান করা হ'য়েছে। সেখানে ইচ্ছা করলে নমিতাও যেতে পারে।

নমিতা বলে : আমি কেন ? আপনারাই ও সব করুন।

ভূষণ মাথা নাড়ে। বাগাড়ম্বর ক'রে বোঝাতে চায়—মেয়েরাও এগিয়ে না এলে কিছুতেই কিছু হবে না।

ক্রমে হরিপদও এসে যোগ দেন আলোচনায়।

লতু কিন্তু আসে না।

ভূষণ চলে গেলে নমিতা বলে—তুই যে লুকিয়ে বসে থাকলি ?

: তবে কি নাচব তোমার ঐ ভুষণ্ডীকাকের সামনে গিয়ে ?

নমিতা হেসে ফেলে : তাতেই বা দোষ কি ? তুই তো ওর কাছে এখনও খুকি !

: ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু দিদি ! ওঃ, কী আমার আপন জনরে ! মিঠুর জন্যে জামা ক'রে দেবে তার মাসি ! কেন, মাসি কেন ? পিসী হ'তে কি দোষ ?

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে নমিতা : ও, তা বুঝি জানিস না ? ঐ ভুষণ্ডীকাক যে বলে গেছে মিঠুকে শিখিয়ে দেবে তোকে 'মা' ডাকতে। তোকে মা ডাকলে তো আমাকে মাসিই ডাকতে হয়।

দুম করে একটা কিল মারে লতু দিদির পিঠে।

খেলার মাঠের ধারে রবিবার বিরাট জনসমাবেশ হ'ল।

ভূষণ অথবা যোগেনের আশার সীমারেখা ছাড়ালো জনসংখ্যা। প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা হ'ত যথেষ্টই। চায়ের দোকানে, বাজারে, স্টেশনে অপেক্ষমান জনতার মুখে মুখে রোজই ফেরে নানান অভিযোগের কাহিনী। একপক্ষ অভিযোগ করে, অপর পক্ষ ধৈর্য ধরে সবটা শোনে না—তার আগেই সে পেশ ক'রে বসে তার অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলিত হ'য়ে গাল পাড়ে তৃতীয়পক্ষকে। সে তৃতীয়পক্ষ কখনও কলোনী পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিরা, কখনও সরকার, কখনও বা স্বয়ং ভগবান। তৃতীয় অভিযোক্তার কথা জানি না তবে বাকি কজন সে গালকে গ্রাহ্যও করে না। আজ সভা ক'রে গালপাড়া হ'বে শুনে ওরা উৎসাহভরে সবাই জমায়েত হ'ল।

প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোক্তা তৃতীয় অভিযোক্তার মতোই রইলেন অনুপস্থিত। সভায় বক্তারা একে একে অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। কি কি চাই—তার একটা লম্বা ফিরিস্তি করা হ'ল। স্কুলের পাকাঘর, পাকা-রাস্তা, নূতন টিউবওয়েল, পুরানো নলকূপগুলির সংস্কার।

আর চাই কাজ! কর্মের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন। অশক্তদের ফ্রি ডোল।

মত্তিবিড়ি ফ্যাক্‌টারির জীবেন চাকি বলে: সবার আগে বাইন্ড্যা দিতি অইব অগোর পঞ্চাইৎ।

: বাংতে অইব কি কও? অগো তো বাইন্ড্যা দিছিই! ও পঞ্চাইৎরে আমরায় মানি না।

একটা বন্দোবস্ত বোধহয় আগের থেকেই করা ছিল; পিছন থেকে কে চিৎকার ক'রে ওঠে 'কলোনী পঞ্চায়েৎ—'

অনেকগুলি কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—'ধ্বংস হোক্‌!'

বারবার তিনবার। ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর বাড়ে।

: পঞ্চায়েতের বিধান—

: মান্‌বনা, মান্‌ব না!

যোগেন নায়েক উঠে দাঁড়ায়। বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে: ভাইসব! আপনারা সকলে একবাক্যে জানিয়েছেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতকে আপনারা মানেন না। কেন মানেন না তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই। এ পঞ্চায়েতের পক্ষপাতিত্বের কথা, আত্মীয় পোষণের প্রচেষ্টা, ঘুষ খাওয়ার কেচ্ছা সবাই জানেন, আমরা আশা করেছিলাম—তাঁদের কেউ কেউ এ সভায় আসবেন। এলে আমরা আমাদের অভিযোগ পেশ করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা এখানে অনুপস্থিত।

সভায় একটা গণ্ডগোল হয়। কেউ বলে: আইব কুইথ্যাক্যা? আইলে হালাগো কৈফিয়ৎ দিতি হইব না?

: ঘরের মধ্যই অগো যতো বিক্রম—সভায় আইবার মুখ আছে নাকি?

ভূষণ প্রভৃতি 'চুপ করুন, চুপ করুন,' ক'রে থামিয়ে দেয় গণ্ডগোল। যোগেন সুরু করে: সুতরাং সে সব ধিক্কারজনক আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম। আমরা মেনে নিচ্ছি এ সভার সকলেই বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর আস্থা হারিয়েছি। আমরা এ পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিতে চাই।

সভায় সমর্থনসূচক সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

প্রমোদের পলিটিক্স করার অভ্যাস আছে, চট্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলে:

এ সভায় এমন কেউ কি আছেন যিনি বর্তমান পঞ্চায়েৎকেই বহাল রাখতে চান? যদি থাকেন তো হাত তুলুন।

কোন হাতই ওঠে না।

যোগেন বলে: সভাপতি মশাই তা হ'লে লিখে নিন—এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

নিতাই কবিরাজ পূর্বেই সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। তিনি কি যেন নোট করেন।

যোগেন পুনরায় শুরু করে: তাহ'লে আমরা আমাদের এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাব এবং দাবী করব বর্তমান পঞ্চায়েতকে অবিলম্বে পদচ্যুত করতে। তাহ'লেই প্রশ্ন দাঁড়াবে নতুন কমিটি গঠনের। কলোনীর অন্তত সাত-আট শো লোক এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারাই নির্বাচন করে দিন।

মতিবিড়ি ফ্যাক্টরির জীবেন চাকি বলে: অখন তিনজনের একটা কমিটি করেন। পরে ভোট নিয়া পাকা কমিটি করবেন।

কানাই পাল বলে: আমারও তাই মত। আপাতত এ্যাডহক্ কমিটিই করা চলতে পারে।

ভূষণ বলে: তিনজনের কমিটি, তার একজন হবেন মুখপাত্র বা চেয়ারম্যান। আমি প্রস্তাব করছি বর্তমান সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিতাই কবিরাজ মশাই চেয়ারম্যান হ'ন—এবং তিনিই বাকি দুজনের নাম বলুন।

সভা একবাক্যে সমর্থন করে।

পিছন থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে ওঠে 'নিতাই ঠাকুর্দা—'

সমবেত কণ্ঠ: জিন্দাবাদ!

এটাও পূর্বপরিকল্পিত বোধহয়।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওদের থামতে বলেন। 'চুপ চুপ' একটা সাড়া পড়ে যায়। নিতাই কবিরাজ বলেন: আপনারা সবাই যদি চান তাহ'লে যতদিন না নির্বাচন করা জনকল্যাণ কমিটি গঠিত হ'চ্ছে ততদিন এ্যাডহক কমিটি পরিচালন করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। কিন্তু ভূষণ

তাঁদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত নই। বাকি দুজনকে আমি নমিনেশন দিয়ে স্থির করব না। তাহ'লে বস্তুত সেটা একজনের কমিটিই হ'য়ে যাবে। আপনারাই স্থির ক'রে বলুন বাকি দুজনের নাম।

কে একজন বলে : তাহ'লে একজন আমাদের জীবেন দা। মতিবিড়ি [illegible] জীবেন চাকি।

জীবেন তৎক্ষণাৎ উঠে আপত্তি দেয়। তার কারখানার ঝামেলা ছেড়ে সে এ দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

: তাহলে ভূষণ রায়। 'এ' ব্লকের ভূষণ বাবু।

সকলেই সমর্থন করে।

আর একজন ?

জীবেন প্রস্তাব করে যোগেনের নাম।

সভাপতি বলেন : যোগেন আর ভূষণ দুজনেই এ ব্লকের লোক। এটা ঠিক হ'বে না। তাছাড়া সম্ভব হ'লে একজন মহিলাকে আমরা কমিটিতে নিতে চাই। মেয়েদের অনেক অভাব অভিযোগ তিনি জানতে ও জানাতে পারবেন।

হারাণ দের ভাইপো পরাণ দে বলে : আমি প্রস্তাব করতে আছি যে আমাগো মাইয়া ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস্‌কে কমিটিতে লওয়া হউক।

বিস্ময়ের কথা! সভার সম্মুখে মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বসে ছিলেন। আর কোনও সরকারী পদস্থ কর্মচারিই অবশ্য আসেননি সভাতে। ক্যাসডোল-ক্লার্ক মৃণাল আর 'আর ও' সাহেবের ডেসপ্যাচার ক্লার্ক মিহির ছাড়া। হেডমিস্ট্রেস যে সভাতে উপস্থিত আছেন সেটা ভীড়ের অনেকেই এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

সুরেখা দেবী উঠে দাঁড়ান। জনতাকে মুখোমুখি করা তাঁর অভ্যাস আছে। কলেজে অনেক স্যোসালে ডিবেটিং সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে হ'য়েছে। পরিষ্কার কণ্ঠে বলেন : আপনাদের একজন আমাকে যে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আমি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারলে

ধন্য হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পক্ষে দুটি কারণে তা সম্ভবপর নয়। যদিও কর্মোপলক্ষ্যে আমি এখানকার বাসিন্দা—তবু আমি কলোনীর রেজিস্ট্রিভুক্ত লোক নই। দ্বিতীয়ত আমি সরকারী কাজ করি। আপনাদের এ সংগ্রামে আমার সহানুভূতি থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগ রাখা সম্ভব নয়। তবে নিতাই বাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কমিটিতে একজন মহিলা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই আমি প্রস্তাব করি আমাদের স্কুলের শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তীকে আপনারা কমিটিভুক্ত করতে পারেন। তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

নমিতা উপস্থিত ছিল সভায়। এ প্রস্তাবে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠ্‌ল। তবু এটুকু সে বুঝেছে যে এখনই প্রতিবাদ না করতে পারলে আর ভবিষ্যতে পরিত্রাণ পাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু এতগুলি লোকের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কথাই বলতে পারে না। হেডমিস্ট্রেসের দিকে চেয়ে যে কটি অসংলগ্ন কথা সে বলে তার কোনও অর্থ হয় না। হেডমিস্ট্রেস জনতার দিকে ফিরে বলেন: নমিতা সম্মত হ'য়েছে। তাকে এই গৌরবজনক পদ দেওয়ায় সে আমাকে বলছে আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে।

সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

নমিতা বসে পড়ে।

সভার শেষে ভূষণ এসে উদ্ধার করে নমিতাকে: আপনাকে আর আমাকে যে এরা এভাবে যুক্ত করে দেবে তা ভাবি নি।

নমিতা জবাব দিতে পারে না।

ভূষণ আবার বলে: কী এত ভাবছেন বলুন তো?

: ভাব্‌ছি আমারও তো চাকরি আছে স্কুলে। আমাকে কমিটিতে নেওয়া কি ঠিক হ'ল?

: সে দায়িত্ব হেডমিস্ট্রেসের। তিনিই আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। সভার বিবরণীতে সেটা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে।

: তাছাড়া—
: কি করবেন বলুন ; প্রজাপতির নির্বন্ধ !
নমিতা লাল হয়ে ওঠে।

ভূষণ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে নেয়। নিতাই ঠাকুর্দার কর্মপদ্ধতি ওকে বোঝাতে থাকে। পায়ে পায়ে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। জনতা মিটিং ভেঙ্গে চলেছে যে যার বাড়ি। কয়েকজন আঙুল দেখিয়ে ওদের দিকে দেখালো। কি যেন বলাবলি করছে সবাই। নমিতা অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ওর পাশাপাশি হেঁটে চলতে কেমন সঙ্কোচ বোধহয়। মনে পড়ে যায় কেমন অবলীলাক্রমে ভূষণ বল্লে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ! লোকটা অসভ্য কিন্তু।

ভূষণ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনা জনতাকে। সে এক নাগাড়ে বকতেই থাকে। এতগুলো লোকের ভালমন্দ এখন নির্ভর করছে তাদের উপর। এরা বাড়িঘর ফেলে, এসেছে পিছনে। ছিল পি. এল. ক্যাম্পে, সেখান থেকে গিয়েছিল পুনর্বাসনে সুদূর মধ্যপ্রদেশে—আবার ফিরে এসে উঠেছিল শেয়ালদ' হাওড়া স্টেশানে। তারপর এসে উঠেছে বর্তমানে উদয়নগর কলোনীতে। উইপোকার মত বারবার গড়ে তুলছে ঘরবাড়ি। ভেঙ্গে যাচ্ছে বারবার। তবু ক্ষেদ নেই এদের। আবার গড়তে চায় এরা নূতন বল্মীক ! প্ল্যানকরা কলোনীতে সারি সারি উইঢিপি গড়ে তুলছে এরা। হার মানবে না কিছুতেই !

অনিমেষের জ্বরটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বুকের বেদনাটাও। সুস্থ সবল জোয়ান মানুষটা ক্রমশই মিশে যাচ্ছে চৌকির সঙ্গে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে উঠেছে। চোখটা গিয়েছে বসে। সারা মুখে বেরিয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সারাদিনই গোঙায় যতক্ষণ জেগে থাকে। তার উপর ক'দিন ধরে জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। কাল রাত্রি থেকে আবার ভুল বকতে সুরু করেছে। কোটরগত চোখ দুটোয় ফুটে উঠ্‌ছে একটা ঘোলাটে তমসাচ্ছন্নতা। মাঝে মাঝে কামিনীকেও চিনতে পারছে না। কামিনীর রীতিমত ভয় হ'য়েছে। সে বুঝতে পারছে কোনও একটা অনিবার্য পরিণতির

দিকেই ছুটে চলেছে রোগী। বুকে তার পাষাণভার চেপে আছে, কিন্তু কাঁদবার উপায় নেই।

রাত্রি প্রভাত হ'লে অনিমেষের গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ওগো খিদে পেয়েছে ? খাবে কিছু ?

অনিমেষ মাথা নেড়ে জানায়—না।

খেতে চাইলে দেবার মত অবশ্য কিছু ছিল না ঘরে।

: খুব কষ্ট হ'চ্ছে কি ?

অনিমেষ জবাব দেয় না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ কামিনীর উদ্বেগনমিত মুখখানা ঠেলে দিয়ে বলে : দূর হ'! কেন ডাকছিস্ আমাকে ? আমি যাবো না!

কামিনী চুপ ক'রে বসে থাকে।

বাবলু সেই প্রথম দিনের পর আর আসেনি। বাবা-মা-দিদিদের নিয়ে আনন্দেই আছে সে—বৌদির কথা বোধ হয় মনেই পড়ে না। লতু অথবা নমিতা যে খবর নিতে আসবে না এটা জানা কথা। বাবলুই যখন এল না। নিজেই যাবে কিনা ভাবতে থাকে। কয়েক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়।

সেদিন অনিমেষের শরীরটা একটু ভালো ছিল—জ্বরটা কমে গিয়েছিল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করেছিল : মাঝে ক'দিন আমার হুঁস্ ছিল না, নয় ? আচ্ছা লতু কি বাবলু আসেনি ইতিমধ্যে ?

কামিনী মাথা নেড়ে জানায়—না!

: আশ্চর্য!

দুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

অনিমেষ আবার বলে : দেখ, কাল থেকে মনে হ'চ্ছে—এযাত্রা বোধ হয় আর বাঁচব না। তোমার কি হবে ?

কামিনীর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। অনিমেষের জ্বরতপ্ত কপোলে। অদ্ভুত সংযমে সে ধীরে ধীরে বলে : বাবাকে খবর দেব ?

: কখনও নয়! আমার দিব্যি থাকল বউ—আমার প্রাণ থাকতে তুমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে না! যেদিন যাবে শাঁখা ভেঙ্গে যাবে।

স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে কামিনী বলেছিল: ওগো তুমি চুপ কর। অনিমেষও যে নিরুদ্ধ অভিমানে এমনি করে ফুলছিল—এভাবে যে তার বহিঃ-প্রকাশ হতে পারে—কামিনীর তা ধারণা ছিল না।

সেই কথাগুলিই মনে পড়ল তার।

সন্ধ্যার দিকে অনিমেষ আর ডাকলে সাড়া দিল না।

কামিনী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

গোরাকে বসিয়ে রেখে বাইরে এল। এখনই কিছু একটা করতে হবে। গলিটা পার হ'য়েই পথচারীদের লুব্ধ-দৃষ্টিতে সচেতনতা ফিরে আসে তার। এ কাপড়খানা পরে—আর যাই হ'ক পথে বার হওয়া যায় না। আবার ফিরে আসে। ভিজে গামছাখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে। দ্বিতীয়বার পথে বার হ'তেই দেখা হয় বিষ্টুপদর সঙ্গে। পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সে।

: কই যাও?

পথ না পেয়ে কামিনী থেমে যায়। জবাব দেয় না।

: অনিমেষডা ক্যামন আছে?

কামিনী সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে বলে: ভালো নাই—দেখুন না এসে।

বিষ্টুপদ উদ্বিগ্ন হবার ভাব দেখায়। দুজনে ফিরে আসে বাড়িতে। বিষ্টুপদ অনিমেষের পাশে গিয়ে বসে। সান্ নেই তার। বিষ্টু নিজেকেই ধিক্কার দেয়। কী অপদার্থ সে! এমন একটি পূর্ণযৌবনা বধূ বাস করছে তার বাড়ির একশ' হাতের মধ্যে—একেবারে অসহায় অবস্থায়—যার স্বামী ডাকলে সাড়া দেয় না—আর বিষ্টুপদ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি?

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বলে: জ্বর যান্ বাড়তেছে লাগে বউ! এমন হৈছে আমারে একডা খবর দাও নাই ক্যান? কোন ডাক্তার ছাখতেছে?

: ডাক্তার? ডাক্তার ডাকব কি ক'রে?

: কও কি? আরে ছি ছি! করছ কি! আমারে কও নাই ক্যান?

কামিনী গায়ের গামছার একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে : আপনার সেই দশ টাকার এক পয়সাও শোধ দিতে পারিনি, আপনাকে ডাকব কোন্ মুখে ?

বিষ্টুপদ হেসে ওঠে, তারপর হঠাৎ ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলে : আমারে ডাকবা এই চাঁদমুখেই !

বলেই বেরিয়ে যায়।

কামিনীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ইচ্ছা করে উনানের ওপাশ থেকে একখান চেলাকাঠ তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয়। কিন্তু বিষ্টুপদ তার আগেই বেরিয়ে যায়। রাস্তার মোড় থেকে বলে : লালুবাবুরে ডাইক্যা আনতেছি বৌ !

কামিনী কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বিষ্টুপদ রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো বধূটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ডাক্তার ডাকতে যেতে তার মন সরে না। উদাস দৃষ্টি-মেলা সুগঠিত-তনু বধূটির সর্বাঙ্গ লেহন ক'রে ফেরে তার ক্ষুধিত দৃষ্টি। দক্ষিণ বাহুমূল অনাবৃত, হাঁটুর উপরে খানিকটা ফেঁসে গেছে শাড়িটা। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের আবরণীতে যৌবনকে শাসন করতে পারেনি মেয়েটি। বিষ্টুপদ কিছুতেই ফিরে যেতে পারে না। সাহস বেড়ে গেছে তার। ফিরে আসে পায়ে পায়ে। কামিনী টের পায় না—উদাস দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে !

: বৌ !

চম্‌কে ওঠে বধূটি !

: ডাক্তারবাবু বাইরের লুক। তোমার এ সজ্জা দেখলি মুনিঋষিরও মন টলে। কাপড়খান পালটে পর।

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না। সে বোঝে তার অসহায়তাকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ব্যঙ্গ করতেই ফিরে এসেছে লোকটা! সামনের দুটো দাঁত নেই। পানরসসিক্ত জিহ্বাটা দেখা যায় মুখের গহ্বরে। চোখে একটা সরীসৃপ-সুলভ লুব্ধ দৃষ্টি। এই ক্লেদাক্ত সরীসৃপটা তাকে ধীরে ধীরে পাকে পাকে জড়িয়ে

ফেলছে—এটা বুঝতে কামিনীর কষ্ট হয় না। কঠিনস্বরে বলে : আপনিও তো বাইরের লোক। আর শাড়ি থাকলে আপনার সামনেও এ বেশে বের হতাম না নিশ্চয়।

: কি কও! আমি তো ঘরেরই লুক। আমার আর দেখনের বাকি আছে কি। কত দ্যাখলাম, ফিরাবার কত ছাখবাম।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বিষ্টুপদ।

ওঘর থেকে অনিমেষের আর্ত কণ্ঠ ভেসে আসে। রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা। কামিনী ওর পাশে গিয়ে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে বুঝতে পেরেছে এই বার তার চরম পরীক্ষা এসে গেছে। সোনা দানা যা ছিল ঘরে অনেকদিনই ফুরিয়েছে তা, ঘটি বাটিও নিঃশেষিত হয়েছে। যেটুকু সম্পদ নিয়ে সে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসেছিল তিলে তিলে নিঃশেষিত হ'য়েছে তা। বাকি আছে হাতের একজোড়া শাঁখা আর সীমন্তে এক ফোঁটা সিঁদুর। ঐ নিঃশেষিত-প্রাণ রোগজীর্ণ মানুষটার বুকের একটু ধুক্‌ধুকানি। এই সে ভেবে এসেছিল এতদিন। আজ হঠাৎ বিষ্টুপদর লুব্ধ চোখের আরশিতে দেখেছে আরও এক সম্পদ আছে তার। সে সম্পদ তার নারীত্ব— তার পূর্ণ-যৌবনা দেহখানি। পরীক্ষা, পরীক্ষা! সমস্ত জীবনভর কঠিন পরীক্ষাই দিয়ে চলেছে সে। মাথা উঁচু ক'রে দেবতার সমস্ত অভিশাপই গ্রহণ করেছে। দুঃখরাত্রে সংসার তরীর-হাল ধরে দক্ষ নাবিকের মতোই পাড়ি জমিয়েছে এতদিন। আজ বোধ হয় চরমতম পরীক্ষা দেবার ডাক এসেছে ওর। নিষ্ঠুর পাষাণ-দেবতা যেন এইবার ওকে ডেকে বলছেন 'বেছে নাও, তোমার স্বামী-পুত্র একধারে, আর অন্যধারে তোমার সতীত্ব ধর্ম। কাকে চাও তুমি, বেছে নাও।'

ছুটে গিয়ে কামিনী দেওয়াল থেকে টেনে নামায় কালিঘাটের পটখানাকে ; বলে : তুমিও না মেয়েমানুষ! হতে পারো দেবতা—তবু মেয়ে মানুষ তো তুমি? বল, বল রাক্ষুসী—তোমাকে এ পরীক্ষায় ফেললে তুমি কী জবাব দিতে? তোমারও তো স্বামী পুত্র আছে—তুমিও তো মহাসতী!

: মা! আমার ভয় করছে!

মায়ের উন্মাদিনী মূর্তি দেখে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে গোরা।

কামিনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে: ভয় কি মাণিক? এই তো আমি। কোন ভয় নেই। ঘুমাও। ক্ষিদে পেয়েছে?

গোরা নির্জীবের মত শুয়ে মাথা নাড়ে: না!

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কামিনীর। কাল রাত্রেও গোরা কিছু খায়নি। বিকালে খেয়েছিল আধখানা পেঁপে। আজ এত বেলাতেও ওর ক্ষিদে পায়নি। অতটুকু ছেলে পর্যন্ত বুঝেছে মায়ের অসহায়তা। ঘরে কিছু নাই। মাকে করুণা ক'রে মিথ্যা বলছে সে। আর ঐ বিষ্টুপদ, ঐ নিষ্ঠুর ভগবান—তার অসহায়তা নিয়ে উল্লাস করে, ব্যঙ্গ করে। সে মানে না,—ঈশ্বর নাই! মা-কালী নাই! ফটোখানা সে নামিয়ে রাখে।

ওর মনের মধ্যেও জেগে উঠেছে বুঝি কালাপাহাড়—'থাহ্ কূলেও তুমি বোবা, তুমি কানা!'

: বৌ!

উঠে বসে কামিনী। বিষ্টুপদ ফিরে এসেছে। বিষ্টুপদ ওকে 'বৌ' বলে ডাকে কেন?

: ডাক্তারবাবু এসেছেন?

: না আয়েন নাই। এখান্ পড়্যা লও!

বিষ্টুপদর হাতে একটা লালপাড় তাঁতের শাড়ি।

কামিনী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

: লও লও! আর মশ্‌করা ক'র না!

: না!

: না ক্যান? কাপড় পড়বা না?

: না।

জিবের ডগাটা বেরিয়ে আসে বিষ্টুপদর। বলে: ঐ বস্ত্রহরণের গোপনারী সাজ্যাই থাকবা?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে কামিনীর। একটা অসহায় আক্রোশে ফুলতে থাকে।

বিষ্টুপদর সাহস বেড়ে যায়। খপ্ করে কামিনীর হাতখানা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গুঁজে দেয় শাড়িখানা ওর শাঁখাসর্বস্ব হাতে।

কামিনী আর সহ্য করতে পারে না। ঠাস্ করে মারে এক চড় বিষ্টুপদর গালে। বিষ্টুপদ এতটা আশঙ্কা করেনি। একটা অসহায় মেয়ে, বিবস্ত্রপ্রায় বধূর এতটা দুঃসাহস হবে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। এগিয়ে আসে একপা। হাত বাড়ায় ঐ নারী-মাংসের দিকে। কামিনী চিৎকার ক'রে উঠ্‌তে যায়। এক বিন্দু শব্দ বার হয় না তার কণ্ঠনালী দিয়ে। সভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে সে। পরমুহূর্তেই একটা ক্লেদাক্ত জান্তব আলিঙ্গনের আশঙ্কায় সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার ক'রে ওঠে গোরা '—মা!'

বিষ্টুপদ চম্‌কে ওঠে! অনিমেষের অবশ্য ঘুম ভাঙেনি; কিন্তু ঐ এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের আওয়াজটায় ঘরটা গম্‌গম্ করতে থাকে। সোজা হয়ে দাঁড়ায় কামিনী। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়েছে। সে নিঃসহায়া নয়! সে শুধু অসহায়া বধূ নয়—সে জননী! সন্তান সেকথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার মাতৃ-সম্বোধনে। বিষ্টুপদ কামিনীর চোখে দেখতে পায় সেই হিংস্রতা—যেটা ফুটে ওঠে নরহত্যাকারীর চোখে চরম মুহূর্তের পূর্বক্ষণে! বিষ্টুপদ গোরার উপস্থিতিতে আত্মসংবরণ করতে বাধ্য হয়। বলে: থাহ্‌কল তোমার শাড়ি। ডাক্তারের প্রেয়োজন বুঝল্যা আমারে খবর দিব্যা; ন্যাংটো হয়্যা আসবা না। শাড়িখান পইড়্যাই আসবা।

চলে যায় বিষ্টুপদ!

গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে কামিনী।

: আমার ভয় কি! আমার গোরাচাঁদ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ পারবে না আমার গায়ে হাত দিতে।

জননী আর পুত্রের অশ্রুস্রোত মিশে যায় ভি-ব্লকের একটা জীর্ণ কুটিরের একান্তে!

দুনিয়া সে খবর রাখে না!

নমিতার দিনগুলিতে যেন নতুন সুর লেগেছে। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ ক'রে গান গেয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে ঘুরে ফিরে ঐ একটা লোকের কথাই। ওর হাতের কাজ যে গিয়ে বিক্রি করছে ক'লকাতার বাজারে। স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ফর্সা শাড়িটা ছাড়ে না। গামছা দিয়ে রগড়ে মুখটা মোছে। কপালে পরে একটা লাল টিপ। পাউডার মাখা ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন। নতুন ক'রে কিনতে লজ্জা করে—লতু কি ভাববে।

সপ্তাহ কয়েক ঘন ঘন আসছে ভূষণ। এ সপ্তাহান্তেও আবার এল। এসেই বলে: কই আপনার বোন কোথায়। ডাকুন তো তাকে।

একটু ঘাবড়ে যায় নমিতা—কেন কি হয়েছে?

: আরে বাপরে বাপ্! ঠান্‌দিদি বলেছি বলে কি এ রকম রসিকতা করতে হয়? মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি সেদিন।

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। নমিতার তৈরী জামা-ফ্রকগুলো নিয়ে ভূষণ দোকানে রাখে। এ সপ্তাহে বিক্রি ভালোই হয়েছে। একদিন এক ভদ্র-মহিলা দোকানে এসে ত্রিশ ইঞ্চি ব্লাউস খোঁজেন। ভূষণ নমিতার করা ব্লাউসের বাণ্ডিলটা বার ক'রে দেয়। প্রথমটা খুলেই ভদ্রমহিলা একখণ্ড কাগজ আবিষ্কার করেন। সেটি দেখে তাঁর মুখ চোখ বেগুনি হয়ে ওঠে;—কাগজ-খানা দেন তিনি সঙ্গের ভদ্রলোককে। তিনি মারতে আসেন আর কি! খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা! প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। শেষে পাশের দোকানদারেরা রক্ষা করে। ভূষণ হাত জোর ক'রে বলে—দর্জির দোকান থেকে বাণ্ডিল-বাঁধা জামা এনেছে, ভিতরে কি কাগজ আছে সে জানে না। অনেক বকাঝকা ক'রে ওঁরা চলে যান। ভূষণ তখন কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে:

ভুষণ্ডী কাকের মত চেহারাটি প্রভু।
আরশি সামনে ল'য়ে দেখেছেন কভু ?

খরিদ্দার ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মহিলাটি এসেছিলেন তাঁর তনুদেহখানি ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গাত্রদাহ হবার এটাই হয়তো কারণ।

নতুকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ভূষণ বলে: একদিন আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি। পিসীমা আপনাকে দেখতে চান।

: বেশ তো, যাব।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ভূষণ। বিন্দুবাসিনী কখন উঠে যান। আজ নতুও বাড়ি নেই। হরিপদ মাস্টারও অনুপস্থিত। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়। ভূষণ বলে,—কি যে করি, সপ্তাহে দুদিন মাত্র বাড়িতে থাকি। একা একা মিঠুয়াটা সারা সপ্তাহ কাঁদে। আমাদের পাড়ায় ওর সমবয়সী নেই। পিসীমার সঙ্গে আর কী খেলা করবে। ও মেয়েটাকে মানুষ করাই কঠিন হ'য়ে উঠেছে।

: আপনার বোন-টোন নেই ?

এ প্রশ্নের মধ্যে হাসির কি আছে ? ভূষণ মিটি মিটি হাসতে থাকে।

নমিতা অস্বস্তি বোধ করে। ভূষণ অবশেষে বলে: ছিল, মারা গেছে।

: ও! তা হ'লে আবার একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন।

: আবার !—হাসে ভূষণ। এবার প্রকাশ্যেই।

: হাসি নয়। মেয়েটাকে তো মানুষ করতে হবে।

: সতীনের মেয়েকে যত্ন করবে কিনা—বুঝব কি ক'রে ? তার চেয়ে এ ভালো। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

: সব মেয়েই কিছু অমানুষ নয়। আপনি আগে থেকেই ওরকম ভাবছেন কেন ? বহু জায়গায় তো ঘোরা ফেরা করেন—দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে করুন।

ভূষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। নমিতা কেমন যেন অস্বস্তি

বোধ করে। ভূষণ ধীরে ধীরে বলে: আমি পছন্দ করলেও সে আমাকে পছন্দ করবে কিনা তার স্থিরতা কি? আমার চেহারাটা তো দেখেছেন— উপার্জনও এই সামান্য—লেখাপড়াও খুব কিছু একটা শিখিনি—তার উপর দোজবরে!

নমিতা জবাব দিতে পারে না। জবাব একটা দেওয়া উচিত—প্রতিবাদ করাটাই এক্ষেত্রে ভদ্রতা; কিন্তু ভূষণের ঐ স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি আর কাটা কাটা কথায় বেচারী কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। ভূষণই আবার বলে: আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

: আমি? আমি কি সাহায্য করব?

কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে নমিতার! বুকের ভিতর দুম্ দুম্ করে কে যেন ঘা মারে। পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়েটির মনে লেগেছে ঝড়ের স্পর্শ। এখুনি হয়তো ভেঙ্গে পড়বে একেবারে। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে যায় অতিক্রান্ত যৌবনের অনাদৃত ইতিহাস। দেশে থাকতে বাবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল নমিতাকে পাত্রস্থ করার। অনিমেষের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে হওয়ার কথা তার। সে বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়েছিল পাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ায়। সুস্থ হওয়ার পর পাত্রের পিতা গ্রহণ করতে রাজি হ'ন নি নমিতাকে। যার আগমন সম্ভাবনাতেই তাঁর পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে—সে মেয়ের বিষনিঃশ্বাস সহ্য হবে না তাঁর পুত্রের! তারপর থেকে হরিপদ পণ্ডিত মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন অপরিচিত ভদ্রলোকদের। বিন্দুবাসিনী সাজিয়ে দিতেন মেয়েকে মনের মতো ক'রে। এক রাজ্যের লজ্জা নিয়ে নমিতা গিয়ে বসত পরিদর্শকদের সম্মুখে। ওঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন, নাম জিজ্ঞাসা করতেন, হাতের লেখা দেখতে চাইতেন, হস্তরেখা দেখতেন। ওঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগতো, মনে হ'ত একটি মাত্র উত্তরের উপর হয়তো নির্ভর করছে তার জীবন, যৌবন—আশা আকাঙ্ক্ষা সব! তারপর ওঁরা চলে যেতেন। মেয়ে পছন্দ হয়নি কথাটা মোলায়েম ক'রে জানিয়ে দিতেন চিঠি লিখে।

সেই বিস্মৃতপ্রায় অনুভূতিটা জেগেছে আবার। নমিতার হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে ফিরে এসেছে সেদিনের সেই শিহরণ! নমিতা,—পঁচিশ বছরের অতিক্রান্ত-যৌবনা উদ্বাস্তু মেয়েটি!

ভূষণও একটু ইতস্তত ক'রে বলে: আপনার খোঁজে আছে নাকি ঐ রকম কোনও মেয়ে?

প্রশ্নটা সরল রেখায় সোজা পথে না এসে—একটু তীর্যক গতিতে আসায় নিঃশ্বাস ফেলে নমিতা। একটু সহজ বোধ করে। হেসে বলে: দেখি খোঁজ ক'রে। কিন্তু মিঠুকে আনার কথা ছিল যে আজ আপনার?

: আচ্ছা নিয়ে আসব এর পরের দিন।

নমিতা প্রসঙ্গটা বদলে নিতে চায়। জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর্দার কথা। গণ-কল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ অধুনাতম সংবাদটি জ্ঞাপন করে। ভূষণ আর নিতাইপদ ওয়েল-ফেয়ার-অফিসারকে জানিয়েছিলেন ওঁদের সেদিনকার মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত। তিনি সে সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হ'ন নি। তখন ওঁরা গিয়েছিলেন ক'লকাতায় উপরওয়ালার কাছে। সেখানে গিয়ে শুনে এসেছেন কলোনীতে আসছেন একজন নূতন অফিসার—এ্যাডমিনিস্ট্রেটর উদয়নগর কলোনী। তিনি এসে নূতন ক'রে সব ব্যবস্থা করবেন। এ কলোনীতে নাকি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। সেইজন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এখানেই এসে থাকবেন। এখন এঁরা অপেক্ষা করছেন সে ভদ্রলোকেরই।

নমিতা অধীর আগ্রহে সব শোনে।

পরদিন সকালে আবার অনিমেষের জ্বরটা কমে আসে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলে সে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে বটে আরও।

বলে: আজ বোধহয় জ্বরটা ছাড়ল, নয়?

কামিনীরও মনে হয় জ্বরটা খুব কমে গেছে। শুক্‌নো মুখে হাসি ফুটে ওঠে ওর।

অনিমেষে বলে: আচ্ছা এর মধ্যে কেউ আসেনি?

কামিনী চুপ ক'রে থাকে!

অনিমেষ বলে: আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকমটা হ'তে পারে। আর সকলের কথা ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু বাব্‌লু? সেও এল না একবার?

কামিনী যোগ দেয়: তা ছাড়া বাব্‌লুকেও যে ওঁরা আটকে রাখলেন—এ সংসারটা তাহ'লে কি করে চল্‌বে সেটা ওঁরা ভেবে দেখলেন না?

অনিমেষ বলে: আর বাবা যে ব'লে গেলেন নমিতা মাসে মাসে টাকা পাঠাবে—তাও তো পাঠাল না নমিতা।

: ঠাকুরঝি টাকা পাঠিয়েছিল—পনের টাকা।

: পাঠিয়েছিল? নিজে আসেনি? কে এনেছিল লতু না বাবলু?

: না, মনি অর্ডার পিয়ন!

অনিমেষ চুপ করে শুয়ে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না। হঠাৎ অনিমেষই আবার বলে: উঃ! এরপরেও বেঁচে থাকতে হবে। ছোট-বোনের এভাবে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলা ভিক্ষা অন্নে জীবন ধারণ করতে হবে! কি করব? আমি অসুস্থ, স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দেবার আমার ক্ষমতা নেই।

কামিনী বলে: সে টাকা আমি নিইনি গো। মনি অর্ডার ফেরত গেছে।

অনিমেষ চমকে ওঠে: নাওনি? তবে সংসার চল্‌ছে কি ক'রে?

কামিনী বলে: কই আর চল্‌ছে বল? কিন্তু তবু টাকাটা নিতে পারিনি আমি। ছোট বোন, ছোট ভাই এদের কারও হাতে পাঠাতে পারত টাকাটা—নিজে না এসেও। মনিঅর্ডার করেছেন! কুপনে কিচ্ছু লেখা নেই! আমি নিতে পারিনি টাকাটা!

অনিমেষ অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। টাকাটা ফেরত দেওয়ায় সে খুশী হয়েছে কি দুঃখিত হয়েছে তা বোঝা যায় না।

সে একমনে কি ভাবতে থাকে।

কামিনী বলে: কি ভাবছ অমন করে?

: ওঁরা কত দিন গেছেন বলতো?

: আজ সতের দিন।

: সত্তের দিন !—আর কোনও কথা বলে না। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। কামিনী উঠে যায়। ঘরের কাজকর্ম করতে থাকে। গোরাকে বসিয়ে দেয় বাপের মাথার কাছে। বলে মাথায় হাওয়া করতে। ছোট্ট গোরা একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করে অনিমেষকে।

অনিমেষের মস্তিষ্ক খুব ভালো কাজ করছে না। জ্বর ভোগ ক'রে দুর্বল লাগলে নিজেকে। তবু সে ভাবছিল ঐ একটা কথাই। সত্তের দিন চলে গেছেন ওঁরা? যতদূর মনে পড়ে ওঁরা চলে যাওয়ার সময় সংসারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—আর্থিক অবস্থাটা। তারপর সত্তের দিন চলেছে সংসার? তিনটি প্রাণীর সংসার বিনা উপার্জনে চলতে পারে এতদিন? নমিতা টাকা পাঠিয়েছিল—আর তা প্রত্যাখ্যান করেছে কামিনী? কিসের জোরে সে প্রত্যাখ্যান করে এ অর্থ? অভিমান? যার স্বামী মৃত্যুশয্যায়—শিশুসন্তান অনাহারে শুকিয়ে আসছে তার আবার অভিমান! তবে কি—?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে অনিমেষের। বাবা, মা, নমিতা, নন্তু, বাবলু—এতগুলি লোক একবার খোঁজও নিতে এল না? বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে যায় কেন সবাই? আর সবার কথা ছেড়ে দিলেও, বাবা? তিনি কিসের ভরসায় ছেড়ে গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে, একমাত্র বংশধর নাতিকে? যাবার দিনে কেন বলে গেলেন '...উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনু?'

গোরার হাতখানা টেনে নেয় অনিমেষ, বলে: আর হাওয়া করতে হবে না।—পাখাখানা রেখে দেয় গোরা।

: হাঁরে গোরা। আমি যখন ঘুমাই তখন কেউ এ বাড়িতে আসে?

: না তো বাবা।

: কেউ আসেনি? এ ক'দিনের মধ্যে কেউ আসেনি?

: বিষ্টু দোকানি এসেছিল একদিন।

বিষ্টুপদ! সেই চরিত্রহীন বদমায়েসটা!

: মাকে মারছিল বাবা! আমি কেঁদে ওঠায় ছেড়ে দিল।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে থাকে অনিমেষের। এটুকুই বোধহয় বাকি

ছিল! এর চেয়ে ছোট বোনের ভিক্ষা-অন্নে জীবনধারণ করা কি ভালো ছিল না!

দুপুরে আবার প্রবল জ্বর এল অনিমেষের।

কামিনী দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।

ক'দিন পরে ভূষণ আবার এল। এবার মিঠুকে নিয়েই। নমিতা দেখলো অবাক হয়ে বাপের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। ভূষণ কালো, মেয়েটি ফুট্-ফুটে। বোধহয় মায়ের রূপ পেয়েছে। অল্পেই নমিতার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নতুন জামা পেয়ে মিঠু খুব খুশী। লতু আজও পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। হরিপদ পণ্ডিত জানতে চাইলেন গণ-কল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ বলতে থাকে সব কথা বুঝিয়ে। নূতন এ্যাডনিমিস্ট্রেটর কার্যভার বুঝে নিয়েছেন। কলোনীতে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিতাই ঠাকুর্দা আর ভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলতে গিয়েছিলেন। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ধৈর্য ধরে ওঁদের বক্তব্য বিষয় শুনেছেন বটে তবে আশাপ্রদ কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নি। ঠাকুর্দা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর কলোনিবাসীর কোনও আস্থা নেই। ওরা সাধারণ লোকের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখছে। তাই নয়া পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। নির্বাচন স্থির করতে হবে নতুন পঞ্চায়েতের সভ্য।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব বলেছেন: আপনি যা বলছেন তাই যে কলোনিবাসী সবাই চায় তার প্রমাণ কি?

নিতাই ঠাকুর্দা মিটিঙের কথাটা উল্লেখ করেন। মিটিঙে যে সব প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছিল সেগুলো পেশ করেন।

বাগচিসাহেব বল্লেন: এ কলোনীতে দশবারো হাজার লোক। মাত্র সাত-আট শো লোক একটা সভা ক'রে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসেন সেটাকে সমস্ত কলোনিবাসীর ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া যায় না।

: কিন্তু মিটিঙে যদি এর চেয়ে বেশী লোক না আসে তাহ'লে আমরা কি করতে পারি?

: আপনারা কিছু করতে পারেন না; কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় আপনাদের আহ্বানে মাত্র সাত-আটশো লোকই সাড়া দিচ্ছে। ওতে প্রমাণ হয় আপনাদের [illegible] সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া এ মিটিঙে আপনাদের বর্তমান পঞ্চায়েতের কেউ উপস্থিত ছিল না। তাঁদের বক্তব্যও শোনেন নি আপনারা।

ভূষণ বলেছিল: আমরা তাদের ডেকেছিলাম। তাঁরা কেউ আসেন নি। সে দোষও আমাদের নয় নিশ্চয়ই।

নিতাই ঠাকুর্দা বলেছিলেন: আপনি যা বল্‌ছেন তাতে আপাত যুক্তি থাকলেও সে যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। মিটিঙ ডেকে বড় বড় রেসলুসন এতবার নেওয়া হয়েছে—যে মিটিঙের ডাকে এরা আর সাড়া দেয় না। স্তোকবাক্য আর আশ্বাস ওরা আর শুনতে চায় না। সুতরাং মিটিঙ ডেকে আমরা কলোনীর পাঁচ ছয় হাজার লোককে জোগাড় করতে পারব না—এটা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

বাগচি বলেন: তা হ'লে আপনি মেনে নিচ্ছেন অধিকাংশ লোক আপনার সঙ্গে একমত নয়?

: মোটেই তা নয়। আমি বল্‌ছি অধিকাংশই আমার পক্ষে। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে আপনি বর্তমান পঞ্চায়েতকে বলুন কালোনীর সামগ্রিক ভালমন্দ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটা মিটিঙ ডাকতে। সেখানে আমরাও আসব। আমাদের অভাব অভিযোগ পেশ করব। নথি-পত্র-সাক্ষী প্রমাণ সব নিয়ে আসব আমরা। ওঁরা জবাবদিহি ক'রে যদি আমাদের তুষ্ট করতে পারেন তাহ'লে ভালই।

'আর. ও.'যতীশবাবু বলেন: না না সেসব হবে না! তাহ'লে সে সভাতেই একটা গণ্ডগোল হবে—মারামারি বেধে যাবে।

বাগচি বলেন: তা কেন হবে? আমরা দরকার হ'লে আগে থেকে পুলিশ এনে রাখব।

'আর. ও.' বলেন: প্রথমেই এটা করবেন না স্যার।

: কেন বলুন তো ?

নিতাই ঠাকুর্দা বলেন : কেন তা উনি আমাদের সামনে বলতে পারবেন না। হয়তো আমরা চলে গেলেও পারবেন না। তবে কারণটা যে কি তা উনিও জানেন আমরাও জানি। আপনি সম্ভবত জানবেন দুদিন পরে—যদি জানবার চেষ্টা করেন।

ভ্রুকুঞ্চিত হয় বাগচি সাহেবের।

ঠাকুর্দা একভাবেই বলেন : আপনি রাগ করবেন না স্যার। কথাটা সত্যি। আপনিই বরং একটা মিটিঙ ডাকুন। সেখানে হাজির করুন আপনার পঞ্চায়েতের মেম্বারদের। আমরাও হাজির করব আমাদের অভিযোগ। নথি-পত্র-সাক্ষী-প্রমাণ। আপনি নতুন লোক। সব হয়তো বুঝবেন না, তাই আমরা অনুরোধ করব যে সভায় আর. ও.-সাহেব যেন উপস্থিত থাকেন।

আর. ও. বলে ওঠেন : আমি তো আগেই বলেছি মিটিঙ হবে না।

ঠাকুর্দা বলেন : আপনার আমলে হয়নি সে তো জানিই স্যার। এঁর আমলে হবে কিনা তাই জানতে চেয়েছি।

বাগচি বলেন : আচ্ছা আমি দুদিন সময় নিয়ে জানাচ্ছি আপনাদের।

ঠাকুর্দা বলেন : বেশ। তাই দেখুন!

ওঁরা আগ্রহ ভরে এই নবীন পরিবেশের কথা শোনেন ভূষণের কাছ থেকে। হরিপদ পণ্ডিত, বিন্দুবাসিনী আর নমিতা। গণকল্যাণ সমিতির কাজ সুরু হয়ে গেছে। ভূষণ বলে এরপর থেকে নমিতাকেও আসতে হবে। এভাবে পালিয়ে বেড়ালে চলবে না। আলোচনা জমে ওঠে। হঠাৎ একসময় নমিতা লক্ষ্য করে কখন উঠে গেছেন ওর বাবা আর মা। মিঠুও পাশের ঘরে একা একা বসে খেলা করছে।

ভূষণ বলে : সত্যিই আপনার সেলাইয়ের হাতটা ভারী সুন্দর। আপনার কাটগুলো খুব পছন্দ করছে লোকে।

নমিতা বলে : সে কৃতিত্ব আমার নয়। কাটগুলোর আবিষ্কার তো

আমি করিনি—কোনও একজন ঐ রকম প্রথম চালু করেছেন। আমি দেখে অনুকরণ করেছি মাত্র।

: ও ভাবে বল্লে তো সব কিছু সম্বন্ধেই যুক্তি দেখানো যায়। অমুক ভালো গান গায় বল্লে আমরা ধরে নিই না যে সে নিজে গানটা লিখেছে বা সুর দিয়েছে। কারও দেওয়া সুর নকলই করতে হবে গান গাইতে গেলে।

: আপনি বুঝি গান বাজনা খুব ভালোবাসেন।

: বাসতাম এককালে।

: অর্থাৎ এখন আর বাসেন না।

: এখনও হয়তো বাসি ;—কিন্তু সময় আর সুযোগ তো নেই—তাই ভালোবাসাটা গানবাজনা থেকে অন্য কিছুর উপর এসে পড়েছে।

নমিতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে : তা হ'লে বলব আপনি কোনও দিনই গান বাজনা ভালোবাসতেন না।

: কেন ?

: সত্যিকালের ভালোবাসলে কখনও সেটা ফুরিয়ে যেত না।

ভূষণও একটু চুপ ক'রে থাকে। তারপর বলে : আপনি যে কথা বলছেন ওটা মেয়েদের তরফের কথা। পুরুষমানুষ ও কথা কোনও দিন স্বীকার করে না।

নমিতা কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়।

ভূষণ বলে : আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা তো ?

নমিতা চমকে উঠে। আশ্চর্য ! ঠিক ঐ কথাই সে ভাবছিল।

ভূষণ হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

নমিতা অবাক হয়ে বলে : হাসছেন কেন ?

ভূষণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর শূন্যের দিকে চেয়ে বলতে থাকে :

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা যায় তখন ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি ফুরিয়ে গেল ! রোজ সন্ধ্যাবেলা একটা ক'রে ধূপকাঠি জেলে দিতাম

ওর ফটোর পাশে। কবে যে সেটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেছে জানি না। এখনও যন্ত্রচালিতের মতো একটি ক'রে ধূপকাঠি জেলে যাই—কিন্তু দিনান্তে একবারও তার কথা মনে পড়ে না। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কত নীচ, কিন্তু এটাই বোধহয় জীবনের ধর্ম!

নমিতা বলে: না, এর জন্যে আপনাকে দোষ দেব কেন? আমি তো সেদিন নিজেই বললাম আপনার আবার বিয়ে করা উচিত।

ভূষণ যোগ করে: হ্যাঁ আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে আমার জন্যে পাত্রীর খোঁজ করবেন।

নমিতা হেসে বলে: করছিই তো।

: এখনও খুঁজে পাননি কাউকে।

: কই আর পাচ্ছি বলুন।

: তবে আর খুঁজে কাজ নেই।

: কেন?

ভূষণ বলে,—কেন তাও কি বলে দিতে হবে? আচ্ছা বলছি। খোঁজের দরকার নেই কারণ সে রকম একটি মেয়ের খোঁজ আমি নিজেই পেয়েছি।

নমিতা মুখ তোলে। চোখাচোখী হয় ভূষণের সঙ্গে। ভূষণের ওষ্ঠে হাসির রেখা। মুখ নীচু করে নমিতা।

: শুধু আমার মতো দোজবরে ছেলেকে তার পছন্দ হবে কিনা এটাই জানা হয়নি।

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। হঠাৎ খুব নীচু স্বরে ভূষণ প্রশ্ন করে—

: তুমি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবে?

নমিতা ধরা গলায় বলে: আমি? বারে, আমি কি ক'রে জানব কার কথা বলছেন আপনি?

: আচ্ছা তবে থাক। আমি নিজেই না হয় জিজ্ঞাসা করব। করব?

নমিতার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বহে যায়। জবাব দিতে পারে না। ও ঘর থেকে মিঠু চিৎকার করে ওঠে: মাছি আমার ভয় করে।

নমিতা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তাড়াতাড়ি উঠে যায় ওঘরে। তেলাপোকাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে কোলে তুলে নেয়। দু'হাতের আলিঙ্গনে বুকের মাঝে পিষতে থাকে মিঠুকে।

মিঠু হাঁপিয়ে ওঠে, বলে : ছেড়ে দাও!

: না দেব না। আগে আমাকে 'মা' বল্।

: বলব না। তুমি তো মাছি!

: না, মা! বল্ শিগ্‌গির, নইলে—

চুমায় চুমায় অস্থির ক'রে তোলে মিঠুকে।

ওঘর থেকে ভূষণ ডাকে—আয় মিঠু বাড়ি যাই।

মিঠু এঘর থেকে বলে : ছাড়ে না যে।

বিন্দুবাসিনী একবাটি চা দিয়ে আসেন ভূষণকে। নমিতা নামিয়ে দেয় মিঠুকে। সে ওঘরে ছুটে যায়। নমিতা আর কিছুতেই ওর সামনে যেতে পারে না। রাজ্যের লজ্জা এসে ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ পর ভূষণ চলে যায় মিঠুকে নিয়ে।

আজ লতু সমস্তক্ষণই অনুপস্থিত।

লালু ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীটা পোস্ট অফিসের উল্টো দিকেই। সবাই চেনে সেটা। সকাল থেকেই লালুবাবুর ডিস্পেন্সারীতে রোগীর ভীড়। আর যে কোনও জিনিস দুষ্প্রাপ্য হোক রোগ আর রোগীর অভাব নেই কলোনীতে। লালু ডাক্তারের দুঃখ এইটুকুই—রোগীদের যদি সেই অনুপাতে 'ফি' দেবার ক্ষমতা থাকতো! দু বেলায় মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশটা রোগী দেখেন তিনি। সবাই আসে ওঁর ডিস্পেন্সারীতেই। বুড়ো মানুষ, বয়স হ'য়েছে। বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। রোজগার হয় সত্যিকারের ওষুধ বিক্রি থেকেই। ভিজিট দেবার ক্ষমতা আর কটা লোকের আছে? উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন বটে কিন্তু রোজগার কই? কোনও ছোট শহরে যদি গিয়ে বসতেন আর এর চার ভাগের একভাগ পশার হ'ত তাহ'লেও সচ্ছলভাবে

সংসার চলে যেত তাঁর। এক একবার মনে হয়—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবেন ; কিন্তু হয়ে ওঠে না।

ধর্মভীরু লোক লালু ডাক্তার। কালীসাধক তিনি। এ্যালোপাথ। সাত সকালে স্নানাহ্নিক সেরে গরদখানা প'রেই এসে বসেন ডাক্তারখানায়। সাত জাতকে ছুঁতে হয়। গরদ প'রে থাকলে সুবিধা আছে। তেষ্টা পেলে গঙ্গাজলটুকু অন্তত খাওয়া চলে। ডাক্তারখানায় একটা ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের বোতলে গঙ্গাজল রাখা আছে আলাদা ক'রে।

ভোরবেলা থেকেই রোগী আসতে সুরু করে। রুগী, রুগী আর রুগী। অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় তাদের। লালুবাবু গলায় চাদর দিয়ে যুক্তকরে দেওয়ালে প্রলম্বিত পটের ছবিগুলির তলায় মাথা ঠোকেন আর বিড়বিড় ক'রে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। বাইরে রোগীরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু উপায় কি ? ঘরের ভিতরে দেওয়ালের দেবতারাও যে কিউ দিয়ে আছেন। কোন দেবতাকেই চটাবার সাহস নেই ধর্মভীরু লালু ডাক্তারের।

কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের অপেক্ষমান জনতার মধ্যে। নিতাই বৈরাগী জনার্দন যুগীকে জিজ্ঞাসা করে : আজকাল করতাছোডা কি ?

: করবাম ফিরাবার কি ? বইয়াই আছি !

: ব্যাপারীর ব্যবসাটা ?

মাথা নাড়ে জনার্দন। তার মানে হতে পারে ভালো চলছে না। অথবা ছেড়ে দিয়েছে। সকলেরই এই অবস্থা। কর্মসংস্থানের যে কটা পথ ওরা দেখতে পেয়েছিল কলোনীতে এসে তার মধ্যে ব্যাপারীর ব্যবসাটাতেই লোক ঝুঁকেছিল বেশী। কালনা-ঘাট অথবা নবদ্বীপ থেকে চালের বস্তা কিনে সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে এসে এ পারে বিক্রি করা। দু' মনি বস্তা অনায়াসে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে নিয়ে আসতো ওরা কেরিয়ারে বেঁধে। জ্যোৎস্না রাত্রে সার দিয়ে চলতো সাইকেলের ক্যারাভান—একদলে ত্রিশ-চাল্লিশটা সাইকেল। জেলার সীমান্ত-রেখার এপার ওপার। মাইল সাত-আট পথ। পিচঢালা পরিষ্কার পথ। মনকরা চার আনা তো বটেই—ক্ষেত্র

বিশেষে আট-দশ আনাও লাভ থাকে। দিনে চার-পাঁচ ক্ষেপ মারতে পারলেই হ'ল। অবশ্য সীমান্তের দু পারেই খরচ আছে। তা থাক্—খরচখরচা বাদেও ওতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটা হ'য়ে যেত। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে কণ্ট্রোলের ব্যবস্থাটা গেল উঠে! ব্যবসাটাও উঠে গেল ফলে।

এ ছাড়া আর একদল করতো তরকারীর ব্যবসা। গ্রাম থেকে সস্তা দামে সব্জি কিনে এনে কলোনীর বাজারে বেচা। কিন্তু দুটি কারণে এ ব্যবসাটাও উঠে যেতে বসেছে। প্রথমত কলোনীতে ক্রেতার অভাব আর দ্বিতীয়ত বহু লোক ঢুকে পড়লো এ কাজে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশী এ ব্যবসায়ে। নামমাত্র একটা বাজার টিমটিম করছে কলোনীতে। কিছু লোক জনমজুর খাটতে যায় সদর শহরে অথবা জংসনে। ওরা যায় সকাল সাতটার লোকালে। ফেরার ঠিক নেই। যে কোন ট্রেণে ফিরলেই হ'ল। সব ট্রেণই উদয়-নগরে থামতে বাধ্য। টাইম-টেবিলে যাই লেখা থাক না কেন—সবাই জানে সব গাড়ীকেই দাঁড়াতে হবে উদয়-নগরে। সে মেলই হ'ক আর এক্সপ্রেসই হ'ক। কামরায় কামরায় শেকল আছে না? ঝুপঝাপ ক'রে নেমে পড়ে ওরা। প্রথম প্রথম মেলট্রেণের ড্রাইভার অথবা গার্ড অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করত—ক্রমশ তারাও এটা মেনে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধভাবে। একদল আছে হকার। হাজারো রকম সওদা নিয়ে ট্রেণে ট্রেণে ফিরি ক'রে ফেরে। ভিক্ষাজীবীও যথেষ্ট।

সবচেয়ে মুশ্‌কিল হ'য়েছে শিক্ষিত লোকদের। উদয়-নগর মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর কলোনী। শ্রমজীবী সংখ্যালঘিষ্ঠ। শিক্ষিত বেকার [illegible] হয়েছে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। না পারে তারা গায়ে খাটতে, না পায় চাকরি, না পারে হাত পাততে। চেষ্টার ত্রুটি নেই ওদের। নৈতিক বালাই যাদের অল্প তাদের মধ্যে কিছু লোক একটা ভালো ব্যবসা ফাঁদলো। রাজনীতির ব্যবসা! মিটিং ক'রে, বক্তৃতা ক'রে, ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে প্রশেসন করলো তারা। গড়ে উঠ্‌লো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। এসব দলের দলপতিদের যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লোন পাইয়ে দেবে বলে এরা সাধারণ

মানুষের মুরুব্বি সাজে। ট্রেডলোনই বল', ল্যাট্রিন লোনই বল' আর ম্যারেজ-গ্রান্টই বল'—কোনরকম সরকারী সাহায্য পেতে হ'লে নাকি খরচ করতে হয়। এ কথাটা সাধারণ কলোনীবাসি লোকমুখে শুনে শুনে ধ্রুব সত্য বলে' বুঝে নিয়েছে। কিন্তু খরচটা কিভাবে করতে হয় অনেকে জানে না। আন্দাজ করে হয়তো, তবে সাহস পায় না অনেক ক্ষেত্রে। তারা তখন মুরুব্বি খোঁজে। এরা সাহায্য চায় এমন লোকের যে গট্‌গট্ করে ঢুকে যেতে পারে আর. ও সাহেবের অফিস ঘরে স্লিপ না দিয়েই! সরকারী অফিসার হঠাৎ জীপ থামিয়ে যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলেন: অমলবাবু—আপনাদের ব্লকের সেই টি বি রুগীটির একটা বেড পাওয়া গেছে। আপনি একবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে অফিসে।

এই জাতীয় অমলবাবু, শিশিরবাবু প্রভৃতি জননেতার স্মরণাপন্ন হয় কলোনিবাসী। যারা এ জাতীয় জননেতা হয়ে উঠতে পারেনি তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত যুবক রোজগার করত শুধু দরখাস্ত লিখে দিয়ে। ফুলস্কাপ কাগজে লিখে দিত তারা আবেদন-পত্র। পত্র পিছু মজুরী দু'-আনা!

ঘরের ভিতরে লালুবাবুর সামনে বসে ছিলেন জংসনের ডাক্তার সেন। সেন শহরের ডাক্তার। নাম ডাক আছে। ক্লিনিক খুলেছেন একটা। ডাক্তার সেন বলছিলেন: আপনি কিন্তু আমার দিকটা একেবারেই দেখছেন না ডাঃ দত্ত। এ মাসেই অন্তত দুবার কন্‌সালটেসানে ডেকেছি আপনাকে আমি।

ডাক্তার দত্ত এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ড্রয়ার থেকে বার ক'রে এগিয়ে দেন সেনের দিকে। বলেন: ধরান। আমিই কি তা অস্বীকার করছি মশাই! কিন্তু কী করব বলুন। সে রকম কেস আমি পাই কই?

: এটা কি বিশ্বাস করতে বলেন? কলোনীতে এত রুগী—আপনার চেম্বারে এত ভীড়—আর ক্লিনিকাল কেস পান না আপনি? কলোনীতে টি. বি. কেসও হয় না?

: আরে হবে না কেন? প্রতি তিনখানা বাড়ি অন্তর একটা লোক ধুঁকছে। ক্লিনিক্যাল কেস অন্তত দুশ' পাঠাতে পারি আমি আজই। সকলেরই পরীক্ষা করানো দরকার। কিন্তু কেটে ফেললেও এক বেটার কাছ থেকে সিকিটা আদায় করতে পারবেন না। নামেই রাজরোগ, হয় যত বেটা হাড়-হাভাতের! লোন পাবার জন্য টাকা খরচ করছিস—কার্ডের লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে খরচ করছিস—আর শুধু ডাক্তারকে ফি দেবার সময়ই 'বড় গরীব স্যার, মাপ করুন লাগবো'?

ডাক্তার সেন চুপ ক'রে থাকেন। কি বলবেন তিনি?

শেষে বলেন: আচ্ছা, আজ আসি।

লালুবাবু বলেন: আরে বসুন, বসুন চা আনতে দিয়েছি।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরান। লালুবাবুর দেওয়া কাঁচি নয়—রেড এ্যাণ্ড হোয়াইড। নিজের পকেট থেকেই বার ক'রে ধরান। একরাশ ধোঁয়া ছাড়েন মুখ দিয়ে।

বাইরে থেকে নকুল নিবেদন করে: ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না স্যার।

: আচ্ছা একে একে পাঠাও স্লিপ দিয়ে।

ডাক্তার সেন হাসেন: বেশ আছেন মশাই আপনি। কিউ দিয়ে রুগী দাঁড়িয়েছে। আধুলি ক'রে দিলেও তো টাকা দশেক হ'য়ে যাবে এ বেলাতেই।

ডাক্তার দত্ত বলেন: দুঃখ তো ভাই। ডবল পয়সা হিসাবেও দেবে না বেটারা; আধুলি তো দূরের কথা। উল্টে ওষুধ চেয়ে বসে ধারে। আর এখানে আমার প্রেস্কৃপসান শুধু ধারেই কাটে—মানে আমার গলা পর্যন্ত!

একে একে রুগী প্রবেশ করে। নকুল, ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার তথা সহকারী। রোগীর নাম ধাম রেজিষ্ট্রিতে তুলে স্লিপ দিয়ে ভিতরে যাবার ছাড়পত্র দেয়। পরীক্ষা চলে। ওষুধ লেখা হয়। ওদিকের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায় ওরা।

বাইরে একটা গণ্ডগোল ওঠে।

লালুবাবু বিরক্ত হ'য়ে বলেন: কি হ'চ্ছে কি ওখানে, নকুল? এত গণ্ডগোল কিসের?

: এই দেখুন না স্যার। স্লিপ না নিয়েই জোর করে ঢুকতে চায়। সত্যিই জোর ক'রে ঢুকে পড়ে কামিনী ডাক্তারের ঘরে। লালুবাবু একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়ে থেকে যান। রুক্ষকেশা, স্খলিতবাসা, ঢাকাই বেনারসী পরা মেয়েটিকে দেখে সামলে নেন নিজেকে। নকুলকে বলেন: তুমি বাইরে যাও।

: ও স্যার স্লিপ নেয়নি।

: সে তো শুনলাম। এখন তুমি বাইরে যাও।

হতাশ নকুল হাত দুটো উল্টে দেয়। অর্থাৎ কর্তার মর্জি বোঝা ভার। বাইরে যেতে হয় তাকে। লালুবাবু চায়ের পাথর বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে অপাঙ্গে একবার দেখে নেন আপাদমস্তক।

: এখানে জোর করে ঢুকলে কেন তুমি?

কামিনী একেবারে মরিয়া হ'য়েই এসেছিল। আবেদন, অনুনয়, ভিক্ষা তো অনেক হ'ল। এবার সে দাবী জানাতে এসেছে। পথের মধ্যে একটা মানুষ আছাড় খেয়ে পড়লে আর পাঁচজনে তাকে ধরে তোলে। পথ্‌চলতি মানুষের এ একটা অলিখিত ধর্ম। জীবনের পথেই বা এ আইনটা প্রযোজ্য নয় কেন? মানব সভ্যতা প্রতিবেশীর কাছে এটুকু দাবী করতে পারে। সভ্যজগত এ দাবী মেনে নিতে বাধ্য। বলে: আমার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

ডাক্তারবাবুর উত্তর দিতে একটু দেরী হয়। তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন ওকে। মেয়েটির মস্তিষ্কবিকৃতি নেই তো? চোখদুটো টক্‌টকে লাল, মাথার চুলগুলো রুক্ষ—হয় বহুদিন তেল মেখে স্নান করে না অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই বেনারসী। মাঝে মাঝে ফেঁসে গেছে। ড্রেস ক্'রে পরেনি কিন্তু। সাধারণ করেই পরেছে।

লালুবাবু বলেন : এটা দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। ডাক্তারবাবুর প্রাপ্য না দিয়ে তুমি জোর করে ঢুকলে কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

: আপনার প্রাপ্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

: কিন্তু আমি তো দানছত্র খুলিনি। এটাই আমার জীবিকা। তোমরা যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দাও—

: দেব না কে বল্ল ? দেব। তবে এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তারবাবু একটু অবাক হন। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে করুণা ভিক্ষার কোনও আভাস নেই। যেন বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখাই লালু ডাক্তারের কর্তব্য—সে কথাটাই সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

: ধারে কারবার করি না আমি। তুমি যেতে পার।

হঠাৎ কামিনীর সব উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। মুখরার মতো এতক্ষণ এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলতে পেরেছে এটাই আশ্চর্য ওর মত ঘরের বধূর পক্ষে। ঐ একটি মাত্র কথায় বেচারী একেবারে নিভে যায়। বেদনার্ত হ'য়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে : ডাক্তারবাবু, আমরা বড় গরীব।

এটা চেনাসুর লালু ডাক্তারের কাছে। এতক্ষণে বাঁধাগতে ফিরে এসেছে কথোপকথন—ভাবেন লালু ডাক্তার।

: আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব। আপনি আমার স্বামীকে ভালো ক'রে দিন। আমি আপনার বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ক'রে শোধ দেব।

লালুবাবু বলেন : রোজ বিশপঁচিশটা মুমূর্ষু রোগী দেখি আমি। তারা সবাই গরীব। তারা সকলেই বলে ঝিয়ের কাজ ক'রে শোধ দেব আপনার ঋণ। ত্রিশটা ঝি তো লাগবে না আমার বাড়িতে।

কামিনী বসে পড়ে ওঁর পায়ের কাছে। লজ্জাশরম ত্যাগ করে হাত বাড়ায় ওঁর ফিতে বাঁধা জুতোর দিকে।

: আহ্! এ মেয়েটাতো জ্বালালে দেখছি! লাফ দিয়ে সরে যান ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ আত্মসম্মান ফিরে আসে কামিনীর। তড়িৎপৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায় সে!

ডাক্তার সেন হেসে বল্লেন: অবনক্সাস্! হাউ ডেয়ার সি এক্সিবিট হারসেল্ফ ইন সচ্ এ ট্রান্সপারেন্ট ড্রেসিং ক্লথ? শায়াও নেই হায়াও নেই!

কামিনী বুঝতে পারে না ওঁর ইংরাজি রসিকতা; কিন্তু শেষ কথাটায় আন্দাজ করতে পারে অশ্লীল ইঙ্গিতটা। জ্বলে ওঠে ওর চোখ। বলে: কী! কী বল্লেন?

জবাব দেন লালুবাবুই: কি করবে বল? কৌরব সভায় দ্রৌপদী নারায়ণকেই স্মরণ করেছিলেন। ডাকো, ভগবানকে ডাকো। পারলে তিনিই ভালো করে দেবেন তোমার স্বামীকে। না হয় নিয়ে এসো তাকে একটা অষুধ দেব অখন দেখে শুনে। এবার যাও দেখি!

: যাচ্ছি, যাচ্ছি, নারায়ণকেই ডাকব আমি! মনে ভাববেন না আমার সে ডাক ব্যর্থ হবে। ভগবান না করুন বিনা চিকিৎসায় যদি আমার স্বামীর কিছু হয় তখন দেখবেন এ দ্রৌপদীর অভিশাপও ফলবে। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন আপনারা! ভুলে যাবেন না কৌরবকুল নির্বংশ হ'য়েছিল ঐ দ্রৌপদীর অপমানেই!

এক ফোঁটা জল নেই আর কামিনীর চোখে। কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে আসে। লাল বেনারসী শাড়ি পরা নববধূর সজ্জায় সেজেছে সে। মনে হ'চ্ছে ওর সারা দেহে যেন আগুন ধরে গেছে। সে আগুনের শিখায় জ্বলে উঠেছে ওর দেহ-মন-অন্তরাত্মা!

বাড়িতে ফিরে এসে দেখে অনিমেষ তখনও আচ্ছন্নের মত পড়ে। গোরা বসে আছে ওর বাপের মাথার কাছে! বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। রৌদ্র কড়া হয়েছে। কামিনী ঘরে ঢুকে গোরাকে প্রশ্ন করে: হাঁরে, তোর বাবা উঠেছিল এর মধ্যে?

: হাঁ মা, একবার আমাকে বল্লে 'কোথা থেকে টাকা পাচ্ছিস'? আমি তো মা টাকার কথা জানি না কিছু।

: ও কিছু নয় বাবা!

: বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা—পেঁপে আর আছে?

কামিনী ইতস্তত করে। ঘরে গিয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে। বিক্রয় করার মত, বাঁধা দেওয়ার মত কিছুই নজরে পড়ে না। তাছাড়া সে ব্যবস্থাই বা করবে কে? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে বেনারসী শাড়ির জরিও বিক্রয় হয়। হোক পুরানো শাড়ি—তবু ওর জরিগুলোর কিছু একটা দাম হবেই। কাপড়টা ছেড়ে—শাড়িখানা হাতে নিয়ে ইতস্তত করে। পুরানো কাপড়খানাই আবার পরেছে। এটা পরে, আর যাই হ'ক পথে বার হওয়া যায় না।

: হাঁরে গোরা, তুই মেয়েস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের বাড়ী চিনিস?

গোরা জানায় সে চেনে।

কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে: একবার যা তো তাঁর কাছে।

শাড়িখানা একটা কাগজে জড়িয়ে দেয়। গোরার হাতে দিয়ে বলে—এখানা নিয়ে যা। একখানা চিঠি লিখে দেয় সে হেডমিস্ট্রেস্ সুরেখা দেবীকে। লেখে তার স্বামীর অবস্থার কথা, অর্থহীনতার কথা। পরিশেষে লেখে 'এখানা আমার বিয়ের বেনারসী। পুরানো হ'য়ে এসেছে যদিও, তবু জরির দাম একটা কিছু হ'বেই। এটা রেখে আপনি যদি গোটা পাঁচেক টাকা ছেলেটির হাতে পাঠান তাহ'লে ওকে কিছু কিনে খেতে দিতে পারি।'

গোরা বলে: কিছু নেই? একটা কিছু খেয়ে গেলে হ'ত?

কামিনী ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলে: এই চিঠিখানা নিয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছে গেলে উনি পাঁচটা টাকা দেবেন। তখন ফেরার পথে বরং চার আনার সন্দেশ কিনে খাস্। দেখিস্, হারাস না যেন টাকাটা।

ছোট্ট গোরা ঘাড় নাড়ে। হারাবে কেন? ঐ তো হেডমিস্টেসের বাড়ি—ফুটবল খেলার মাঠের পাশে। আর খাবারের দোকান তো গলির মুখেই। ঠিক পারবে সে।

গোরা চলে গেলে কামিনী স্বামীর মাথার কাছে গিয়ে বসে।

: কোথায় গিয়েছিলে সাত সকালে?

কামিনী চম্‌কে ওঠে। অনিমেষ যে জেগে আছে বুঝতে পারেনি সে। বলে : [illegible] কাছে ?

: সত্যি বলছ ?

: মিথ্যে বলব কেন ?—অবাক হয় কামিনী।

গম্ভীর হ'য়ে যায় অনিশেষ। চোখ দুটি বুজে আসে।

দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

কামিনী এসে খুলে দেয়।

লালু ডাক্তার !

: তোমার স্বামীকে একবার দেখতে এলাম। কোথায় সে ?

কামিনী বিস্মিত হওয়াও ভুলে গেছে। যন্ত্রচালিতের মত অনিমেষকে দেখিয়ে দেয়। লালুবাবু এসে অনিমেষের নাড়ি দেখেন। চোখ বুঁজে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে সে। স্টেথো দিয়ে বুক দেখেন। পরীক্ষা শেষ ক'রে জানতে চান কতদিনের অসুখ—অন্যান্য বিবরণ। মোহগ্রস্তের মতো জবাব দিয়ে যায় কামিনী। ডাক্তারবাবু জানতে চান—বাড়িতে আর কে আছে। কামিনী জানায় সে একাকী।

: কি বুঝলেন আমায় বলুন। অনেক সহ্য করেছি ডাক্তারবাবু—সব খুলে বলুন—আমি সহ্য করতে পারব। লুকোবেন না কিছু।

লালুবাবু খস্‌খস্ ক'রে একটা প্রেসক্রপসান লিখে দেন : দিনে তিনবার খাবে এটা।

: কি হ'য়েছে ওঁর ?

: হয়েছে অনেক কিছুই। রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তবে যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে না বেঁচে ওঠার কোনও কারণ নেই।

: ডাক্তারবাবু আমি আপনার কেনা হ'য়ে থাকব—

ডাক্তারবাবু যন্ত্রপাতিগুলি গুছিয়ে তোলেন নীরবে।

: প্রেসক্রপসান লিখে দিলেন—কিনব কি করে আমি ? আমার হাতে কি একটা পয়সা আছে ?

: তার আমি কি করতে পারি বল? আমি চিকিৎসক—পরামর্শ ই দিতে পারি শুধু।

কামিনী চটে যায়: ওষুধ কেনার ক্ষমতা যে আমায় নেই একথা তো জানতেন আপনি। তা হ'লে এলেন কেন?

লালুবাবু বলেন: এক শিশি ওষুধ খাওয়ালেই তো চিকিৎসা শেষ হবে না। তা যদি হ'ত না হয় নিজের পকেট থেকেই ওষুধের খরচটা দিতাম আমি। এ রোগীর সমস্ত চিকিৎসার ভার তো আমি নিতে পারব না।

: তবে কি বিনা চিকিৎসায় লোকটা শেষ হ'য়ে যাবে?—তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে কামিনী।

লালুবাবু চুপ ক'রে থাকেন। কি বলতে পারেন তিনি। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকায় অনিমেষ। ঘোলাটে-লাল দুটো চোখ। কেউ খেয়াল করে না।

কামিনী কি যে করবে ভেবে পায় না। তারপর যেন সমস্ত বিশ্ব-জগতের উপর তার নিরুদ্ধ আক্রোশ ভেঙে পড়ে লালুবাবুর উপর।

: চিকিৎসা করলে লোকটা বাঁচতে পারে—তবু তাকে দেখবে না কেউ? বাপ-মা দেখবে না—ভাই-বোন দেখবে না! তারা সবাই টাকা চিনেছে! লোকটা বেকার! আপনিও ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন না! ও যে বেকার আজ! বেশ মরুক তবে ও! কিন্তু দেখবেন আপনি—এতে কখনও ভালো হবে না আপনাদের!—কেঁদে ফেলে সে।

লালুবাবু যাবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন: তুমি অভিশাপ দিও না মা।

: দেব না? কেন দেব না?—উন্মাদিনীর মত চীৎকার করে ওঠে কামিনী!

ধীর কণ্ঠে লালুবাবু বলেন: বেশ দাও! আর আমার ভয় নেই। একটা কথা বলি মা—কিছু মনে কর না। আমি তোমার বাপের বয়সী! এখন যে শাড়িখানা পরে আছ তাতে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি

না। আমার ডাক্তারখানায় গিয়েছিলে দেখলাম পাতলা একখানা ঢাকাই বেনারসী পরে—চৌকির নিচে ধুলোয় লোটাচ্ছে দেখছি একখানা পাট-না-ভাঙ্গা আনকোরা নতুন তাঁতের শাড়ি! অথচ তোমার হাতে ওষুধ কেনায় টাকা নেই বলছ; এ থেকে যদি কেউ…থাক্ মা! ঘরে অচৈতন্য স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই—মনে হ'চ্ছে ভদ্রঘরের বধূ ছিলে একদিন। এভাবে কি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তোমার স্বামীকে?

কামিনীর দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণে সচেতন হয় সে নিজ দেহসজ্জার দিকে। সঙ্কোচে মরমে মরে যায়। বলে: বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু—

লালুবাবু হাত দুটি জোড় ক'রে বলেন: থাক্ মা ও কথা। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি আমি। মনে ভেবেছিলাম—হয়তো ঘরে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই—ভদ্রঘরের কোন সতী মেয়ের অভিশাপ লাগবে আমার। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। সারা গা ঢাকার মত নতুন শাড়ি মেজেতে লুটাচ্ছে তবু যে মেয়ে—থাক্ ও কথা! ডাক্তারবাবুর কর্তব্য আমি ক'রে গেলাম। আর আমাকে ডাকতে যেও না যেন।

কোনদিকে না তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার লালমোহন দত্ত। কামিনী মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। এত লোক এতবার তাকে অপমান করেছে—রূঢ় ভাষায় সে প্রতিবাদ করে এসেছে এতদিন। এবার ধীর স্থির কণ্ঠে যে লজ্জাকর কথাগুলি বলে গেলেন ডাক্তার-বাবু তার প্রতিবাদ করার ভাষা জোগালো না ওর মুখে। কোনও জবাব দিতে পারলে না। মনে হল সবই বুঝি ফুরিয়ে গেল। স্বামীকেও বাঁচাতে পারলো না—সতীত্বের অভিমানও হ'ল ভূলুণ্ঠিত। হঠাৎ খাটের নীচে থেকে নূতন তাঁতের শাড়িটা টেনে বার করল। এটাকে এখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শাড়িটা এ বাড়িতে এখনও রয়েছে বলেই অপদেবতার স্পর্শ লেগে রয়েছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঐ শাড়িটা দিয়েছিল একটা নারীমাংসলোলুপ কামুক জানোয়ার।

স্বাক্ষর দিয়েছিল সে—একটা নারীদেহের প্রতি অগ্রিম দাবী জানিয়ে। এটার সমাপ্তি করতে হবে এখনই।

হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে অনিমেষ। উন্মাদের মতো চেহারা হ'য়েছে তার। কামিনী এতক্ষণ খেয়াল করেনি—অনিমেষ কতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে ওকে। কঠোর কণ্ঠে অনিমেষ বলে: এ শাড়ি কোত্থেকে এল?

কামিনী ভয় পেয়ে যায়, বলে,—ছাড়ো।

: ছাড়বো? কক্ষণও ছাড়ব না। বল্ হারামজাদি—এ শাড়ি কোথায় পেলি তুই?

কাঠের পুতুলের মত কামিনী বসে থাকে। একটা কথাও বলতে পারে না। ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে অনিমেষ।

: লজ্জা করে না তোর! এতদূর অধঃপতন হয়েছে! আমি মরতে বসেছি—আর তুই···? ওঃ!

আবার শুয়ে পড়ে অনিমেষ। চোখ দুটো বুঁজে যায়। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। কামিনীর সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কোনও উৎসাহ নেই তার। আর সে বাঁচতে চায় না। বাঁচাতে চায় না অনিমেষকে! ওর শেষ সম্বলটুকুও যখন রইল না তখন কি হবে আর যুদ্ধ ক'রে। অনিমেষের মুখে চোখে বোধ হয় এখন ওর জলের ঝাঁপটা দেওয়া উচিত! দেখবে চেষ্টা করে জ্ঞান ফেরানো যায় কিনা? কি লাভ? জ্ঞান ফিরে এলেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কথাটা মনে পড়ে যাবে। নিরুদ্ধ আক্রোশে আরও কষ্ট পাবে বেচারী। প্রাণেই যখন বাঁচবে না তখন যে কটা মুহূর্ত বেঁচে আছে থাক্না অজ্ঞান অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে উঠে আসে কামিনী। জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই যেন নেই আর। চুপ ক'রে বসে থাকে। দৃষ্টি গিয়ে পৌছায় পথের উপর। বেলা অনেক হ'য়েছে। গুমট গরম। একটা ধূলোর ঝড় উঠল। দমকা বাতাসে ধূলোর একটা ঘূর্ণি উঠে গেল আকাশের দিকে। আগুন-ঝরা আকাশে উঁচুতে—বহু উঁচুতে ভেসে চলেছে দুটো চিল। তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল একটা। কামিনী বসে বসে

তাই দেখছিল। হাতে তার কোনও কাজ নেই। কাজ আছে অনেক, কিন্তু কাজ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। উৎসাহ নেই। সে বুঝি ফুরিয়ে গেছে। জলে ডোবা মানুষ নাকি এক মুহূর্তে জীবনের আদি-অন্তটা একসঙ্গে দেখতে পায়। কামিনীর মনে হ'ল ফেলে আসা দীর্ঘজীবনের দৃশ্যগুলো মনের পটে তেমনি একসঙ্গেই ভেসে উঠল বুঝিবা। ছেলেবেলায় বাপের খুব আদুরে মেয়ে ছিল। অল্পকিছু হ'লেই অভিমানে ঠোঁট দুটি তার ফুলে উঠ্‌ত। মা বলতেন —মেয়েমানুষের অত আদিখ্যেতা ভাল নয়। বাবা হাসতেন। আদুরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—পাগলি! আজকের এ ঘটনার সঙ্গে সে দৃশ্যের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তবু ওর মনে পড়ে গেল সেই ছেলেবেলার কথা। কৈশোরে ছুটাছুটি করেছে যেসব বান্ধবীদের সঙ্গে তাদের যেন স্পষ্ট দেখতে পেল কামিনী এই অকাজের দুপুর বেলায়। তারপর ওর বিয়ের সম্বন্ধ হ'ল। নিজের সংসার! বর! সেসব স্বপ্নের কথা আজ কেন মনে পড়ছে ওর? মানুষ আত্মহত্যা করবার আগে কি এমনিভাবে ফেলে আসা দিনগুলোর পাতা উল্টে নেয়? কামিনী কি আত্মহত্যা করবে? এ বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ আর নেই তার—সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে সরে দাঁড়াবে সে? লোকে বল্‌বে—পাপের এই পরিণাম! সে পরাজয়—সে গ্লানি কেন নিয়ে যাবে সে মাথায় ক'রে। মৃত্যু নাকি মহান! কিন্তু এ মৃত্যুতে যে মহিমার কণামাত্রও নেই। তাছাড়া গোরা! সেই অনশনক্লিষ্ট এক ফোঁটা ছেলেটা? সে কি অপরাধ করল? তাকে কেন ছেড়ে রেখে যাবে এই দুনিয়ার অরণ্যে একেবারে নিঃসহায় করে?

: বাড়িতে কে আছেন?

উঠে দাঁড়ায় কামিনী। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। নিজ দেহের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় দ্বারের ওপাশে। আড়াল থেকে বলে: ভিতরে আসুন।

দ্বার খুলে ভিতরে আসেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। খালি গায়ে মলিন একখানা এণ্ডির চাদর। তলা দিয়ে উপবীতটা দেখা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন কামানো হয়নি। খালি

পা। ঘরের এদিক ওদিক দেখে বৃদ্ধ বসে পড়েন অনিমেষের মাথার কাছে। জ্বরতাপ দেখেন। নাড়ি পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন: কামিনী কার নাম?

আড়াল থেকে কামিনী বলে: আমি। বলুন কি বলছেন।

: আমি তোমার স্বামীকে দেখতে এসেছি। আমাকে লজ্জা ক'র না দিদি। বাইরে এস! অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এস এদিকে।

তবু বা'র হ'তে পারে না কামিনী। লালু ডাক্তারের কথাগুলো মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বলে: আপনি ওখান থেকেই বলুন। আমি শুনতে পাচ্ছি।

: কিন্তু তা তো হবে না দিদি। আমি নিতাই ঠাকুর্দা। আমার সঙ্গে কলোনীর সব মেয়েরই ঠাকুর্দা নাতনী সম্বাদ। কলোনীর সব মেয়েই আমার সামনে বের হয়। এস তুমি এ ঘরে।

ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে আসেন। নিতাই কবিরাজ! ঠাকুর্দা! কোথা থেকে এলেন উনি? কামিনী জানতো উনি কলোনীতে নেই। গণ-কল্যাণ সমিতির কাজে দরবার করছেন অকল্যাণে। কবে ফিরে এসেছেন তিনি? তার স্বামীর সংবাদই বা পেলেন কি ক'রে? নিতাই কবিরাজ কি সত্যাই অন্তর্যামী?

দ্বারের কাছ পর্যন্ত এসে ভিতরে উঁকি দিয়েই উনি ফিরে যান: ও! তা বলতে হয়। ঠাকুর্দার কাছে আবার লজ্জা কিরে পাগলি? নে এটা গায়ে জড়িয়ে আয় এ ঘরে।

গায়ের এণ্ডির চাদরটা ছুঁড়ে দেন তিনি কামিনীর উদ্দেশ্যে। সেটা গায়ে জড়িয়ে কামিনী এঘরে আসে। ভক্তিভরে প্রণাম করে নিতাই কবিরাজকে। তৈলবিহীন রুক্ষ চুলের গোছায় ঢেকে যায় ঠাকুর্দার ধূলিমলিন চরণ যুগল।

ঠাকুর্দা বলেন: তোমার চিঠি নিয়ে একটি ছোট ছেলে যখন হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি গেল—আমি তখন সেখানে। সুরেখা বাড়ি ছিলেন। চিঠিখানা আমাকে তিনি দেখতে দিলেন। আমি তাই নিজেই চলে এলাম।

: গোরা কই ?

: গোরা কে ?

: ওই ছোট ছেলেটি।

: তোমার ছেলে বুঝি ? গোরা ! তাকে স্থরেখা বসিয়ে খাওয়াচ্ছে।

কামিনীর বুকের পাষাণভার নেমে যায়।

ঠাকুর্দা বলেন : এর তো রীতিমত চিকিৎসার দরকার। বাড়িতে আর কে আছে ?

কামিনী জানায় আর কেউ নেই।

: তবে তোমাকেই খুলে বলি। রোগ কঠিন। রীতিমত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে ভালো হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তোমার এখানে থেকে তো তা হবে না। আমি এখনি একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই। জংসনের হাসপাতালে। তুমি যদি সঙ্গে যেতে চাও—তবে যা হ'ক ছুটি ভাতে ভাত খেয়ে নাও।

: হাসপাতাল ! সেখানে শুনেছি—

: ভুল শুনেছ। পাড়াগেঁয়ে ভূত ! বাঁচলে ঐ হাসপাতালেই বাঁচবে—তোমার আঁচলের তলায় নয়।

: না, আমি শুনেছিলাম সেখানে সীট পাওয়া যায় না। বিশেষত কলোনীর রোগী হ'লে—

: ঠিকই শুনেছ তুমি—যেত না ! কিন্তু তার পরেকার খবরটা তুমি শোন নি। এখন থেকে পাওয়া যাবে। অন্তত নিতাই কবিরাজ যে কেস নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা হবেই। তুমি বোধহয় জানো না তোমাদের ঠাকুর্দা একটা কেষ্ট বিষ্টু হ'য়ে উঠেছেন সম্প্রতি এ অঞ্চলটায়। তুমি তৈরী হ'য়ে নাও !

: আমি তৈরীই।

: খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ?

: আপনি রওনা দেবার ব্যবস্থা করুন।

ঠাকুর্দা একবার ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে উঠে যান। রান্নাঘরের শিকল খুলে একবার ভিতরে উঁকি মারেন। ফিরে এসে হাত-খানা রাখেন কামিনীর পিঠে: কতদিন আলিস না উনান? হাঁরে?

কামিনী জবাব দেয় না।

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন একটু পরেই। তাঁর হাতে এক ঠোঙা খাবার। ওর হাতে দিয়ে বলেন: খা! খেয়ে জল খেয়ে নে। আমি একটা রিক্শা ডাকি। একটা চল্লিশের ট্রেণটা ধরতে পারব বোধহয়। গোরা ও বাড়িতেই থাক। যাবার সময় সুরেখাকে বলে যাব অখন।

কামিনী বলে: খেতে আমি পারবনা ঠাকুর্দা। আপনি রিক্শা ডাকুন।

ঠাকুর্দা রওনা দিয়েছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘুরে দাঁড়ান। বলেন: ছাখ, একটা কথা তোকে বলে রাখি। আমার কথা বিনা প্রতিবাদে যে শোনে না তার সঙ্গে আমার কোন সুবাদ নেই। আজ একাদশী। এভাবে নিরম্বু উপোস ক'রে মরণাপন্ন স্বামী নিয়ে হাসপাতাল যেতে আমি দেব না তোকে। রিক্শা ডেকে আনছি আমি। কিন্তু এসে যদি দেখি একটা টুক্‌রোও পড়ে আছে পাতে তাহলে ঐ রিক্শা চেপেই একা ফিরে যাবো আমি। মনে থাকে যেন!

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। চোখ ছাপিয়ে জল আসে কামিনীর। এত স্নেহের কথা কেউ বলে না তাকে। বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও এমনি ক'রে স্নেহের ধমক দিতেন। এ কী ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদ পেল সে? কামিনী এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ে। খাবারের ঠোঙাটা টেনে নেয়।

হঠাৎ নজরে পড়ে খাটের নিচে উবুড় হ'য়ে পড়ে আছে একখানা বাঁধান ছবি। আজ অনেকদিন হ'য়ে গেল—ওটা ওভাবেই রয়েছে। কামিনী হাতটা ধুয়ে ফটোখানা তুলে নেয়। আঁচল দিয়ে কাঁচের ধুলোটা মোছে। টাঙিয়ে দেয় সেটাকে স্বস্থানে। তারপর ছবির নীচে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে ফেলে!

ঠাকুর্দার বাড়ি থেকে ফিরছিল ভূষণ আর নমিতা। কথা ছিল গণ-কল্যাণ সমিতির কয়েকটা বিষয়ে জরুরী আলোচনা হবে ঠাকুর্দার ঘরে বিকালে। সমিতির এখনও তিনজনই মাত্র সভ্য। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব ওদের জানিয়েছেন যে সেদিনকার দাবী তিনি মেনে নিয়েছেন। নূতন পঞ্চায়েত গঠন করা হবে। এতে পাঁচটা ব্লকের পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত করতে হবে। রীতিমত গণ-ভোট! অবশ্য ভোটের অধিকার থাকবে শুধু পরিবার পিছু একজনেরই। যাঁর নামে প্লট। একদল আপত্তি করেছিল। তাদের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই ভোট থাকা উচিত। যোগেন, ভূষণ প্রভৃতি মধ্যপন্থীরাও এই মতের স্বপক্ষে ছিল। ঠাকুর্দা কিন্তু এটা মেনে নেন নি। তিনি বলেন—জিনিসটা অতবেশী ব্যাপক করলে গণ্ডগোল বাড়বে। চোরাই ভোট দেবার চেষ্টা হবে। হিসাবও বড় হয়ে পড়বে। প্লট হোল্ডারের সংখ্যা জানা আছে—তাদের পাকা লিস্ট আছে। অন্তত এবারের মতো তাদের ভোট নিয়েই পঞ্চায়েত গঠন করা হ'ক। বাগচি সাহেব ঠাকুর্দার মতই মেনে নিয়েছেন। যোগেন, কানাই অথবা ভূষণও আর আপত্তি করেনি।

সেই ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করছেন অফিসের তরফ থেকে বাগচি সাহেব। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ঠাকুর্দা সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করবেন ব'লে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন্ ব্লকে কাকে প্রতিনিধি হিসাবে গণ-কল্যাণ সমিতি নমিনেশান দেবে। শুধু নমিতা আর ভূষণ নয়—এজন্য কানাই, যোগেন, জীবেন প্রভৃতি আরও সাত আটজনকেও তিনি ডেকেছিলেন। ওরা এসে বসে রইল। অথচ ঠাকুর্দাই অনুপস্থিত। শেষে কে একজন এসে বল্লে ঠাকুর্দাকে দুপুরের ট্রেণে কলকাতাগামী একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছে। আর একজন বল্লে একটি অসুস্থ লোকও নাকি ছিল তাঁর সঙ্গে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ওরা ফিরে এল।

যোগেন স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। বলে: ভূষণদা, এসব কাজ ও বুড়ো

মানুষ দিয়ে হবেনা। আপনি আসুন। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সভাপতি করি।

দেখা গেল আরও কয়েকজনের সমর্থন আছে এ প্রস্তাবে।

ভূষণ বলে : কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষটাকে মেনে চলে সবাই। আমার কথাও হয়তো সবাই শুনবে—কিন্তু সেটা ভয়ে। ওঁর কথা শুনবে ভালোবেসে, শ্রদ্ধায়।

: কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন। ঠাকুর্দার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন জরুরী মিটিংএ। নমিনেশন মিটিঙ। আর নিজেই চলে গেছেন কলকাতায়।

নমিতা বলে : কিন্তু ঐ অসুস্থ লোকটাকে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ কঠিন অসুখের কোনও রোগী দেখতে গিয়ে এটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে বোধ হয়।

ভূষণ প্রতিবাদ করে : হতে পারে। সেটা অন্য কারও উপর ভার দিতে পারতেন। কাউকে বলতে পারতেন একে হাসপাতালে পৌঁছে দাও। উনি যে কাজটা করতে গেছেন সেটা দলপতির কাজ নয়—যে-কোন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। আর যে কাজটা না ক'রে চলে গেছেন সেটা একমাত্র দলপতিরই কাজ।

নমিতা জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

যোগেনও আসছিল ওদের দুজনের সঙ্গে। বলে : অনেক ঘাটের জল তো খাওয়া হ'ল ভূষণদা—এবার পাকাপাকি ভাবে যাতে এখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারি সে চেষ্টা দেখুন। সব ক'টি শক্তিকে এক ঝাণ্ডার তলায় না আনতে পারলে চলবে না। এর মধ্যে রাজনীতিকে আমরা আনতে দেব না। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক রাখব না। বাইরের নেতৃত্ব চাই না আমরা। আমাদের দাবী সুষ্ঠু পুনর্বাসন। কাজ ক'রে মানুষের মতো বাঁচতে চাওয়ার দাবী। এটাকে সফল করতেই হবে।

ভূষণ বলে : বাগচি সাহেব লোক ভালোই হবেন মনে হ'চ্ছে। কিন্তু ঠাকুর্দাকে দিয়ে কি চলবে এ কাজ ?

: আমিও তো তাই বল্‌ছি। ওঁর রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। বুড়ো হ'য়ে গেছেন। তাছাড়া দলপতি হবার যোগ্যতা বোধ হয় ওঁর কোনও দিনই ছিল না। অত ভালো মানুষ হ'লে পলিটিক্স হয়? একদিকে পাঁজি-পুঁথি তিথি-নক্ষত্র—আর অন্যদিকে সব মানুষের দেহেই ৺ নারায়ণ আছেন এই থিয়োরি! যতীশবাবু প্যাঁচ কষছেন তিনিও নারায়ণ আর বেটা হারামজাদ বদমাইসি ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনিও নারায়ণ!

নমিতা বলে: কিন্তু ঐ বুড়ো-হাবড়া মাঝখানে আছেন বলেই আপনাদের মধ্যে এখনও দলাদলি বাধেনি। উনি স'রে গেলে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য নেতা দেখা দেবে কলোনীতে—এও দেখে নেবেন!

ভূষণের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলে: রাজা মারা গেলেও রাজ্য চলে নমিতা দেবী।

: অরাজকতাও চলে অনেক সময়ে। আমি বলছিলাম গণকল্যাণ সমিতির হাতে এখন লক্ষ কাজ। কত বিষয় চিন্তা করবার আছে, কাজ করবার আছে। আপনারা কিন্তু দেখছি একটি মাত্র চিন্তাতেই বিভোর—কি ক'রে দলপতিকে গদিচ্যুত করা যায়।

যোগেন রাগ ক'রে বলে: আপনি ভুল করছেন নমিতাদি।

: ভুল বলেই যেন বুঝতে পারি ভাই এটাকে। আমিই তাহ'লে খুশী হব সবচেয়ে বেশি। সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না যে—সমিতি ভালো ভাবে গড়ে ওঠার আগেই তার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বসে যাবে দারা-সুজা- ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ!

যোগেন হেসে বলে: এটা আপনার হিস্টি টীচারের মত কথা হ'ল নমিতাদি!

নমিতাও হেসে বলে: আমি তো টিচারই। দুঃখতো সেখানেই যোগেন ভাই! ইতিহাস আমরা পড়ি আর পড়াই। সাল তারিখ মুখস্থ করি। ইতিহাসের শিক্ষা কি আমরা গ্রহণ করি জীবনে? তাজমহল না গড়ে উঠতেই বুড়ো সাজাহানটাকে আগ্রা ফোর্টে বন্দী করবার মতলবে আছি আমরা।

ভূষণ একটা কথাও বলে না। সে অবাক হ'য়ে যায় নমিতার পরিবর্তন দেখে। দশটা দিন আগে মেয়েটা চোখ তুলে কথা বলতে পারতো না। মিটিঙে ওর নাম প্রস্তাব করলেন হেডমিস্ট্রেস্—উঠে দাঁড়িয়ে কি বলতে গেল—কথা ফুটল না তার মুখে। সেই মূক মেয়েটি এ কয়দিনেই কেমন মুখর হ'য়ে উঠেছে। যোগেন নায়েকের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হবে। অনায়াসে তার দিদি হ'য়ে উঠেছে। ইতিহাসের শিক্ষা দিচ্ছে! ভূষণ বুঝতে পারে যোগেনকে বল্লেও আসলে নমিতা আঘাত করতে চাইছে ভূষণকেই। নমিতা বোধ হয় ভাবে নিতাইপদর আসনের প্রতি মোহ আছে ভূষণের। কলোনীর অবিসংবাদিত নেতা হওয়াটা গৌরবের সন্দেহ নেই—কিন্তু মোহের বশে ভূষণ তা পেতে চাইছে না। সে নিজে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হ'তে চায় না। সে চায় একজন দৃঢ়চেতা জননায়ক! সমস্ত কলোনীর ভালোমন্দ দেখবার ক্ষমতা যে রাখে। লোকগুলো স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে আজ ছয় সাত বছর। ট্রানসিট ক্যাম্প, পি. এল ক্যাম্প, শেয়ালদা স্টেশান, হাওড়া ময়দান, স্ট্রাণ্ড রোড, এমন কি বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে ওরা। যেখানে গিয়েছে উইপোকার মত ছোট ছোট ঢিপি গড়ে তুলেছে। মাথার উপর এক টুকরা ছাদ! ভেঙ্গে দিয়েছে কে যেন! আবার আশ্রয়হীন হ'য়ে পড়েছে ওরা। এতদিনে এসে পৌচেছে এই উদয়নগর কলোনীতে। এইবারই বোধ হয় ওদের শেষ চেষ্টা। এখানে যদি মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার পায় তবেই লোকগুলো আবার সামাজিক জীব হ'য়ে উঠবে—না হ'লে আর আশা নেই। এই দশ পনের হাজার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার মত ক্ষমতাশালী নেতা নন নিতাইপদ এটা বিশ্বাস করে ভূষণ। কিন্তু তাঁর বদলে দ্বিতীয় কোনও নেতার সন্ধান সে পায়নি আজও। কলোনীর দাবী দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে—সে দাবীর পিছনে শুধু যুক্তি আর জোর থাকলেই চলবে না—থাকা চাই খানিকটা ঔদ্ধত্য! অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিতে হবে। প্রসেশন ক'রে বিধানসভায় গিয়ে পিকেটিং করবার ভয় দেখাতে হবে—না হ'লে

জমের দাবী মেনে নেবে না কেউ। সে সব কাজ ঠাকুর্দাকে দিয়ে হবে না!

ভূষণ কিন্তু কোনও কথা বলে না।

নমিতাও বলে না কোন কথা।

সেও ভাবছিল ঐ একই কথা—তবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নিতাইপদকে সে ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ নগ্নগাত্র শুভ্রকেশ অমায়িক বৃদ্ধটির মধ্যে সে দেখেছে একজন দরদী মানুষকে। সে বুঝেছে যে এই লোকটিকে নেতৃত্বপদে রাখতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি হ'তে পারে কলোনীর। নিতাইপদ সত্যই দেখছেন তাজমহলের স্বপ্ন—সে স্বপ্নও প্রেমের-মন্দির। মানব-প্রেমের। এ কলোনীর সাম্রাজ্যের মাঝখানে ঐ একক বৃদ্ধকে মনে মনে এরা কেউ চাইছে না। নমিতা আজকাল বড় বড় কথা ভাবতে শিখেছে।

পায়ে পায়ে ওরা যখন বাড়িতে এসে পৌঁছায় তখন নমিতা লক্ষ্য করে কখন অলক্ষ্যে যোগেন চলে গেছে নিজের পথে। নমিতা আর ভূষণ বাড়ি ঢুকতেই লতু এসে ভূষণকে বলে: আপনি তো বেশ লোক, মিঠুকে কানাইদার বাড়িতে একলা রেখে দিয়ে কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।

ভূষণ হেসে বলে: একলা রেখে যাব কেন? ঠান্‌দির চার্জে রেখে গেলুম তো ওখানে।

: ও! ঠান্‌দি আপনার মাইনে-করা বাঁদী কিনা। দায় পড়েছে আমার।

লতুর কোলে ঘুমন্ত মিঠুয়া।

নমিতা রীতিমত বিস্মিত হয়। ভূষণকে বলে: লতুর সঙ্গে তো বেশ ভাব হ'য়ে গেছে দেখছি আপনার।

ভূষণও বিস্মিত হয়: কেন আপনি জানতেন না? ঠান্‌দি তো প্রায়ই যায় আমাদের বাড়ি। মিঠু ওকে ছেড়ে থাকতেই চায় না! পিসীমার সঙ্গেও

লতুর খুব ভাব হ'য়ে গেছে। আপনিই যান না বলে অনুযোগ করছিলেন তিনি। কই আপনি তো একদিনও গেলেন না।

নমিতা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। লতু ভূষণবাবুদের বাড়ি প্রায়ই যায়। পিসীমার সঙ্গেও লতুর আলাপ হ'য়ে গেছে? কই এসব কথা তো ঘূণাক্ষরেও জানায়নি লতু? কেন জানায়নি। এটা গোপন করার কারণটা কি হ'তে পারে?

ভূষণ লতুর দিকে ফিরে বলে: ঠান্‌দি, তোমার অর্ডারি জিনিস এসে গেচে—দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি—তুমি কাল যাওনি বলে।

ভূষণ পকেটের ভিতর হাত চালায়।

লতু তাড়াতাড়ি বলে: আচ্ছা সে হবে অখন।

চলে যায় সে পাশের ঘরে—মিঠুকে কোলে নিয়ে।

লতু লক্ষ্য করেছে নমিতার ভাবান্তর। ও যে ভূষণবাবুদের বাড়ি গিয়ে আলাপ ক'রে এসেছে এটা না জানানোতে দিদি অবশ্য রাগ করতেই পারে। দুই বোনের মধ্যে লুকোচুরির স্থান নেই। কিন্তু কি জানি কেন এ সত্যটা স্বীকার করতে লতু সঙ্কোচ বোধ করেছে প্রতিবারই। অনেকবার বলতে চেয়েছে—কিন্তু দিদি হাসবে মনে হওয়ায় বলা হ'য়ে ওঠেনি। এখন দিদির চুপ ক'রে বসে থাকার ভঙ্গিটায় সেজন্য অনুশোচনা হয়। লতু মনে মনে স্থির করল ভূষণদা চলে গেলেই দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বল্‌বে: দিদি রাগ করেছিস?

দিদি বলবে: রাগ করব কেন? রাগ করিনি।

: নিশ্চয়ই করেছিস্‌। তোকে না বলে ভূষণদাদের বাড়ি গেছি বলে?

: গেছিস তো বেশ করেছিস্‌।

: ঐ তো রাগের কথা। রাগ করিসনি তো হাস্‌ দিকিন।

দিদি হেসে ফেলবে তখনই। এটুকু বিশ্বাস লতুর আজও আছে—দিদির উপর। দ্বারের পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সে ভূষণের প্রস্থানের অপেক্ষায়।

ভূষণ এক জোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি বার করে পকেট থেকে। রেখে

দেয় টেবিলের উপর। নমিতা এতক্ষণে কথা বলে: এটা কিন্তু আপনার অন্যায়।

: কোনটা?

: এভাবে ওকে উপহার দেওয়া!

: কি বল্‌ছ নমিতা! লতু এখনও ছেলেমানুষ।

: ছেলেমানুষ যে নয়—সেটা আমিও বুঝি, আপনারও না বুঝবার কোনও কারণ নেই।

ভূষণ একটু অবাক হ'য়ে যায়। এ কথার মানে? একটু অপমানিতও বোধ করে নিজেকে। তবু হেসে জিনিসটা লঘু করে। বলে: একবার যখন দিয়ে ফেলেছি তখন আর আপত্তি নাই করলে। তাছাড়া ওর সঙ্গে দুদিন পরেই তো একটা নিকট এবং মধুর সম্বন্ধ হ'তে যাচ্ছে—সুতরাং এটা এমন কিছু অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

নমিতা উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় বলে যায়: আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু। যে নিকট এবং মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত করছেন আপনি তা হ'বার নয়। আমি রাজি নই! তবে যে উপহার ও নিজমুখে চেয়েছে—আর যা আপনি মনে করে কিনে এনে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন তা ফেরত নিয়ে যেতেও বলছি না আমি।

নমিতা দ্রুতপদে চলে যায় ওঘরে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হ'য়ে বসে থাকে ভূষণ। মুখটা ম্লান হ'য়ে আসে ওর। সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে লতু। ঢুম ক'রে নামিয়ে দেয় মিঠুকে। আর টেবিল থেকে প্লাস্টিকের চুড়ি দুটো তুলে দু'হাতের চাপে ভেঙ্গে ফেলল সেটা। কোন কথাই না বলে বের হ'য়ে গেল ফের।

ভূষণ মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

সি-ব্লকে সুরেখা দেবীর বাড়িটিই বোধহয় কলোনীর সব চেয়ে সুসজ্জিত বাড়ি। দামী আসবাবে তার আভিজাত্য নয়। সুরুচির পরিচয়েই সেটি

সুশোভিত। দরজা জানালায় পর্দা টাঙানো। কয়েলড্ স্প্রিংয়ের সঙ্গে লাগানো কুঁচি দেওয়া হালকা নীল পর্দা। শয়নকক্ষ একটি মাত্র। বসার ঘরও এটাই। তার একদিকে একটি চৌকি পাতা। সাদা ধবধবে একটা পাটভাঙ্গা চাদর টানটান করে বিছানো। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসি। আর কাঁচের গ্লাস। কয়েকটি শান্তিনিকেতনী মোড়া। সূচের কাজ করা নক্সা কাটা ঢাকনি। এক কোণে আপাদমস্তক নীল কাপড়ে ঢাকা একটা সেতার। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ফুল সুরেখা দেবীর বাগানেই হয়। ফুলদানির পাশে ফ্রেমেবাঁধানো একখানা ফটো। বছর বাইশেক বয়সের একজন যুবক।

যে ঘরে সুরেখা দেবীর প্রাকবিবাহ জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে তার তুলনায় যদিও এ গৃহশয্যা অকিঞ্চিৎকর—তবু কলোনীর ছন্নছাড়া জীবনে এটাকেই হঠাৎ মরুভূমির মাঝখানে মরুদ্যানের মতো মনে হয়। কঞ্চির বেড়া দিয়ে বাড়ির চারদিক ঘেরা। সন্ধ্যামালতী আর অপরাজিতার গাছ লাগানো হয়েছে—যদিও বাড়তে পায়নি সেগুলি যথেষ্ট। আগামী বর্ষার পর হয়তো ছেয়ে ফেলবে ওরা কঞ্চির বেড়াকে। সুরেখা দেবী শুধু সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নন—রীতিমত ধনীর কন্যা তিনি। বিবাহও হ'য়েছিল ধনীর দুলালের সঙ্গে। ভাগ্যবিপর্যয়ে তিনি পিতৃগৃহ-স্বামীগৃহ দুইই ত্যাগ ক'রে এসে কর্মসংস্থান করছেন উদয়নগর কলোনীতে। যারা বলে তাঁর সখের চাকরি—তাঁরা ওর জীবনের সব কথা জানে না বলেই ঐ ভুল কথাটা বলে।

জানালা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস দেখতে পেলেন—নমিতা কঞ্চির গেট খুলে ভিতরে আসছে। নমিতা মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর এ নিয়ে একটা গোপন অভিযোগ ছিল। আর সেটা অজানাও ছিল না তাঁর।

: এসো নমিতা—কি খবর ?

: আপনি আমাকে এ কী ফ্যাসাদে ফেললেন বলুন দেখি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় কলোনীর মেয়েরা আমার কাছে আসতে সুরু করেছে। কারও ক্রি

ক্স্যাশন বন্ধ হ'য়েছে—তাতে আপত্তি। কেউ পি. এল ক্যাম্পে যেতে চায় তার আর্জি, কেউ চায় কাজ। যত বুঝিয়ে বলি এসব বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নেই আমার—ওরা বোঝে না।

ওর ছেলেমানুষি আর আবদার করার ভঙ্গিতে সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন। বয়সে বোধ হয় দুজনে প্রায় সমবয়সী। কিন্তু শিক্ষা ও পদমর্যাদায় তিনি অনেক উঁচু মঞ্চ থেকে বড়বোনের মতই ওকে উপদেশ দিলেন—প্রথম প্রথম এ সব অসুবিধা একটু হবেই। ওদের অভিযোগগুলো আপাতত শুনে যাও। নোট বইতে লিখে রাখ। নিতাইবাবুর গণকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে কলোনীতে শীঘ্রই নানারকম কাজ সুরু হবে। তুমি তখন সত্যিই পারবে এদের নানাভাবে সাহায্য করতে।

নমিতা বলে : ও, আপনি জানেন না বুঝি। আমাদের গণকল্যাণ সমিতি কর্তৃপক্ষের 'এ্যাপ্রুভাল' পেয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের প্রতিনিধি গণভোট নিয়ে নির্বাচন করা হ'বে। তাদের দিয়েই নতুন পঞ্চায়েত গড়া হবে। আগের পঞ্চায়েত বাতিল হয়ে গেছে।

সুরেখা দেবী বলেন : গেছে নয় বল যাবে। নতুন কমিটি কার্যভার নিলে পুরান পঞ্চায়েত তখনই বাতিল হবে।

: না! ওটা বাতিল হয়েই গেছে। এখন আমাদের এ্যাডহক্ কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

: অর্থাৎ তুমি আর ভূষণবাবু?

: আর নিতাই ঠাকুর্দা।

: তিনি তো বুড়ো মানুষ। তোমাদের দুজনকেই সামলাতে পারছেন না—সারা কলোনীর এতগুলি লোককে তিনি ঠেকাবেন কি ক'রে?

: মানে?—বিস্মিত হয় নমিতা।

সুরেখা দেবী মিটি মিটি হাসেন।

: যাক। তা কি বলতে এসেছ বল?

নমিতা একটু ইতস্তত ক'রে তারপর বলে : আমি কিন্তু এ কমিটিতে থাকব না। আপনি অন্য কাউকে এ ভার দিন।

: সেকি, কেন বলত ?

: ঐ যে বল্লাম—সারাদিন আমায় বিরক্ত করে।

: জনকল্যাণের কাজ করবে—আর তোমার কাছে কেউ কিছু বলতে এলে বিরক্ত বোধ করবে, এতো হয় না নমিতা। হবেও বা—আমিই হয়তো ভুল করেছি। সত্যিই যদি বিরক্ত বোধ ক'রে থাক তবে পদত্যাগ করাই উচিত তোমার। তবে সে কথা আমাকে বলতে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিতাইবাবুকে ব'ল।

: বারে! আপনিই তো আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

: ভুল করেছিলাম নমিতা। আমি তোমাকে অন্য জাতের মানুষ ভেবেছিলাম!

দুজনেই চুপ। সুরেখা দেবী জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। নমিতা নখ দিয়ে টেবিলক্লথটা খুঁটতে খুঁটতে বলে : আপনি রাগ করেছেন।

: রাগ ঠিক করিনি। তবে দুঃখ পেয়েছি। মানে আমি সত্যি ঠিক আশা করিনি এটা। তোমার আসল আপত্তিটা কি বলত ?

নমিতা তখনও ইতস্তত করে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলে : এ কমিটির সঙ্গে আমার কাজ করা পোষাবে না।

: কেন বলত ? তোমাদের নিতাই ঠাকুর্দা শুনেছি খুবই ভালোমানুষ। ভূষণবাবুর সঙ্গেও তো তোমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা।

: অন্তরঙ্গতা ? মানে ?

: ও এতক্ষণে বুঝেছি! মান অভিমানের পালা চল্‌ছে বুঝি ?

নমিতা রীতিমত বিব্রত হ'য়ে পড়ে : না, না! মানে এসব কি বলছেন আপনি ?

সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন, স্মিতহাস্যে বলেন : কিছু কিছু আমি অবশ্য শুনেছিলাম—শোভনা দেবীর কাছে। স্কুলের সামনে কয়েকদিন

ভদ্রলোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তারপর জানতে পারি উনি তোমার খোঁজেই আসেন। কি একটা যৌথ ব্যবসা নাকি চালাচ্ছ তোমরা। তখনও এতটা বুঝিনি।

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। প্রতিবাদ করাটা উচিত মনে হয়; কিন্তু কি ভাবে প্রতিবাদ করলে জিনিসটা অস্বীকার করা যায় বুঝে উঠতে পারে না।

হেডমিস্ট্রেসই বলেন: উনি তোমাদের কমিটিতে থাকাই কি তোমার আপত্তির কারণ?

: সেও একটা কারণ বটে; তাছাড়াও মানে—

: অর্থাৎ তা ছাড়াও কোন কারণ উদ্ভাবন করতে পারো তুমি। আচ্ছা তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রথম কারণটাই বিস্তারিত শুনি আগে।

নমিতা মরিয়া হ'য়ে বলে ফেলে: ভূষণবাবুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। সেলাইয়ের কারবারও বন্ধ করে দিচ্ছি। অন্য সূত্রেও কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।

সুরেখা দেবী গম্ভীর হ'য়ে বলেন: এতদূর? যদি আপত্তি না থাকে তবে গভীরতর কারণটা ব্যক্ত করতে পারো তুমি। অবশ্য তোমাকে বলতে বাধ্য করছি না আমি। ব্যবসাটা বন্ধ করার কারণ অর্থনৈতিক নাকি?

: না না, টাকা পয়সার ব্যাপারে উনি খুব পার্টিকুলার।

: ভূষণবাবু চরিত্রবান সৎ প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়েছে আমার—

: আমিই কি তা অস্বীকার করছি?

: তবে কারণটা অর্থনৈতিক নয় আধিভৌতিকও নয়—সুতরাং ধরে নিতে পারি কারণটা হৃদয়ঘটিত।

নমিতা রীতিমত লাল হ'য়ে ওঠে: এভাবে জেরা করলে আমি জবাবই দেব না।

প্রাণ খুলে হাসেন সুরেখা দেবী: ক্ষেপেছ; আমার কি এটুকুও রসবোধ নেই। হৃদয়ঘটিত ব্যাপার শোনার পরেও জেরা করব আমি? কিন্তু

ওসব হ'চ্ছে শরতের মেঘ! ওর জন্মে 'মেজর' কোনও 'ডিসিসন্' নিতে নেই।

নমিতা তবু তর্ক করে: কিন্তু আপনিই তো এখুনি বলছিলেন ওঁকে আমার পিছনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আপনারই সন্দেহ হ'য়েছিল—এবং খবর নিয়ে জেনেছেন যে একটা অর্থনৈতিক কারণেই আমরা মেলামেশা করি। সাধারণ লোকে তো এটাকে অন্য চোখেও দেখতে পারে। আমার একটা বদনামও হয়ে যেতে পারে।

: অন্য লোক কেন আমিই তো ওটা অন্য চোখে দেখেছি। কে বল্লে আমি বিশ্বাস করেছি তোমাদের মেলামেশাটার আসল কারণ ব্যবসা ঘটিত?

নমিতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

: বোকার মত দেখছ কি? বেশ তো, বদনাম যদি খুব বেশী হ'য়েই পড়ে তখন একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। ভূষণবাবুকে বল্লেই সে এক ফোঁটা সিঁদুর দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে। তা সে পারবে। তুমিই বলে দেখো না।

ঐ এক ফোঁটা সিঁদুরই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে নমিতার সারা মুখে।

আর কিছু বলতে পারেনা।

নমিতা বাড়ি ফিরে এলো হাল্‌কা মন নিয়ে। অনেকদিন পরে আবার গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। সুরেখাদি লোকটি কিন্তু ভারী অসভ্য। এমন মিটি মিটি হেসে কথা বলেন যে প্রতিবাদ করবারও অবস্থা থাকে না। বাড়ি এসে পৌছাতে লতু ওকে একগাদা ছিট এনে দিল। বল্লে: একটি ছোট ছেলে এগুলো দিয়ে গেছে। বলেছে এই মাপে জামাগুলো বানিয়ে রাখতে। পরের সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবে।

: ছোট ছেলে? কে রে?

: কি জানি, চিনি না।

নমিতা হতাশ হয়। সে ভেবেছিল অন্তত সপ্তাহান্তে ভূষণ একবার আসবে। আজ শনিবার। ভূষণের আসার কথা। এ কয় সপ্তাহ অবশ্য সে

সপ্তাহের মাঝেও এসেছে। আজ শনিবারে জামা দেবার অছিলায় ভূষণ একবার এ বাড়ি আসবে এটা অনুমান করেছিল নমিতা। মনে মনে ওর আগমনের যে প্রতীক্ষা করছিল সেটা টের পেল আশাভঙ্গের পর। তবে ভূষণকেও দোষ দেওয়া যায় না। সেদিন ওকে যে রকম কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। কেমন যেন লজ্জা বোধ করে নমিতা। সেদিন হঠাৎ ওরকম রূঢ় ব্যবহার করার সত্যিই কি কোনও কারণ ছিল? ভূষণ তো কোনও অন্যায় করেনি। লতুই বা অন্যায়টা করল কোথায়? লতু যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে? কিন্তু বুঝবারই বা কি আছে এতে? নিজেকেই নমিতা ধমক দেয়। লতুর সঙ্গে ভূষণের যদি ঘনিষ্ঠ আলাপ হ'য়ে থাকে, অথবা ভূষণ যদি লতুর জন্যে মনে করে একজোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি কিনে আনে তাতে নমিতার কষ্ট হবার তো কোনও কারণ নেই! লতুকে এ নিয়ে হিংসা বা ঈর্ষা করবে কেন নমিতা? ঈর্ষা! কথাটা মনে হতেই ঠাস করে একটা চড় মারে নমিতা মনের গালে! কী পাগলের মত ভাবছে সে? লতুকে ডাকে: লতু শোন।

লতু এসে চুপটি করে দাঁড়ায়।

: হ্যাঁরে, সেদিন বকেছিলাম বলে রাগ করেছিস্? তুই কেন বলিস নি আমাকে যে ভূষণকাকের সঙ্গে তোর ভাব হ'য়ে গেছে? কেন বল্লি না যে ওদের বাড়িতে তুই যাতায়াত করিস?

লতু জবাব দেয় না।

: কী? এখনও অভিমান গেল না? তুই কী রে? নিজে দোষ করলি আর আমার উপর রাগ করছিস? আমি কি বারণ করেছি ওদের বাড়ি যেতে?

লতু গম্ভীর হ'য়ে বলে: ও কথা যাক দিদি! আমি তো আর যাই না।

: কেন? যাস্ না কেন? আমি বারণ করেছি? তোর যদি ভালো লাগে যাস্ যত খুশী ভূষণকাকের বাসায়।

: থাক্ দিদি। ও রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

লতু ধীরে ধীরে চলে যায়। নমিতা ভেবেছিল লতুকে পাঠিয়ে ভূষণকে

ডেকে পাঠাবে। সেলাইয়ের 'ঝাট' সংক্রান্ত কথাবার্তা সুরু ক'রে সেদিনের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু নতুর ভাবগতিক দেখে ও একটু অবাক হয়। নতুর এতটা গম্ভীর ভাব তো স্বাভাবিক নয়। ব্যাপার কি! সেদিন বাইরের লোকের সামনে ও কথা বলায় বোধ হয় অপমানিত বোধ করেছে খুব। দুঃখ হয় নমিতার। আবার ডাকে : নতু শোন!

আবার এসে দাঁড়ায় নতু।

: তোর কি হয়েছে বলতো? কথাই বলছিস না ভাল ক'রে?

নতু একবার তাকায় দিদির দিকে। চোখাচোখি হয়। তৎক্ষণাৎ সে চোখ নিচু করে। অস্ফুটে বলে : কিছু হয়নি। আর কিছু হ'য়ে থাকলে তা তুমিও জানো, আমিও জানি।

বলেই বেরিয়ে যায়।

নমিতা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। আর কিছু বলে না।

রাত্রে আহারাদির পর নমিতা সেলাই নিয়ে বসেছিল। আজই কয়েকটা জামা কেটে রাখতে হবে। নতু ঘুমিয়েছে পাশেই। নমিতা আর নতু এক বিছানাতেই শোয়। বিন্দুবাসিনী এসে বল্লেন : নমু, তোর বাবা একবার ডাকছে তোকে।

হাতের কাজটা গুছিয়ে রেখে নমিতা এসে বসে বাপের পাশে।

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে বলেন : হ্যাঁরে অমুর কোনও খবর পেয়েছিস?

: না বাবা।

: খবর নেবার চেষ্টা করেছিলি?

: না। মনি-অর্ডার ফেরত আসার পর আমি আর চেষ্টা করিনি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন : মনি-অর্ডার যে ফেরত আসবে এটা আমি জানতাম। সে বড় অভিমানিনীরে।

বিন্দুবাসিনী ঝাঁজের সঙ্গে বলেন : তুমি আর আধিক্যেতা ক'রনা। টাকা ফেরত দেওয়া হ'ল। বাবলুকে আটকে রাখা হ'ল। তিনি হ'লেন অভিমানিনী! আমার রোগা ছেলেটা কেমন আছে বাবলুকে পাঠিয়ে তা একটা খবরও দিতে পারল না এতদিনে? আর সে ছেলেটাই বা কেমন? মা-বাপের কথা মনেও পড়ে না?

নমিতা বলে : সে নিশ্চয়ই আসতে চায়—বৌদি আসতে দেয় না।

হরিপদ বলেন : সে যাই হোক্। তোমাকে আর একটি কথা বলব বলে ডেকেছি। ভূষণের কথা!

নমিতা বুঝতে পারে প্রশ্নটা কি। হেডমিস্ট্রেস্ যেটা অত সহজেই বুঝতে পেরেছেন—সেটা যে বাবা-মার চোখ এড়াবেনা এটা বোঝা সহজ। হঠাৎ এ প্রশ্নটায় সে লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে পড়ে। বাপের স্নেহমাখা কণ্ঠস্বরে নমিতার শরীর অবশ হ'য়ে আসে। মনে পড়ে যায় তার অতীত যৌবনের ইতিহাস। ওকে পাত্রস্থ করার কী প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল বৃদ্ধের। তাঁর নমিতা মায়ের কদর কেউ বুঝল না—এ অভিযোগ তাঁর বরাবরই ছিল দুনিয়ার উপর। শেষ দিকে নমিতা যখন জানিয়েছিল যে সে বিয়ে করবেনা তার পর থেকে বৃদ্ধ কখনও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি। আজ দীর্ঘদিন পরে উঠে পড়েছে সেই আলোচনা। পঁচিশ বছরের উদ্বাস্তু মেয়েটি ইতস্তত করে। কি করে সে স্বীকার করবে যে ঐ মা-হারা মেয়েটির বাপকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তার আজীবন কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞাটা ভাসিয়ে দিয়েছে ঐ বলিষ্ঠ গঠন যুবকটি এক নিমেষে! অনিবার্য প্রশ্নটার প্রত্যাশায় উদ্বেল-হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে নমিতা।

বৃদ্ধ বলেন : ভূষণ কি বিবাহের কোনও প্রস্তাব এনেছিল?

নমিতা চুপ করে থাকে।

রুক্ষ স্বরে বৃদ্ধ বলেন : আর তুই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিস্?

নমিতা এবারও নীরব। বাপের রুক্ষ স্বরে প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তার অন্তর্নিহিত কারণটা মনে পড়ে যাওয়ায় আর রাগ থাকেনা। রাগ বাবা-মা করতে পারেন বটে। মেয়েকে সৎপাত্রে দান করতে

কে না চায়—তাছাড়া তাকে পাত্রস্থ করতে কী অপরিসীম চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। সেই বাঞ্ছিত অতিথিটি আজ নিজে থেকে দ্বারে এসে উপস্থিত আর নমিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ কথা জানবার পর রাগ করতে পারেন বটে ওঁরা। কিন্তু নমিতা কি ক'রে বলবে যে ক্ষণিক মনোবিকলনে সে হঠাৎ প্রত্যাখ্যান ক'রে বসেছে বটে তবু ওর সমস্ত অন্তঃকরণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে তার ফিরে ডাকার প্রতীক্ষায়? কবে এসে সে তাকে বলবে—'তোমার প্রত্যাখ্যান আমি মানি না। তুমি আমার। আমি জোর ক'রে তোমাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়ি! আমার ভালবাসাকে আমি ব্যর্থ হ'তে দেবনা তোমার খামখেয়ালির জন্যে।'

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলেন: এটা তুমি ভালো করনি নমিতা!

নমিতা একটু চমকে ওঠে ওঁর কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন এবং 'নমিতা' ডাকটা কানে বাজে ওর। বলে: কেন বাবা?

: তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা।

নমিতা জবাব দেয় না। বৃদ্ধ বাপের অভিমানের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে। ও হাসে মনে মনে। মনে পড়ে সুরেখা দেবীর কথাগুলি: ও সব হ'চ্ছে শরতের মেঘ।

: নিজের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো। তোমার উপার্জনে বেঁচে আছি আমরা। তুমি নিজে বিয়ে করতে চাওনি—আমি বাধা দিইনি। কিন্তু লতুর বিবাহ সম্বন্ধে কোনও অভিমত জানানোর আগে তোমার উচিত ছিল বাপের সঙ্গে পরামর্শ করা—তা হ'ক সে বাপ অন্ধ, পঙ্গু!

: কি বলছ বাবা?

: ঠিকই বল্‌ছি নমিতা! আজ সন্ধ্যাবেলা ভূষণের পিসীমা এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে। তিনি বললেন ভূষণ নাকি লতুর সঙ্গে বিবাহের একটা প্রস্তাব এনেছিল—আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। কারণটা তিনি জানতে এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে।

নমিতা আশ্চর্য হ'য়ে বল্লে : ভূষণবাবু লতুর সঙ্গে বিয়ের একটা প্রস্তাব এনেছিলেন ?—আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি ? একথা বললেন তাঁর পিসীমা।

: তাই তো বল্লেন।

: তিনি তা জানলেন কি ক'রে ?

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে কথা বলেন : আমি তা জানতে চাইনি। সম্ভবত ভাইপো নিজেই জানিয়েছে তাঁকে। আমি বলেছি আমাদের আমলে ছেলে-মেয়ের বাপ-মায়েই কথাবার্তা চালিয়ে এসেছে। আপনার ছেলে যখন বাপ-মায় বদলে পাত্রীর দিদির কাছেই প্রস্তাব তুলেছে—তখন সেই দিদির কাছ থেকেই জবাবটা শুনবেন। উপার্জনক্ষম ছেলেমেয়ের গলগ্রহ বই তো নই ?

নমিতা বলে : কি ক'রে এ কথা রটেছে জানি না। রাগ অভিমান তোমরা করছ কর, বারবার উপার্জনক্ষম বলে আঘাত দিচ্ছ দাও—তবে একটা কথা জেনে রাগ ক'র। ভূষণবাবু ওরকম কোন প্রস্তাব আমার কাছে করেন নি, আর আমিও তা প্রত্যাখ্যান করিনি তোমাদের না জানিয়ে। গালাগাল দিচ্ছ দাও, তবে পরের মুখে মিথ্যা কথা শুনে না দিয়ে—নিজের কানে সত্যি কথাটা শুনে তারপর গাল দাও !

: আর নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি দিদি ?

চম্‌কে ঘুরে দাঁড়ায় নমিতা।

লতু উঠে এসেছে শয্যা ছেড়ে। দাঁড়িয়ে আছে দ্বারের পাশে। নমিতার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে ? বলে : কী ? কি বল্লি ?

: বলছি যে নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি তখনও কি চুপ করে থাক্‌ব ? আমি যে নিজের কানে শুনেছি দিদি ! উনি বল্লেন—লতুর সঙ্গে তো আমার একটা নিকট আর মধুর সম্পর্ক হ'তে চলেছে, আর তুমি ঈর্ষায় জ্বলে উঠে বল্লে —'সে নিকট সম্পর্ক হবার নয়—আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু—আমি রাজি নই !'

রূঢ় স্বরে হরিপদ পণ্ডিত গর্জন করে ওঠেন : নমিতা! কোনটা সত্যি? একথা তুমি বলেছিলে?

হরিপদ পণ্ডিতের এ কণ্ঠস্বরকে চিরকাল শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে চক্রবর্তী-পরিবার! শুধু নমিতা নয়, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই। কামিনীকে ত্যাগ করে আসার দিনও নমিতা উপার্জন-সম্বন্ধে কি একটা বাঁকা ইঙ্গিত করায় অমনি গর্জন করে উঠেছিলেন পণ্ডিত। সেদিন সে কণ্ঠস্বরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল নমিতা। আজ কিন্তু নমিতা একটুও বিচলিত হল না ও স্বরে। সেটা লক্ষ্য করেছিলেন বিন্দুবাসিনী। এই দৃঢ় কণ্ঠস্বরের পরিনাম তিনি অন্তত ভাল করেই জানেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এ স্বর তিনি শুনেছেন মাত্র কয়েকবারই। সে কয়বারই লক্ষ্য করেছেন তিনি জীবনে এসেছে একটা বড় রকমের পরিবর্তন। আজ নমিতা এ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠ্‌লনা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন বিন্দুবাসিনী। নমিতা কি এতদূর বদলে গেছে? রোজগার করছে বলে? চাকরি পেয়েছে বলে? গণকল্যাণ না কি সমিতির নেতা হ'য়েছে বলে? নইলে কেন সে এ আহ্বানে মাটির সাথে মিশিয়ে গেল না?

আসল কারণটা তিনি আন্দাজই করতে পারেন নি। নমিতার কানে গর্জনটা প্রবেশই করেনি। লতুর একটা ছোট্ট কথা তপ্ত লৌহ শলাকার মতো তার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ ক'রে মর্মস্থল পর্যন্ত দগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। আর কিছু সে শুনতে পায়নি।

আর্তস্বরে নমিতা লতুকেই প্রশ্ন করল : কি বল্লি? ঈর্ষায়?

: না তো কি? ছোট বোনের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, অথচ বড়—

: ব্যস্ চুপ!—গর্জন ক'রে ওঠে নমিতা!

লতুর নীচ অন্তঃকরণের ক্লেদাক্ত পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছে সে। একটা কথা বলবার স্পৃহা হয়না তার। কী লজ্জা! লতুর মনে এই ছিল? মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়।

একটু দূরেই শুয়ে আছে লতু। প্রাণ খুলে সে কাঁদতেও পারে না। কি

জানি যদি সবাই ভাবে এ কান্নাও উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, বিগত-যৌবনা নারীর! এ কান্না যে কতবড় দুঃখের কান্না তা তো কেউ জানতেও পারবে না।

বৃদ্ধ হরিপদও যেন ফুরিয়ে গেছেন। তাঁর ঐ রূঢ় গর্জনের সামনে চক্রবর্তী পরিবার চিরদিনই মাথা নত ক'রে এসেছে। এটি ছিল তার ব্রহ্মাস্ত্র। আজ তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর শেষ অস্ত্র! এখন কি করবেন তিনি? বঙ্গবিভাগটা আগাগোড়া ভুল জেনেও যেমন নীরবে মেনে নিয়েছিলেন—তেমনি ক'রেই কি মেনে নেবেন যে এ পরিবারের অভিভাবকের গদি থেকে চ্যুত হ'য়েছেন তিনি? আর্তকণ্ঠে তিনি ডেকে ওঠেন: নমু, লতু!

কেউ সারা দিল না।

বিন্দুবাসিনী বৃদ্ধকে শুইয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে সারারাত ছটফট করছে নমিতা। ঘুম হয়নি তার একরত্তি। এ কী কাণ্ড! লতু ধরে নিয়েছে ভূষণ তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এনেছিল—আর তার দিদি ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে প্রস্তাব? যে লতুর জন্যে তার ভালবাসার অন্ত নেই, চিন্তার বিরাম নেই,—যার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে সে এতদিন তার কাছ থেকেই কৃতঘ্নের মতো এই অভিযোগ আসায় ওর বেদনার পরিসীমা ছিল না! লতু, ছোট্ট লতু—প্রায় মায়ের মত মানুষ করেছে যাকে? ওর চেয়ে দশবছরের ছোট ছিল লতু। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়—লতুর পক্ষেও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিশোরী মেয়েটির পক্ষেও ভূষণের আবরণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা অসম্ভব নয়। নাটক-নভেল প'ড়ে প'ড়ে, আর পাড়ার যত অকালপক্ক বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তাই তার ধারণা হয়েছে ভূষণ তার আকর্ষণেই আসে এ বাড়ি। সব মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু লতু কি ক'রে ভাবতে পারল যে নমিতা ঈর্ষান্বিতা হয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে? দিদিকে এত ছোট ক'রে ভাবল কি ক'রে সে? আর সে কথা বাব-মার

সামনে প্রকাশ্যে বলতেও সঙ্কোচ হ'লনা তার? রাগে দুঃখে অভিমানে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করল। এক ফোঁটা ঘুম এল না।

মাঝে মাঝে অনুভব করলে যে পাশেই লতু জেগে রয়েছে। কাঁদছে সেও। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই; কিন্তু ঠিক পাশে যে শুয়ে আছে সেও কি তা বুঝতে পারবেনা? নমিতা সবই টের পায় কিন্তু কী করতে পারে সে? লতু বিছানায় শুয়ে কাঁদছে জেনেও তাকে সান্ত্বনার কথা বলতে পারলেনা। জীবনে এই বোধহয় প্রথম। অনেক দুঃখ রজনীই অতিক্রম করেছে ওরা বিনিদ্র নয়নে। পাশাপাশি শয্যায়। লতুর কান্না দেখলে সে কোনদিনই স্থির থাকতে পারে না। নিজের চোখ মুছে গিয়ে বসে ওর মাথার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে শান্ত করে এই দুরন্ত বোনটিকে।

আজ কিন্তু একতিল উৎসাহও অবশিষ্ট ছিলনা!

কী লজ্জা! নমিতা ভাবে, একই পুরুষকে ভালবেসেছে ওরা। আজ থেকে ওরা আর সহোদরা নয়—একই পুরুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বী নারী!

কথাটা মনে হ'তেই একটা ছিছিকারে ভরে যায় সারা মন!

পরদিন সকালে উঠ্‌তে নমিতার বেশ দেরি হ'ল। সারারাত্রি জেগে—ভোর রাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজ রবিবার—স্কুলে যাবার তাগাদা নেই। রবিবারটা ভালোই লাগে ওর। সপ্তাহান্তে একটি দিন ছুটি। তাছাড়া এই দিনে প্রায়ই ভূষণও আসে সপ্তাহান্তের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে। আজ কিন্তু রবিবার হওয়ায় বিব্রতই বোধ করল সে। স্কুলে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। সারাদিন বাড়িতেই থাকতে হ'বে সবার চোখের সামনে। লতু কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। মা উনুনে আগুন দিয়েছেন।

নমিতা দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। মশারিটা টেনে নামায়। সেদ্ধ করে কাচবে সেটা আজ। প্রয়োজন ছিলনা। অর্থাৎ প্রয়োজনটা মশারির ছিলনা, ছিল নমিতার। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে দিনটা কাটিয়ে

দিতে চায়। হরিপদ বসেছিলেন বাইয়ের দাওয়ায়। বিন্দুবাসিনী বালতিটা তুলে নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ ডাকেন : নমু, এদিকে শোন।

নমিতা হাতের কাজ রেখে এসে দাঁড়ায়।

: লতু কোথায় রে?

: জানিনা বাবা। সকালেই কোথায় বেরিয়েছে।

: আর তোর মা?

: জল আনতে গেছেন।

: ও। তুই ব'স এখানে। তোর সঙ্গে কথা আছে।

আবার সেই কালকের গ্লানিকর আলোচনা হবে। বিরক্ত বোধ করে নমিতা। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

: কই এখানে এসে বস্। রাগ করে আছিস্ নাকি রে আমার উপর?

নমিতা ধীরে ধীরে বাপের পাশে এসে বসে।

: রাগ করিস না মা। তুই রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা? অন্ধ বুড়ো মানুষ না হয় রাগের মাথায় দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছি।

নমিতা কথা বলে না। উদ্গত অশ্রু গোপন ক'রে নতমুখে বসে থাকে। বৃদ্ধ বলতে থাকেন : কাল তুই রাগ করলি কেন বলত? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। যখন দেশে ঘরে ছিলাম তোকে পাত্রস্থ করবার কম চেষ্টা করিনি। ওরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত আর আমি ভগবানকে অভিশাপ দিতাম। এখন মনে হয়—ভগবান বোধহয় ভালোর জন্যেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি সে সময়ে তোর বিয়ে হ'য়ে যেত—তাহলে আজ আমাদের না খেয়ে মরতে হ'ত। বৌমার অতকাণ্ডের পর—

: জানি বাবা।

: তুই তো সবই জানিস মা! আমি অন্ধ হ'য়ে পড়ার পরেও যশোরের রায় বাড়ি থেকে তোর সম্বন্ধ আসে—তখন তুই বলেছিলি 'বাবা আমি বিয়ে

করব না—আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে?' তখন রাগ করেছিলাম।

নমিতা বুঝতে পারে ভুল বলছেন হরিপদ পণ্ডিত। সে সময় ওর বাবাও অন্ধ হননি—সেও আপত্তি জানায়নি। কিন্তু প্রতিবাদ করেনা। হয়তো ঘুলিয়ে ফেলেছেন বুড়ো মানুষ—না হয়তো মনকে ঐ রকমই একটা প্রবোধ দিতে দিতে সেটাই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। বৃদ্ধ বলেই চলেন

: পরে ভেবে দেখেছি—মা তো আমার ঠিক কথাই বলেছে। সে যদি বিয়ে না করতে চায় নাই করল। কত মেয়েই তো লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করছে। তারপর থেকে আর ও কথা আমি বলিনি। কিন্তু লতুর কথা তো অন্য রকম। ওটাকে পার করতে পারলে তো তোর দায়িত্বই হালকা হয়। ভূষণ যখন নিজে থেকে ওকে বিয়ে করতে চায়—

: ভুল করছ বাবা, ভূষণবাবু লতুকে বিয়ে করতে চাননি।

: কিন্তু ঐ যে লতু বল্ল কাল রাত্রে?

: আমি মিছে কথা বলিনা বাবা।

বৃদ্ধ চুপ করে যান। ঘটনার সূত্র বোধহয় হারিয়ে যায় বৃদ্ধের কাছে। কোথায় কি যেন একটা ভুল হ'চ্ছে। নমিতা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলবে না। অন্তত তার বাপের কাছে নয়। এদিকে লতু স্পষ্টই মুখের উপর বলে গেল যে সে নিজের কানে শুনেছে। ভূষণের পিসীমাও শুনেছেন ভূষণের কাছে। তাহ'লে ব্যাপারটা কি? হরিপদ পণ্ডিত অন্যদিক থেকে সুরু করেন: আচ্ছা বেশ, তোর কথাই মেনে নিলাম। ভূষণ প্রস্তাব করেনি এখনও। কিন্তু সে যে লতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এটা তো মিছে কথা নয়? ওদের দুজনের মধ্যে যখন একটা অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে তখন প্রস্তাবটা আমরাও তুলতে পারি।

: ওদের দুজনের মধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চারিত হ'য়েছে এটা তুমি জানলে কি ক'রে? প্রস্তাব করলে ভূষণবাবুই যে পিছিয়ে যাবেন না তাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?

: আমি অন্ধ হ'লেও কিছু কিছু বুঝতে পারি মা। কাল দুপুরে যখন

ভূষণ এল তখন তোর মা ঘুমুচ্ছে। আমিও চুপ করে শুয়ে আছি। তুই তখনও ইস্কুল থেকে ফিরিস নি। লতুর সঙ্গে ও ঘরে ভূষণ অনেকক্ষণ ধরে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে আলাপ করল। মাঝে মাঝে ওদের চাপা হাসিও কানে এল আমার। ওরা মনে করেছে আমিও বুঝি ঘুমাচ্ছি।

নমিতা বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে: কাল ভূষণবাবু এসেছিলেন? ঠিক জানো তুমি?

: জানিনা? আমি শুনলাম ভূষণ লতুকে বল্লে 'তোমার দিদিকে বল একটা ছোট ছেলে এসে জামা কাপড়গুলো দিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম তা বলবে না কিন্তু।' লতু জবাবে বলল 'অতই বোকা কিনা আমি।'

নমিতার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ধরে আনে ভূষণকে। চিৎকার ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল—কেন সে এভাবে খেলা করছে ওদের দুজনকে নিয়ে। কী সে চায়? ওদের সুখের সংসারে এভাবে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যটা কি? মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছে বলে কি এভাবে পুতুল খেলা করবে তাদের নিয়ে ভূষণ? বাপ আজ মেয়েকে বিশ্বাস করেনা—বোন দিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বৃদ্ধ আর্ত কণ্ঠে ডাকেন: নমু?

: আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল বাবা। বেশ তো লতুর বিয়ের জোগাড় দেখ। আমি এতসব কথা জানতাম না।

: সে তো আমি জানিই। তুই ইস্কুলে বেরিয়ে যাবার পর লতুও বেরিয়ে যায় ওদের বাড়ি। কখনও ভূষণ আসে এ বাড়ি।

নমিতা চুপ করে থাকে।

: তাহ'লে আজ ও বেলা তোর মাকে নিয়ে ভূষণদের বাড়ি যাস। ওর পিসীমার সঙ্গে কথা বলে আসিস্‌। আর ঐ সঙ্গে অনুর ওখানেও একবার যাস। ওরা ওদের কর্তব্য না করলেও আমাদের তো খোঁজ নেওয়া উচিত। বোনের বিয়ে। অনুকে তো এ সময় আলাদা সরিয়ে রাখতে পারি না।

নমিতা কোন কথাই বলে না। তাই সে করবে। যৌবনসীমান্তবর্তিনী

মেয়েটির ক্ষোভ নেই আর। শুধু একবার ভূষণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে ঃ—এই যদি তোমার মনে ছিল তা হ'লে আমাকে নিয়ে ও নিষ্ঠুর খেলা কেন খেললে তুমি? মিথ্যা স্বপ্নজাল কেন বোনালে আমাকে দিয়ে?

নিতাই কবিরাজ সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন ওঁদের দাবী। পুরানো পঞ্চায়েতের বদলে নতুন এ্যাড-হক কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন ব্যবস্থা চলছে। বিষ্টুপদ, গোকুল, নবীন পতিতণ্ডি প্রভৃতি পুরানো পঞ্চায়েতের যারা সভ্য তারা প্রতিবাদ করতে আসেনি। কালের গতি-কে মেনে নিয়েছে তারা। আসলে ওরা প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। পুরানো কাণ্ডন্দি-যে তাদের ঘাঁটতে হ'লনা এটাই যথেষ্ট। অভিযোগের ফিরিস্তিটা তারাও জেনেছিল। সেগুলোর যে জবাবদিহি করতে হ'লনা এই নগদ লাভ। জনসেবা করার মোহও ঘুচে এসেছিল ওদের। ভোলের ব্যবস্থা থাকলেও ভামাডোলের বাজার আর নেই। লোকগুলোও সচেতন হ'য়েছে। আর নূতন সব অফিসার যাঁরা আসতে সুরু করেছেন তাঁরা এক একটি চীজ্! কোথা থেকে যে এইসব অপোগণ্ডগুলোকে আমদানী করা হ'চ্ছে ওরা ভেবে পায়না। নয়া এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচিই একটি উদাহরণ। ইনি সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুরানো ইতিহাসগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন। কী যে উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। দলিল পত্র থেকে কতকটা কি উদ্ধার করেছেন বুঝবার উপায় নেই। তবে পুরানো দিনের অনেক ইতিহাসই যে ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন এটা বোঝা যায়। ফলে ইদানিং সামলে চলতে সুরু করেছে বিষ্টু গোকুলেরাও।

যতীশবাবু অফিসের একজন পুরানো ঘাঘী। বিষ্টুপদকে ডেকে আড়ালে একদিন বল্লেন ঃ আপনারা তো বাঁচলেন মশায়। জ্বালা হ'য়েছে আমাদের! ঐ হারামজাদা নিতাই ঠাকুর্দা হ'য়েছে ওঁর পরামর্শদাতা। সর্বদাই গুজ্ গুজ্ ফুসফুস্ লেগেই আছে।

বিষ্টু বলে ঃ আরে রয়েন। পেরথম্ ক'দিন ফোঁস ফোঁস করবই। তারপর ঠিক পোষ মানব। রাধেকিষ্টো বুলি পড়ব। কত জ্বালায়, কত জ্বালবায়্।

যতীশবাবু বলেন : আরে না মশাই সে জাতের লোক নয়। অতি বজ্জাতেস। ও কোনকালেই পোষ মানবে না।

নামোল্লেখ না করলেও দুজনেই বোঝেন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেবের কথাই আলোচনা হ'চ্ছে।

বিষ্টুপদ বলে : এ্যাদ্দিন আছিল কোই? ডেপ্‌টি?

: ছাই! ডেপুটি হ'তে হ'লে লেখাপড়া করতে হয়। এঁর কোয়ালিফিকেসন জেল খেটেছেন! আরে বাবা খদ্দরের টুপি পড়লেই যদি এ্যাডমিনিস্ট্রেসন চালান যেত তাহ'লে ভাবনা ছিল না।

বিষ্টুপদ বলে : তা তো বটেই!

: কাল আমায় ডেকে কি বল্লে জানেন? বল্লে—'ই ব্লকের শ্রীনিবাসকে কুমিরের ছানা ক'রে আর কতদিন রাখবেন যতীশবাবু? ওটাকে এবার সত্যিই পি. এল. ক্যাম্পে পাঠান।

বিষ্টুপদর চোখ বড় হয়ে যায়; বলে : হেই কথাডা কইলেন! কুমিরের পোলা? আপনে কি কইলেন?

: আমি আর কি বলব? চুপ করে রইলাম। কতটা জানে আর কতটা জানেনা—তাই কি বুঝতে পারি? আমি স্রেফ চেপে গেলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ই-ব্লকের শ্রীনিবাসের রোজগারটা ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। অভিনয় করেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যেত তার। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় নয়, জীবন-নাট্যমঞ্চেই তাকে নিখুঁত অভিনয় ক'রে যেতে হ'ত বিভিন্ন ভূমিকা। ডিরেক্টার বার কয়েক রিহার্সাল দিইয়ে নিতেন আড়ালে। হুবহু নকল করত সে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ত কর্তৃপক্ষের সামনে। কখনও কলকাতায়, কখনও কলোনীর অফিসেই। দাঁড়াতে হ'ত তাকে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে ঝুকেকরে। বিকলাঙ্গ তার দেহ। দুটো চোখই অন্ধ। ডান হাতখানা কুনুই থেকে কাটা। মুখের একটা দিকে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে। মিলে কাজ করত সে নারায়ণগঞ্জে না ঢাকায়। কারখানাতেই পা ফস্‌কে যায়—অগ্নিগর্ভ বয়লারটায়

আঁচে ঝলসে যায় চোখমুখ। হাতটাও পরে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল পচনক্রিয়া সুরু হ'য়েছিল ঘা শুকাবার সময়। করুণার পাত্র শ্রীনিবাস। মেক আপের দরকার হ'তনা তার।

পরিদর্শনকারী উপরওয়ালা অফিসার প্রশ্ন করেন : তোমার নাম হরেকৃষ্ণ দেবনাথ ?

শ্রীনিবাস নন্দী বলে : আইজ্ঞা হাঁ হুজুর।

: পরিবারে আর কে আছে ?

: কেউ নাই হুজুর! বউবেটী কেউ নাই। অথন হুজুর না দেখলি মরুম্। নিচ্চই মরুম্।

কেঁদে ফুলো হাত বাড়িয়ে হুজুরের ফিতে বাঁধা জুতোটা জড়িয়ে ধরে। বিব্রত হন কলকাতার অফিসর ভদ্রলোক। করুণা হয়। হওয়াই স্বাভাবিক : বলেন : ওঠ, ওঠ আচ্ছা স্টারভেসান ডোল পাবে তুমি। ফ্রি র‍্যাশানের কার্ড দেওয়া হবে তোমার নামে। সপ্তাহে সপ্তাহে ক্যাস ডোল আর চাল-ডাল নিয়ে যাবে অফিস থেকে। বুঝেছ ?

ঘাড় নেড়ে শ্রীনিবাস জানায় বুঝেছে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায়। ওকে হাত ধরে ই-ব্লকে পৌছে দিয়ে আসে যতীশবাবুর কর্মচারী। বাড়ি পৌছানোর পর তার হাতে গুঁজে দেয় একটা দুটাকার নোট। তাই দিয়ে সংসার চালায় শ্রীনিবাস। এছাড়া স্টেশনে ভিক্ষাও করে। সেটাই তার প্রধান উপজীবিকা। অভিনেতা হিসাবে যেটা পায় সেটা উপরি রোজগার। একা মানুষ। চলে যায় ভালোই। আবার একদিন হয়তো ডাক পড়ে। আবার এসে দাঁড়ায় ক্যাম্প অফিসে। অপর একজন অফিসর প্রশ্ন করেন : তোমার নাম জীবন পর্বত ?

হুহু ক'রে কেঁদে ওঠে শ্রীনিবাস : আইজ্ঞা না হুজুর। জীবন আমার নাম লয়!

চম্‌কে ওঠেন যতীশবাবু! বেটা আজ বলে কি ? এত রিহার্সাল ব্যর্থ হয়ে গেল ?

শ্রীনিবাস কিন্তু ভুল করেনি। ডিরেক্টারের উপর টেক্কা দিয়ে একহাত মৌলিক অভিনয় দেখিয়ে নেয়। সংলাপও তার নিজস্ব : জীবন আমার নাম লয় হুজুর! আমার নাম মরণ; মরণ! বাপে নাম দিছিল জীবন! জীবন মইর‍্যা গ্যাছে গা! তখন আমি মরণ। হায় ঠাকুর, মরণও হয় না আমার!

মেজের উপর বিকৃত মুখখানা ঠুক্‌তে থাকে ও।

অফিসর যতীশবাবুর দিকে ফিরে বলেন : ইট্‌স্ এ পিটি দ্যাট য়ু ডিড্‌নট রেকমেণ্ড হিস্ কেস আর্লিয়ার। পি. এল. ক্যাম্প গেলে দেখি যত জোয়ান মর্দ বসে বসে পার্মানেণ্ট লায়াবেলিটি হ'য়ে ডোল খাচ্ছে—আর এদিকে সত্যি-কারের সাফারার পড়ে আছে কলোনীতে। আপনাদের ইনেফিসিয়েন্সির জন্য গোটা ডিপার্টমেণ্টের বদনাম হয়।

যতীশবাবু মুখটা কাচুমাচু করেন। এ কেসটা ইতিপূর্বে কেন পাঠান হয়নি তার কারণ দেখাতে বলেন : ও স্যার নতুন এসেছে কলোনীতে।

: আইসা! কতদিন হ'ল এসেছো তুমি এখানে?

শ্রীনিবাস চুপ ক'রে থাকে। সে নিজে এসেছে বছর পাঁচেক; কিন্তু এখন সে জীবন পর্বত। জীবনের নাম কবে থেকে কলোনীভুক্ত করা হ'য়েছে জানা নেই তার। বলে : খেয়াল নাই হুজুর।

যতীশবাবু বলেন : মাস দুই হবে?

চতুর শ্রীনিবাস সামলে নেয় : হ কর্তা। তা হইব। ইটা তো অগ্রাণ? পূজার সময় আইছি আজ্ঞা।

: আচ্ছা যাও তুমি। ফ্রি ডোলের বন্দোবস্ত হবে তোমার।

ফিরে যায় শ্রীনিবাস। জীবন পর্বতের অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ি ফেরে।

সেই শ্রীনিবাস!

বাগচি সাহেব একেই বলেছেন 'কুমিরের ছানা'। যতীশবাবুর ঘাবড়ে যাওয়া অকারণ নয়।

এমনি কত তুচ্ছ ইতিহাস!

বাগচি সাহেবের অল্প বয়স। অক্লান্তদার। সারাদিন অফিস ক'রে যখন বাড়ি যান তখন একগাদা ফাইলপত্র সঙ্গে নিয়ে যায় আর্দালি। পুরানো দলিল। সব উল্টেপাল্টে দেখছেন তিনি। যতীশবাবুর দল শঙ্কিত হয়। খাতাপত্র অবশ্য ঠিকই আছে। তবে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় সাপ বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক কি? সন্ধ্যার পর বাগচি সাহেব নিজেই টাইপ করতে বসেন। সকাল বেলা অফিসে এসে ডাকেন ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক মিহিরকে

: ইস্যু রেজিস্ট্রারখানা নিয়ে আসুন তো।

ইস্যু রেজিস্ট্রারে পাঁচ-সাতখানা মেমো নম্বার নিজের হাতেই বসান। 'সবজেক্ট'এর ঘরে লিখে দেন 'কন্‌ফিডেন্সিয়াল!' পিয়ন শীল মোহর করে ওঁরই সামনে। খামগুলোর উপর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক কম্পিত হস্তে টিকিট আঁটে।

যতীশবাবু নিম্নকণ্ঠে বলেন: যাচ্ছে কোথায়? মিহির?

: অকল্যাণ্ড।

: সব কখানাই?

: হ্যাঁ!

: শালা!

এ জাতীয় কথোপকথন প্রায়ই আজকাল হয় অফিসে। কাঁটা হয়ে আছে সবাই। মাঝে মাঝে আসতে স্থুরু করল বদলির অর্ডার। পুরানো অনেকেই চলে গেল। এলো অচেনা ছেলের দল। এরা ডেপুটেশান দেয়। ফল হয়না।

মিহির বলে: ব্যাপার কি যতীশদা? খোল-নল্‌চে সবই কি বদলে যাবে নাকি।

: বদলাবে না? না হ'লে নিজেদের ভাইপো ভাগ্নেগুলো চাকরি পাবে কি ক'রে? নিজেই বুঝবেন। সব পুরানো স্টাফ চলে গেলে 'ওল্ড আন্‌ডিসাইডেড' কেসগুলো কি করে মেটান আমিও দেখব।

: কেন সে তো আপনিই আছেন?

: আমি? আমি কি বলব? কে কোথায় কি ক'রে রেখে গেছে তার সব জবাবদিহি করব আমি? দায় পড়েছে আমার।

: তা দায় আপনার বইকি। আপনিই তো অফিসের ওভার-অল ইনচার্জে ছিলেন।

যতীশবাবু চীৎকার করে ওঠেন: তাই বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? এই যে উনি আজ দিন সাতেক ধরে সি. আই. সীটের ফাইলটা আটকে রেখেছেন বাড়িতে—রেজিস্ট্রারখানাও নিয়ে গেছেন—আমি কি বুঝিনা কি করছেন তিনি? যখন বল্লাম শীতলকে বদলি করবেন না—তখন তো শুনলেন না—সে থাকলে সেই ঝক্কি পোয়াত। ধর যদি হিসাবে এখন কম-বেশী হয় কোথাও তবে কে জবাব দিহি করবে?

মৃণাল বলে: বেশী হ'লে আমাকে দায়ী করবেন দাদা! কম্ হ'লে অবশ্য মুশ্‌কিল। কি বলিস মিহির?

দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। বন্ধু ওরা দুজন। পাপের কারবারে ছিলনা কোনদিন। শীতল ছিল স্টোরের চার্জে। যতীশবাবুর প্রিয়পাত্র। বদলি হয়ে গেছে সে। নতুন যে ছোকরা এসেছে—সে প্রভিসনালি চার্জ নিয়েছে। চাবি আছে যতীশবাবুর কাছে। মাল গুন্‌তি করে সে দায়িত্ব নেবে।

মিহির বলে: শীতল বদলি হয়ে যাওয়াতে দাদার বড় অসুবিধা হয়ে গেল, না দাদা?

যতীশবাবু চটে ওঠেন: মেলা বক্‌বক্ করনা দিকিনি। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলনা। যা করছ তাই কর। তোমার আর কি? বসে বসে খামের উপর টিকিট সাঁটো! বউকে চিঠি লিখতে গিয়ে যদি সার্ভিস-স্ট্যাম্প কিছু সরিয়ে থাক তাহ'লে সেই হিসাবটা মিলিয়ে রাখ বরং।

মৃণাল বলে: দাদা ভীষণ চটেছেন মনে হচ্ছে?

গুম্ মেরে বসে থাকেন যতীশবাবু।

মিহির বলে: টিকিটের হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেব দাদা। কিছু ভাববেন না আপনি। করোগেড টিনের হিসাবটাও যদি না মেলে তবে আপনার ঘাবড়াবার কি আছে? কেউ তো বলতে পারবেনা ব্যারাকপুরের

বাড়িখানা আপনি এই টিন দিয়ে তুলেছেন—অথবা টিন বিক্রি ক'রে কিছু নগদ কারবার করেছেন আপনি।

লাফিয়ে ওঠেন যতীশবাবু: বলি কাজ কর্ম করতে দেবে—না ভ্যানর ভ্যানরই করবে সারাদিন? অফিসটা আড্ডাখানা নয় বুঝলে? এখানে মুখটি বুঁজে কাজ করতে হয়।

বলে মুখব্যাদান ক'রে এক গোছা পান পুরে দেন গালে! ঘস্‌ঘস্‌ করে কলম টানেন তিনি নোট শীটে।

আবার দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। কৌতুকদীপ্ত সহাস্য-দৃষ্টি।

জংসনের হাসপাতালে আজকাল একাই আসতে পারে কামিনী। নিতাই ঠাকুর্দা ভর্তি ক'রে দিয়ে যাবার দিন সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আসেন অবশ্য তিনি। খোঁজ খবর নিয়ে যান। নিতাই ঠাকুর্দার বন্দোবস্তে একটা ফ্রি রেশনের ব্যবস্থাও হ'য়েছে আজকাল। নিতাইপদর স্বেচ্ছা-সেবকের দলের কয়েকটি ছেলে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। গোরাকে নিয়ে কামিনীর দিন কেটে যায় কোন রকমে। ঘরে রোগী নেই। অর্ধেক কাজ কমে গেছে। ক্রমশঃ সেরে উঠছে অনিমেষ। দু তিন দিন বাদে গোরাকে নিয়ে কামিনী দেখা করতে যায়। কখনও যোগেন নায়েক, কখনও অন্য কোন ছেলে থাকে সঙ্গে।

বিষ্টুপদ কামিনী-কাঞ্চনের লোভ একেবারেই ত্যাগ করেছে। অনিমেষ হাসপাতালে যাওয়ার খবরটা সে জানতো না। অনেকদিনই অপেক্ষা করেছিল সে—তার দেওয়া শাড়িখানিতে তনুদেহ ঢেকে কামিনী এসে দাঁড়াবে তার দোকানে। সে এল না। কৌতূহল হ'ল বিষ্টুপদর! ব্যাপারটা কি? অনিমেষ কি ভালো হ'য়ে উঠ্‌ল? কিন্তু ওদের সংসারটা চলে কি ক'রে? উপযাচক হ'য়ে যাওয়া ভালো হবে কিনা বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তারপর একদিন লক্ষ্য করল ছোট ছেলেটির হাত ধরে কামিনী তার দোকানের সামনে দিয়ে দিব্যি গটগট ক'রে চলে গেল। সঙ্গে রয়েছে বাচ্চু পাল। ঠাকুর্দার

এক চ্যালাচামুণ্ডা। বিষ্টুপদ তাই আর দোকান থেকে নেমে এল না; কিন্তু অবাক হ'য়ে সে দেখলো মেয়েটার পরনে একখানা নতুন শাড়ি। তার দেওয়াখানা নয়—অন্য একটা। মুখ-চোখ দেখে অনশনক্লিষ্টা বলেও মনে হ'ল না। অবাক হ'ল বিষ্টুপদ। তার অবর্তমানে তাহ'লে বাচ্ছু পাল এসে অধিকার করেছে মেয়েটাকে? বাচ্ছু পাল? ছেলেটাকে তো সে ভালো বলেই জানতো। আর মেয়েটাই বা কি। অসুস্থ স্বামীকে বাড়িতে একলা ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! অনুতাপ হয় বিষ্টুপদর। কেন বোকার মত দূরে স'রে রইল সে?

দুদিন পর বিষ্টুপদ আবার দেখল মেয়েটি বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে—ছেলের হাত ধরে। এবার সঙ্গী বাচ্ছু পাল নয়—যোগেন নায়েক। বিষ্টুপদ নিজের মনেই বলে: বা। এ তো দেখি একেবারে পঞ্চপাণ্ডবকেই গেঁথে ফেলেছে!

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বিষ্টুপদর পক্ষে। পরদিন সন্ধ্যায় সে ঘুরঘুর করছিল কামিনীর বাড়ির আশেপাশে। ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে সাহস হ'ল না ওর—কি জানি কোন পাণ্ডব আছেন ভিতরে কে জানে? ওপাশে স'রে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করলে। চেষ্টা ফলবান হয় না। হঠাৎ ঘাড়ের উপর পড়ল একখানা লৌহকঠিন হাত। বিষ্টুপদ ঘুরে দেখে স্বয়ং মধ্যম পাণ্ডব যোগেন নায়েক। ঠাকুর্দার স্বেচ্ছাসেবক দলের একটা গুণ্ডা।

যোগেন বলে: এ বাড়িতে একজন মহিলা একা থাকেন।

: হ জানি। কামিনী। তা হইছে কি?

: হয়েছে এই যে তিনি আপনার রক্ষিতাও নন, অরক্ষিতাও নন। ফের যদি কোনদিন এই জানালা দিয়ে মুণ্ডু গলাতে দেখি তবে মুণ্ডুখানা রেখে সেদিন বাড়ি যেতে হবে। বুঝেছেন?—যান্!

: কী কও! এত বড় আস্পর্ধা! জান আমি লোকডা কে? আমি বিষ্টুপদ মজুমদার!

: জানি আপনি বিষ্টুপদ হারামজাদ! কলোনীতে আপনাকে না চেনে কে? কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না সেই স্বনামধন্য বিষ্টুপদ হারামজাদের মুণ্ডুখানি এককিলে চেপ্টে দেবার জন্যে কলোনীর শতখানেক ছেলের হাতের মুঠো নিস্‌পিস্‌ করছে—শুধু ঠাকুর্দার হুকুম পাইনি বলে পারছি না। আর কি বলার আছে বলুন?

বিষ্টুপদ জোয়ান যোগেন নায়েকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জনশূন্য পথটার দিকে একবার দেখল। ওর কথাটা যে মিথ্যা নয় এটা আর যেই জানুক না জানুক স্বয়ং বিষ্টুপদ হাড়ে হাড়ে জানে। এসব ছেলের অসাধ্য কাজ নেই। মিনমিনে গলায় বলে: আমারে অপমান কর তুমি?

: অপমান? অপমান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। আমার ইচ্ছা কীচক বধ করার। কিন্তু কী করব বলুন—ঠাকুর্দার হুকুম পাইনি। তবে আর একটি কথা বল্লে বিনা হুকুমেই কীচকবধ খতম করব। বিশ্বাস না হয় তবে আর একটা কথা বলে দেখুন।

বিষ্টুপদ সম্ভবত বিশ্বাস করে। মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে কীচকবধটা আর অসম্ভব কি? দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে স'রে পড়ে। প্রাণখুলে হাসতে থাকে যোগেন নায়েক।

কামিনী এতকথা জানতো না। সে শুধু দেখেছে বিষ্টুপদ আর তার ছায়া মাড়ায় না। স্বেচ্ছাসেবক দলের অনেকগুলি ছেলেই আসে ওর কাছে। রাখাল, কানাই, যোগেন, বাচ্চু। কলোনীরই সব ছেলে। ছোট ভাইয়ের মত এসে আবদার করে। গল্প করে। কোনদিন হয়তো একগাদা কাঁচা চিনে বাদাম এনে বলে: বৌদি, ভেজে রেখে দেবেন। আমরা মাঝে মাঝে এসে খাব।

কখনও লাউটা বেগুনটা এনে দেয়। বলে: ওবেলা এসে একটু তরকারি খেয়ে যাবো বৌদি।

হয়তো আসে। হয়তো আসে না।

ওদের ভালবাসার দান গ্রহণ করতে বাধে না কামিনীর। সপ্তাহান্তে

র‍্যাশানটাও ওরাই দিয়ে যায়। ঠাকুর্দা একখানা শাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের টাকায় নয়। সরকারী সাহায্যই এসে পৌছায় ওর ঘরে। এরা শুধু চিনির বলদ। কামিনী ভাবে এদেরও তো অভাব অনটনের সংসার। এরা তো চুরি করে না আগের ওদের মত? আবার শ্রদ্ধা বাড়ে মানুষের উপর। মানুষ মাত্রেই তাহ'লে পশু নয়। স্বার্থ ই সবার মূলমন্ত্র নয় তা হ'লে। ভালো খারাপের মেশানো এ দুনিয়া। ভাবে কামিনী। এখানে বিষ্টুপদও থাকে যোগেন নায়েকও থাকে, এখানে লালু ডাক্তারও প্র্যাক্টিশ করে, নিতাই কবিরাজও রোগী দেখেন, এ দুনিয়ায় যতীশবাবুরাও সরকারী কাজ করেন, বাগচি সাহেবের মত সরকারী অফিসারও আছে।

নমিতাকে একলাই আসতে হয় ভূষণের বাড়ি। নতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। বাড়ি থেকে অবশ্য বিন্দুবাসিনীকে নিয়েই বেরিয়েছিল; কিন্তু তিনি ফিরে গেলেন মাঝপথ থেকে। বস্তুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে একাই এল নমিতা।

বিন্দুবাসিনীকে ফিরতে হ'ল অবশ্য অন্য কারণে।

ওঁরা ভূষণের বাড়ি যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রস্তাব করলেন অনুকে দেখে যাবেন। নমিতা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু বিন্দুবাসিনী অনেকদিন পর পথে বেরিয়ে মনটা বদলে ফেলেছেন। নতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছেন। দুদিন পরেই হবে নতুর বিয়ে। বড় ছেলেকে তো তখন সরিয়ে রাখতে পারবেন না। খবরটা নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া অনিমেষের দোষটা কি? বাবলুকে পাঠিয়ে খবরটা দেয়নি বলে কিছু ত্যাজ্য-পুত্র করতে হবে না তাকে। নমিতা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখে—সে বাড়ির ভিতরে যাবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিন্দুবাসিনী প্রতিবাদ করেননি। তিনিও স্থির করেছিলেন কামিনীর সঙ্গে কথাও বলবেন না। অনিমেষকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসবেন। বউকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সম্পর্কটা শুধু পুত্রবধূর সঙ্গেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে। পুত্রের সঙ্গে নয়।

গলির মোড়টা ঘুরেই ওঁদের থেমে পড়তে হ'ল।

কামিনী সদর দরজায় তালা লাগিয়ে গোরার হাত ধরে কোথায় চলেছে। ওর সঙ্গে রয়েছে একজন ছেলে। বছর বিশেক বয়স। সুন্দর সুগঠিত চেহারা। নমিতা অনেকবার দেখেছে ওকে ঠাকুর্দার ওখানে—নামটা জানা নেই। কলোনীরই ছেলে। কামিনীর মুখচোখ পরিষ্কার। একটু প্রসাধন করেছে বলে মনে হয়। পরিধানে একটা আনকোরা নতুন শাড়ী। খালি পা—আলতা পরেছে। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। ড্রেস ক'রে কাপড় পরেনি যদিও—কিন্তু বাইরে যাবার জন্য কুঁচি দিয়েই সাধারণ করে পরেছে শাড়িখানা। ব্লাউসটাও নতুন—নইলে নমিতা চিনতে পারত।

কামিনী গোরার এক হাত ধরেছে—ছেলেটি ধরেছে আর এক হাত। তার ও হাতে একটা গাঁদা ফুলের তোড়া। গায়ে টুইলের হাফসার্ট—পরিষ্কার ধুতি—পায়ে স্যাণ্ডেল।

নমিতারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কামিনী দেখতে পায়নি ওদের। বেশ সপ্রতিভ ভাবে নমিতার নাম-না-জানা যুবকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে ওরা এগিয়ে গেল। নমিতা হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি গোরাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল পানের দোকানের দিকে। দু খিলি পান কিনে এনে একটা নিজের মুখে পুরে দিল—আর একটা দিল কামিনীকে। কি একটা কথা বলল সে। অনেক দূর থেকে বলে শোনা গেল না। দুজনেই হেসে উঠল কথাটায়। এটা বোঝা গেল।

ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইল। ব্যাপার কি?

নমিতা বলে: বাড়িতে তালা দিয়ে ও কোথায় গেল? দাদা তাহ'লে কোথায়?

বিন্দুবাসিনী জবাব দিলেন না। নিঃসন্দেহে অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে। আলতা-পরা সিঁদুর-মাখা পুত্রবধূ যখন বাড়িতে তালা মেরে বৈকালিক ভ্রমণে বার হচ্ছেন তখন অনিমেষ যে ভাল হ'য়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এটা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কামিনীর এতদূর অধঃপতন হবে? ছেলের

হাত ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে সান্ধ্যভ্রমণে বের হচ্ছে সে পরপুরুষের সঙ্গে ?

: আরে নমু যে ! কই যাও ?

এগিয়ে আসে বিষ্টুপদ।

: দাদা বৌদিরা কোথায় ?

: তোমাগো বউদি ? এই তো বাহির হইয়া গেল গা। দেখ নাই ?

: হাঁ, দেখলাম। সঙ্গে ওটি কে বলুন তো ?

: অরে চিন না ? রাখাল। রাখাল দেবনাথ। মহা হারামজাদ ছুক্‌রা !

: কোথায় গেল বলুনতো ওরা।

হাসে বিষ্টুপদ। ফোঁগলা দাঁতের মধ্য থেকে জিবটা বার হ'য়ে আসে। বলে : তোমারে আর কি কমু, কও নমু। নিত্যি নুতন ছুক্‌রা আসতেছে ! সব কথা তো কওন যায় না। তোমাগো ভালবাসি—তাই না কই।

বিন্দুবাসিনী বিষ্টুপদর সঙ্গে কথা বলতেন না। এ সময়ে কিন্তু তিনি আব সঙ্কোচ না ক'রে প্রশ্ন ক'রে বসলেন : কিন্তু অনু কোথায় ? ঘরে তালা মারা কেন ?

বিষ্টুপদও লক্ষ্য করে ঝাঁপের দরজায় তার দিয়ে একটা রিং বানিয়ে তাতে তালা লাগানো আছে। অনিমেষ কোথায় আছে, কেমন আছে বিষ্টুপদ জানতো না। অনেকদিন এ পথ মাড়াইনি সে। নিজের মতো দোকানে এসে কাজকর্ম ক'রে গেছে। এখন সে মনগড়া একটা জবাব দেয়।

: কই গেছে গা। অনিমেষভার যুদি লক্ষ্য থাকতো তাহ'লে কি বৌডার এ দশা হয়।

বিন্দুবাসিনী আর আলোচনা বাড়তে দেননি। নমিতাকে বলছিলেন : চল্ বাড়ি চল্।

: সে কি ; ওখানে যাবে না ?

: না আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ থাক্।

নমিতা বাড়ি পৌছে দিয়ে এসেছিল বিন্দুবাসিনীকে। ব্যাপারটায়

বিন্দুবাসিনী যতটা আহত হয়েছিলেন নমিতা ততটা হয়নি। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছিল যেদিন সে ভোররাত্রে খিড়কির দরজায় কামিনীকে কার সঙ্গে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কি যেন কথা বলতে শোনে।" এ তো তার জানা দৃশ্য। এ দৃশ্য তার চর্মচক্ষে এতদিন পড়েনি কারণ সে এ পথে আসে না। মনশ্চক্ষে এ দৃশ্য তার অজানা নয়। মা বোধ হয় মনে মনে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাগারাগি করে জেদের বশে পৃথক হ'তে চেয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এ সংবাদে তাই বেশী কাতর হ'য়ে পড়েছেন।

নমিতা বলেছিল : তুমি তাহ'লে বাড়িতে থাক। আমি একাই যাই ?

বিন্দুবাসিনী বলেন : আজ থাক্ না নমু। যাত্রাটা আজ শুভ নয়।

: তুমিও যে ঠাকুর্দার মতো সুরু করলে! না আমি একাই যাই। অন্তত প্রাথমিক কথাটা পেড়ে আসি। ভুল বোঝাবুঝি যখন হয়েছে তখন যতশীঘ্র সম্ভব সেটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। নাহ'লে পিসীমা অন্যত্র অগ্রসর হ'তে পারেন।

কথাটা ঠিক। বিন্দুবাসিনী রাজি হয়ে যান।

নমিতার অন্য গরজ ছিল আসলে। তার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল জানতে কি ক'রে পিসীমা জানতে পারলেন ভূষণ প্রস্তাব করেছিল নমিতার কাছে।

ভূষণ বাস করে এ ব্লকে ৭২৪ নং প্লটে। কলোনীর আর পাঁচখানা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির এমন কিছু প্রভেদ নেই। টিনের চালা। দরমার বেড়া। ঝাঁপের জানালা-দরজা। বাড়ি তৈরীর লোনের অনেক টাকাই ভূষণ বিনিয়োগ করেছে তার ব্যবসায়ে। তাই পাকা দেওয়াল তোলা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। সে হিসাবে কলোনীর সাধারণ বাড়ির অনুপাতে ভূষণের বাড়িটা কিছু নিকৃষ্টই। তবু এ বাড়িতে ঢুকবার সময় নমিতার মনে হয়—এই সেই গৃহ যেটাতে বধূবেশে আসবার স্বপ্ন দেখেছে সে এতদিন। এটা তার কল্পলোকের শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু না, ও চিন্তা আর নয়। মনকে সে শাসন করে।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করে চারদিক। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি। দেওয়ালে খানকয় ছবি। ক্যালেণ্ডারের প্রাচুর্য। অনেকগুলি গতবৎসরের। এক কোণে

বিছানাটা গোটান রয়েছে। গোটা দুই তোরঙ্গ। একপাশে একটা ভাঙা হারমনিয়াম—হয়তো এককালে ভূষণ বাজাতো কিংবা তার স্ত্রী। ও কোণে একটা ছোট জলচৌকি। দেওয়ালের গায়ে লাগানো। তার উপর লক্ষ্মীর আসন পাতা। পটের ঠাকুর। সিঁদুরের প্রলেপে মুখখানা ঢাকা পড়েছে। পা দুটিও চন্দন মাখানো ফুলে ঢাকা। একটা ছোট পিতলের গেলাসে জল আর একটা রেকাবিতে বাতাসা। কালো ডেঁয়ে পিঁপড়েয় ছেঁকে ধরেছে বাতাসাটাকে। ঘরে লোক নেই।

ঘর পার হ'য়ে ভিতরের বারন্দায় আসতেই দেখা হ'য়ে গেল এক প্রৌঢ়া বিধবার সঙ্গে। প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিলেন তিনি। নমিতা এসে প্রণাম করে: আপনি তো পিসীমা? আমি নমিতা।

: ও, তাই বল। মুখখানা দেখেই চেনা চেনা লাগছে। তোমাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ মিল আছে। এস মা বস।

একটা আসন এগিয়ে দেন তিনি। নমিতা সেটা সরিয়ে দেয়—মাটিতেই বসে পড়ে। বলে: মিঠুকে দেখছি না। গেল কোথায়?

: ও মা, মিঠুকে এই মাত্র এসে নিয়ে গেল যে লতু।

: লতু এসেছিল বুঝি বিকালে?

: হ্যাঁ ওতো মিঠুকে না দেখে একদিনও থাকতে পারে না। রোজ আসে। এত ভালবাসে মিঠুকে। আর মেয়েটাও ওকে পেলে যেন আব কিছু চায় না। কখন লতুমাসী আসবে তাই খালি জিজ্ঞাসা করে।

নমিতা বলে: হ্যাঁ, ছেলেপিলে বরাবরই খুব ভালোবাসে লতু।

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন পিসীমা: তাই দেখলাম। সেই জন্যই সেদিন গিয়েছিলাম আমি তোমার মায়ের কাছে। তুমি তখন বাড়ি ছিলে না। তা দাও না তোমার বোনকে ঐ মা-মরা মেয়েটাকে মানুষ করার ভার।

নমিতার হাতদুটি চেপে ধরেন পিসীমা। নমিতা ব্যস্ত হ'য়ে বলে: সে তো আমাদের সৌভাগ্য পিসীমা। আমরাই কন্যাপক্ষ, কোথায় আমরাই খোশামোদ করব আপনাকে—

: না, তাই বলছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি আপত্তি করেছ, তাই ভাবলাম—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নমিতা বলে: আচ্ছা এই কথাটা রটলো কি ক'রে বলুন তো? মাও তাই বলছিলেন সেদিন। আমি তো আপত্তি করিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম ওদের বয়সের তফাৎটা।

: তা হ'ক। ওরা তুজনেই যখন তুজনকে পছন্দ করেছে……

: তা হ'লে তো কোন কথাই নেই। কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় ছিল লতুকেই। দ্বিতীয়পক্ষের বর যদি ওর মনে না ধরে—

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।—দ্বিতীয় পক্ষ! কি বলছ তুমি? কে দোজবরে?

: কেন, ভূষণবাবু?

হাসেন এবার পিসীমা: কে বললো তোমায়? বাজে কথা।

: বাজে কথা! মিঠুয়া তবে কে?

: আমার নাতনি—

: আর সুবালা?

: আমার ভাই ঝি। মিঠুয়া হ'তে গিয়েই সুবালা মারা যায়। মিঠুয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে। তা করবে না কেন বল? মিঠুয়া আমার হাতেই মানুষ হচ্ছে; কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ আর সামলাতে পারি না। ভূষণকে বলি একটা বিয়ে করে বউ আনতে—তা ছেলে কানেই তোলে না—

নমিতার কানেই যাচ্ছিল না কথাগুলো। সে ভাবছিল কেন তবে মিথ্যা কথা বললো ভূষণ? সত্যকথা বলা কি ওর ধাতে নেই? প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে শুধু প্রতারণা করাই তার পেশা?

পিসীমা তখন এক নাগাড়ে বলেই চলেছেন নিজের কথা।

লতু মেয়েটির যাতায়াত বরাবরই ছিল এ বাড়ি। ভূষণের সঙ্গে প্রথমটা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া হ'ত। লতুর ছেলেমানুষি নিয়ে ভূষণ তাকে ক্ষ্যাপাতো। ডাকতো 'ঠান্‌দি' বলে। লতুও ছেড়ে কথা বলতো না। এসে নালিশ করতো

পিসীমার কাছে : তোমার ঐ ভূষণ্ডীকাক ভাইপোকে বারণ ক'রে দিও পিসীমা—যেন আমার পিছনে না লাগে।

পিসীমা শুধু হাসতেন।

তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন মা-হারা মিঠুয়া ঐ মেয়েটার একান্ত বাধ্য হ'য়ে উঠেছে। লতুও মিঠুকে নিজের বুকের পাঁজরের মতো ভালবাসতে সুরু করেছে। একদিন মিঠুয়াকে না দেখতে পেলে সে অস্থির হয়—মিঠুয়াও কান্নাকাটি সুরু ক'রে দেয়। তখন পিসীমার মনে হ'ল ঐ মেয়েটাকেই যদি ভার দেওয়া যায় মিঠুয়াকে মানুষ করার। সুবালা যখন মারা যায় তখন মিঠুয়া এতটুকু। পিসীমা ভূষণকে বিয়ে করতে বলেছিলেন ; কিন্তু ভূষণ হিসাবী লোক। ব্যবসাটা ভালো ভাবে না চলতে সুরু করলে সে সংসারে ভাগীদার বাড়াতে চায় না। বলে বলে হার মেনেছেন পিসীমা। ইতিমধ্যে তিনি আরও অশক্ত হ'য়ে পড়েছেন। ওপারের ডাক এসে পড়েছে তাঁর। ভূষণকে তিনি সংসারি দেখে যেতে চান। তাছাড়া মিঠুয়ার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা না ক'রে গেলে ওপারে গিয়ে ভাই-বৌয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন কি? এদিকে দুরন্ত মিঠুয়াকে সামলানোও দায় হ'য়ে উঠেছে আজকাল। এমন সময়ে দৈবপ্রেরিত ত্রাণকর্ত্রীর মতো এল লতু। পিসীমা রোজই ভাবেন ভূষণের কাছে কথাটা পাড়বেন, রোজই ইতস্তত করেন।

এত আকাঙ্ক্ষার জিনিসটা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় সেই ভয়েই বলা হয়ে ওঠে না। একদিন লতু বলে : পিসীমা, মিঠুয়াকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়ি?

: ওমা এখন যে ও স্নান-খাওয়া করবে।

: দিদি স্কুলে চলে গেছে। আমিই স্নান করিয়ে খাইয়ে দেবো। তারপর দিদি ফিরে আসবার আগেই আবার দিয়ে যাবো ওকে।

পিসীমা হেসে বলেন : এতই যদি দরদ মিঠুয়ার ওপর—তবে নে না মেয়েটাকে একেবারে। তুইই মানুষ করবি ওকে।

লতু চোখ তুলে তাকায় পিসীমার দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়।

: আসবি আমার ঘরে? নিবি মিঠুয়াকে তুই?

আনত নয়নে লতু বলে : সে হবার নয় পিসীমা।

: হবার নয়? কেন?

লতু চুপ করে থাকে। পিসীমা কিন্তু চুপ ক'রে থাকার পাত্রী নন। লতুকে বসিয়ে জেরার পর জেরা করতে থাকেন তিনি। প্রথমটা গোপন করবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সব কথাই লতুকে স্বীকার করতে হয়। লতু জানায় যে সে নিজের কানে শুনেছে দিদি বলেছে 'লতুর সঙ্গে কোন নিকট এবং মধুর সম্পর্কের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তাতে আমি রাজি নই।' লতু আরও বলেছিল—সে যে এ বাড়ি আসে তা দিদি জানে না। সে লুকিয়ে আসে।

খবরটা শুনে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক পিসীমা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তা হ'লে তো আসল বাধাটাই কেটে গেছে। ভূষণ নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছে। ভূষণ রাজি! ব্যাস্ আর ভাবনা নেই। নমিতা বা তার বাপ মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব তিনি নিজেই নিতে পারবেন। ভূষণ আর লতু দুজনে যদি পরস্পরকে বরণ করতে চায়—তবে কে ঠেকাবে সেই মিলন? সেইদিনই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে।

সমস্ত ঘটনা শুনে গেল নমিতা স্তম্ভিত হৃদয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে : আমার আর কোন আপত্তি ছিল না। আমি ভাবছিলাম লতুর কথাই। ও নেহাৎ ছেলেমানুষ তো। ভূষণবাবুর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা একটু—

: তা হ'ক। আমার মা চোদ্দ বছরের ছোট ছিলেন বাবার চেয়ে। কই অসুখী তো হন নি তাঁরা।

: তা হ'লেই হ'ল। ভূষণবাবু রাজি থাকলে আর আপত্তি কি?

: ভূষণ তো রাজি আছেই। বিয়ের কথাটা পেড়েছিলাম তার কাছেও। দেখলাম সেও রাজি আছে। লজ্জায় মুখ ফুটে স্বীকার করলে না অবশ্য। বল্লে একটু ঘুরিয়ে—বেশ তো একা হাতে তোমার যদি কষ্ট হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে বইকি।

নমিতা সুতরাং রাজি হ'য়ে যায়। ভূষণবাবু যখন পিসীমাকে কষ্ট দিতে

চান না তখন সে কেন বাধা দেয়। পিসীমা আরও বলেন: তুমি শুনলাম বিয়ে করবে না বলেছ। আর করবেই বা কি ক'রে? বুড়ো অন্ধ বাপকে তাহ'লে দেখবে কে? ভাই টাই তো নেই—

নমিতা প্রতিবাদ করে: ভাই নেই কে বল্লে? এক বড় ভাই আছে একটি ছোট ভাইও আছে।

: সে কি, ভূষণকে জিজ্ঞাসা করতে ও যে বল্লে—তোমার আর ভাই নেই ব'লে—তুমি নাকি স্থির করেছ বিয়ে করবে না। বাপের সেবা করেই কাটিয়ে দেবে জীবন?

: উনি ঠিক জানেন না। দাদা আছেন, বৌদি আছেন তাঁর একটি ছেলেও আছে। ওঁরাও সবাই আসবেন বিয়েতে। এখানে আমাদের বাড়িতে নেই বলে আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।

: তা হবে।

: আচ্ছা আজ তা হলে আসি পিসীমা।

: ওমা সে কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাও। এমন শুভ সম্বন্ধ হ'ল আজ।

: না পিসীমা, আজ থাক। আপনি বরং আমার মায়ের সঙ্গেই পাকা কথা বলতে যাবেন। আমি আজ উঠি।

পিসীমা জোর করে বসিয়ে দেন ওকে: সে তো বলবই। কিন্তু সেদিনের কথাতেই বুঝেছি তোমার বাবা মার অমত হ'বে না। আর কারও আপত্তি শুনব নাকি আমি? আমি হলাম গিয়ে বরের ঘরের পিসী। আমার কথার দাম আছে না? তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে। পিসীমা ও ঘর থেকে রেকাবি সাজিয়ে মিষ্টি আনতে যান। নমিতা তখন উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। ওর ইচ্ছা করছিল কোথাও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ ভরে খানিক কেঁদে নিয়ে মনটা হাল্কা ক'রে নেয়। সে সুযোগটা সে কোথাও পাচ্ছে না। আজ দুদিন ধরে কান্নাটা আটকে আছে বুকের মাঝখানে।

লাফাতে লাফাতে ঢোকে লতু মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে। ওর চলার ঢঙই

ঐ রকম। আশপাশে তাকায় না। দিদিকে দেখতে পাই নি। চিৎকার করতে থাকে: ও পিসী পিসী তোমার নাতনিকে নাও। দুষ্টুটা ঘুমিয়ে পড়েছে—

তারপর হঠাৎ ভূত দেখার মত দাঁড়িয়ে পড়ে। নমিতা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিছু বলে না।

মিষ্টির থালাটা নমিতার সামনে নামিয়ে দিয়ে পিসীমা এগিয়ে যান লতুর দিকে। ওর কোল থেকে ঘুমন্ত মিঠুয়াকে নিয়ে নমিতার দিকে ফিরে বলেন: তুমি বাপু অমন করে তাকিও না আমার বৌমার দিকে। বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না।

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলে: বকব কেন পিসীমা? লতু বুঝি বলে আমি শুধু বকাবকিই করি সারাদিন?

: না। তা অবশ্য বলে না। দিদিকে ও খুবই ভক্তি করে। নে লতু পেন্নাম কর তোর দিদিকে। তোর বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে গেল যে আজ তোর দিদি।

লতু বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু দুজনের দিকে একবার তাকায়। তারপর হেঁট হ'য়ে প্রণাম করে দিদিকে।

নমিতা রুক্ষস্বরে বলে: ওকি লতু? ওঁকেও প্রণাম কর।

লতু লজ্জিত চরণে ভুল শুধরে নেয়। পিসীমাকেও প্রণাম করে।

মিষ্টিগুলো নমিতার গলা দিয়ে নামতে চায় না। মনে হয় একটা ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে বঞ্চনা করছে সবাই। শুধু ভূষণকে নয়, শুধু মিঠুয়াকে নয়, লতুকেও এরা কেড়ে নিল তার কাছ থেকে—পর করে দিল। আজ ভূষণের পিসীমা তাকে অনায়াসে বলতে পারলেন: তুমি বাপু অমনি ক'রে তাকিও না আমার বৌমার দিকে!

বিয়ে না হ'তেই লতু আজ এঁদের বৌমা হ'য়ে গেছে। দিদির বকাবকির কথা, অত্যাচারের কথাই বলেছে শুধু এ বাড়িতে এসে!

লতু! যে লতুর বিয়ে দেবে বলে কত কল্পনা ছিল নমিতার। একমাত্র

বোন তার। কত আদরের লতু। নমিতা নিজে বিয়ে করবে না। বাপকে নিয়ে থাকবে সে আজীবন কুমারী। বাপের সেবাতেই কাটিয়ে দেবে জীবন। সংসার-স্বামী-পুত্র কিছু সে চায়নি। সে চেয়েছিল শুধু বাপের যষ্ঠি হ'য়ে জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে। কিন্তু সত্যই কি তাই চেয়েছিল সে অন্তর থেকে? তাহ'লে আজ একটু-ছোঁয়া-পাওয়া ভূষণকে ছেড়ে দিতে এত ব্যথা জাগছে কেন বুকে। যে জিনিসের স্বাদ পাইনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ। মদ যে জীবনে খায়নি তার পক্ষে মাতাল না হওয়াটা কোনও কৃতিত্বের নয়; কিন্তু মাদক রসে ভরা ডুব দিয়ে হঠাৎ একদিন নিজেকে সুরারস থেকে বঞ্চিত করার সঙ্কল্প করা শক্ত। যে নমিতা পুরুষের সান্নিধ্য থেকে চিরকাল দূরে থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে নমিতা আজ কোথায়? সে কি জানত প্রেমাস্পদকে অপরের হাতে তুলে দিতে যাওয়ার দুঃখটা এতখানি? কিন্তু সে যাই হোক, নিজের বিয়ের কথাটা সম্প্রতি ভাবতে সুরু করেছিল বটে তবু লতুর বিয়ের কথা সে ভেবেছে অনেক অনেক দিন আগে থেকে। বোনের বিয়ে দিতে হবে একটি ফুটফুটে লাজুক মুখচোরা ছেলের সঙ্গে। লতুর বর এসে ডাকবে ওকে দিদি বলে। সম্বন্ধ ক'রে এসে লতুর সামনে ধরবে একখানা ফটো। বাইশ চব্বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবকের ফটো। বড় বড় চোখ, উল্টানো চুল, চোখে সোনালী চশমা, গোঁফের দুকোণ সরু ক'রে কাটা। বলবে: ত্থাখরে লতু, পছন্দ হয়?

দুহাতে মুখ ঢেকে লতু বলবে—'ধ্যাৎ'!

নমিতা ছোট বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর ক'রে বলবে: ধ্যাৎ নয় রে। সত্যিই দেবদূতের মত চেহারা। কলেজে পড়ছে। বাপ বেশ বড়লোক। সুখেই থাকবি তুই। আশীর্বাদ করছি আমি—ওকে নিয়ে সুখী হবি নিশ্চয়ই। আজ আমি আর দাদা এই ছেলেটির সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ক'রে এলাম।

সলজ্জ লতু মাথা হেঁট ক'রে প্রণাম করবে দিদিকে। ছোট বোনকে ও বুকে টেনে নেবে। কপালে এঁকে দেবে চুম্বনচিহ্ন। বলবে: বর পেয়ে দিদিকে ভুলে যাবিনে তো রে?

দিদির বুকে মুখ গুঁজে লতু বলবে : কক্ষণও নয়। তুমি দেখে নিও।

এই ছিল নমিতার স্বপ্ন। লতুর বিয়ের পরিকল্পনা। আজকের নয়। অনেক দিনকার। সে সব কিছুই হ'ল না। ভালবেসে 'লভম্যারেজ' করল লতু। বাপ-মা, দাদা-দিদি কেউ জানতে পারল না—সে জয় ক'রে নিল একজনের হৃদয়। সে একজনও এমন একজন যাকে কেন্দ্র ক'রে নমিতার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও গুঞ্জন চলছে আজ কয়েক সপ্তাহ! কী লজ্জা! নমিতা ধরে নিয়েছিল ভূষণের ভালবাসা সে পেয়েছে। বলিষ্ঠ গঠন ঐ লোকটি তার সঙ্গে যে ভাবে মিশেছে তাতে মনেও হয়নি সে এ ভাবে ধরা দিতে পারে একফোঁটা লতুর বাহুবন্ধনে। কী বিচিত্র এই সংসার! কোথা থেকে কি করে ব্যবস্থা হ'য়ে গেল লতুর বিবাহের। চেষ্টা করতে হয়নি নমিতাকে কিছুই। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আজ পিসীমা তাকে দিলেন কিছু উপদেশ—'বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না কিন্তু'। আর দিলেন একথালা মিষ্টান্ন। ওর রাজি হওয়ার জন্য উৎকোচ। পারমিট-পাওয়া বাবুরা যেমন যাওয়ার সময় অফিসারের পিয়নকে দিয়ে যায় দু-চার আনা বকশিস, খুশী হ'য়েই।

চোখ ফেটে জল এল নমিতার। এ জল চোখেই শুকিয়ে মারতে হবে। শুভকার্য! লতুর বিয়ে। কাঁদবে কেন নমিতা?

নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায় বসেছে নতুন কমিটির প্রথম সভা। 'গণকল্যাণ সমিতি' নামই টিকে গেছে। প্রতি ব্লকে নির্বাচন করে প্রতিনিধি স্থির করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে দুজন ক'রে মেম্বার। সবসুদ্ধ দশজনের কমিটি। এতবড় বিরাট কমিটি নিয়ে কাজ করা যায় না। তাই তিনজনের একটা ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়েছে। প্রমোদ পাল গালভারি নাম পছন্দ করে—সে এই কার্যকরী কমিটির নাম দিয়েছে 'স্টিয়ারিং কমিটি'। কানাই, যোগেন, জীবেন, নমিতা, ভূষণ প্রভৃতি সকলেই সভ্য নির্বাচিত হয়েছে। তিনজনের কার্যকরী কমিটিতে আছে আগেকার এ্যাডহক

কমিটিই। অর্থাৎ ভূষণ, নমিতা আর ঠাকুর্দা। আজ নির্বাচনের পর প্রথম সকলে মিলিত হ'য়েছেন বিস্তারিত আলোচনা ক'রে কর্মপন্থা স্থির করবেন ব'লে। পরিবেশটা ঠিক সভাকক্ষের মত নয়। নিতাই ঠাকুর্দার ডাক্তারখানাতেই বাড়তি একখানা বেঞ্চি ঢোকানো হয়েছে। সভ্যরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। নিতাই ঠাকুর্দা যথারীতি একটা বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন।

যোগেন নায়েক সি-ব্লকের নির্বাচিত সভ্য। বল্লে: এবার সভার কাজ সুরু হ'ক ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দা বলেন: সবাই এসেছে? কই নমিতাকে দেখছি না?

ও কোণ থেকে নমিতা সাড়া দেয়: আমিও এসেছি ঠাকুর্দা।

: ব্যস্ তবে তো সুরু করা যেতে পারে।

ঠাকুর্দা সকলকে নির্বাচিত হবার জন্য মামুলী অভিনন্দন জানালেন। তারপর বুঝিয়ে বলতে সুরু করলেন—কী উদ্দেশ্য এই গণ-কল্যাণ-সমিতির। আর কিভাবেই বা তা কার্যে পরিণত করা যাবে। ঠাকুর্দা বলেন: সমস্যাটা কি? আমাদের প্রধান সমস্যা হ'চ্ছে কর্মসংস্থান। আমরা যখন এদেশে প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রিসেপসন সেণ্টারে, ট্রানসিট ক্যাম্পে অথবা পি. এল. ক্যাম্পে। সেখান থেকে আমরা, অর্থাৎ সুস্থ সবল মানুষেরা পুনর্বসতি পেয়ে চলে এলাম এখানে। জমি পেলাম, বাড়ি করার ঋণ পেলাম। ভালো কথা। জমি হ'ল, বাড়ি হ'ল। তারপর?

এসব কাহিনী ওরা জানে। এ ওদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা বিবরণ। দশ-বিশ হাজার লোক এক জায়গায় জমায়েত হ'লেই সেটা শহর হয়ে পড়ে না। হ'য়ে পড়তো যদি অন্তত কিছু লোকের হাতেও থাকতো কোনও উদ্বৃত্ত অর্থ। তা ছিল না। কোন শিল্প, বাণিজ্য, বস্তুত গঠনমূলক কোনও প্রয়াসই হ'ল না। অনশন মৃত্যু সুরু হ'ল। মাঝে মাঝে টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। এই পর্যন্ত। সবাই বললে কাজ দাও, কাজ দাও।

কাজ নাও—এ কথা কেউ বললে না। না কোন স্থানীয় লোক, না এদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা কোনও কোয়পারেটিভ, না স্বয়ং সরকার।

ঠাকুর্দা বুঝিয়ে বলেন: ফলে, কলোনী ছেড়ে পি. এল ক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্ম দরখাস্ত আসতে লাগলো গাদা গাদা। ক্যাসডোল, স্টারভেসান ডোলের আবেদন-সংখ্যা বাড়লো। তাতে একদল লোকের সুবিধাই হ'ল। এই সুবিধাবাদী লোকের দলটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। সে সমস্যা আর নেই। আমাদের নতুন কমিটি কার্যভার নিয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সমস্যা রয়েই গেছে তা সত্বেও। সেই মূল সমস্যার সমাধান করতে নাকি সরকার বিরাট পরিকল্পনা করছেন।

যোগেন বলে: আবার পরিকল্পনা! সেই জরীপের লোক এসে বনবাদাড় ভেঙে চেন-টানাটানি করবে—আর ঘরে ঘরে গিয়ে পরিসংখ্যান না কি যেন সংগ্রহ করে বেড়াবে।

কানাই যোগ দেয়: ঐ পরিকল্পনা কথাটা শুনলেই আমাদের আতঙ্ক হয় ঠাকুর্দা।

ঠিক এইসময়ে দরজার সামনে এসে থামে একখানা জীপ। তার থেকে নামেন দুজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। ওঁরা সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ জানান।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি, হেডমিস্ট্রেস্ সুরেখা দেবী আর একজন অপরিচিত সুগঠিততনু যুবক। খাকি প্যাণ্ট আর বুশ কোট পরা। চোখে সানগ্লাস, পায়ে গামবুট। বাগচি সাহেব বলেন: আমরা অনিমন্ত্রিতই এসেছি। যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আর বসব না। একটা কথা বলেই চলে যাব।

ওরা বলে: বিলক্ষণ! আপনারাই তো এ মন্ত্রের হোতা। আসুন আসুন।

বাগচি সাহেব জমাটি লোক। সকলের সাথেই মিশতে চান নিজে থেকে। অফিসার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য ব্যবধান ছিল সেটা

ভেঙে ফেলতেই বোধকরি ওঁর এ প্রচেষ্টা। সুরেখা দেবীকে অবশ্য ওরা আপনার লোক বলেই ভাবে চিরদিন।

ঠাকুর্দা বলেন: আমরাই অন্যায় করেছি। এ দক্ষরাজার শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছিল। কিন্তু কিছু মনে করবেন না বাগচি সাহেব। দোষ শুধু এক তরফাই নয়। ইতিপূর্বে আমাদের এইসব ঘরোয়া মিটিঙে ডাকলেও আপনারা আসতেন না। আপনি নন—আপনার পূর্ববর্তীরা। কাজেই ভুলটা আমাদের হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

সুরেখা দেবী বলেন: যাক্, সৌজন্য তো হ'ল। এবার কাজের কথা হ'ক।

ঠাকুর্দা বলেন: হ্যাঁ, কাজের কথা। এঁরা বলছিলেন আমাদের উদয় নগর কলোনীর লোকদের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা হ'য়েছে তার স্বরূপটা কি।

বাগচি বলেন: ভালো কথা। তবে আপনাদের এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দেবেন আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক। এঁর নাম বীরেন্দ্র মৈত্র। ইনি এসেছেন ঐ সরকারী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে। সিবিল ইঞ্জিনিয়ার উনি। সরকারী অফিসার, তার উপর শুনেছি উনি লেখকও। সুতরাং বেশ গুছিয়েই বলতে পারবেন উনি নিশ্চয়।

বীরেনবাবু উঠে দাঁড়ান। ফর্সা রঙ। উন্নত নাশা, বলিষ্ঠ গঠন। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথার চুলগুলি উল্টো করে ফেরানো। কথা বলবার সময় হাত নেড়ে ঝোঁক দিয়ে কথা বলেন। একটু বক্তৃতার ঢঙ এসে পড়ে। উনি বুঝিয়ে দেন পরিকল্পনাটা।

উদয় নগরের পূর্বদিকে ডি-ব্লক থেকে সুরু ক'রে ই-ব্লক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠটায় কোনও প্লট নেই। ফাঁকা মাঠ। প্লটে ভাগ হয়নি ওটা। এখানে একটা কারখানা হবে। তাঁত কল, লেদ-মেশিন, কাঠ চেরাইয়ের কল, ট্যানারী সেক্সন, পটারী সেকসন, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—নানান ব্যবস্থা থাকবে এখানে। প্রায় দশবারো রকমের ব্যবসার শিক্ষা দেওয়া হবে। বছর দুই ধরে শিক্ষার্থীরা কাজ শিখবে এটাতে। মাসে মাসে বিশটাকা ক'রে ভাতা পাবে। ওদের তৈরী

জিনিসপত্র বিক্রয় হ'লে লভ্যাংশও পাবে। এর নাম হ'বে উদয়-নগর-ট্রেনিং কাম-প্রডাকসন-সেণ্টার।

কানাই প্রশ্ন করে : কত ছেলে শিখবে এখানে ?

: ধরুন আড়াই শো।

: সে তো প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এখানে বেকার সংখ্যা মাত্র আড়াই শ' নয়।

: মানলাম। আমার বক্তব্য কিন্তু শেষ করিনি আমি।

: আচ্ছা বেশ বলুন।

বীরেনবাবু বলতে থাকেন পরিকল্পনার অন্যান্য দিক। এই শিক্ষা কেন্দ্রের আপাত উদ্দেশ্য হবে আড়াই শ' ছেলের কর্মসংস্থান করা—গভীরতর উদ্দেশ্য হ'ল ওদের এবং ওদের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির চিরকালের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার ওপাশে অনেকটা জমি এ্যাকোয়ার করা হ'চ্ছে। সেখানে একটা কাগজের মিল তৈরী করছেন সরকার। এর অর্ধেকের কিছু মূলধন থাকবে সরকারের—বাকি অর্ধেকের জন্য শেয়ার বিক্রয় করা হবে। এ অঞ্চলে একরকম ঘাস জন্মায় যা থেকে কাগজ তৈরী হ'তে পারে। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কাগজের কারখানা তৈরী হ'তেও বছর দেড়েক লাগবে। সেই সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐ ঘাসের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে অন্তত হাজার দুই মেহনতি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

পরিকল্পনার তৃতীয় দিক হ'ল—এর আভ্যন্তরীন উন্নয়ন। পাকা রাস্তা, নলকূপ, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি।

যোগেন প্রশ্ন করে : এসব সত্যি সত্যি হবে স্যার ?

: নিশ্চয়ই। আমি এসেছি এগুলো আপনাদের দিয়ে করিয়ে নিতে।

ঠাকুর্দা বলেন : আপনি যা বল্লেন সে তো খুবই আশার কথা—কিন্তু কিছু মনে করবেন না আপনি। আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গোরু। দেখেছি তো আপনাদের ব্যাপার! প্ল্যান তৈরী হয় তো এস্টিমেট হয় না, এস্টিমেট হয়

তো স্যাংসন নেই, স্যাংসন হ'ল তো এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুভাল হয় না, সব যখন মিটল তখন দেখা গেল এ বছর এ্যালটমেন্ট পাওয়া যায়নি বলে কাজ হ'ল না! এমনি অনেক সুন্দর শিশু পরিকল্পনাকে আপনাদের অফিসে লালফিতের উদ্‌বন্ধনে ঝুলতে দেখেছি কিনা—

বাগচি হেসে বলেন: নিতাইবাবু, আপনার শিবহীন দক্ষযজ্ঞের উপমাটির অর্থ বুঝিনি তখন। এখন বুঝেছি। অনিমন্ত্রিত শিবানী পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন। আমাকে অন্তত সভাত্যাগ করতে হয়।

নমিতা বলেন: সরকার কি আপনার স্বামী?

: নিশ্চয়ই। সেই অন্নদাতার সেবাদাসীই তো আমি।

সবাই হেসে ওঠে।

কানাই বলে: কিন্তু ঠাকুর্দা যা বল্লেন তা কি সত্য নয়? কেন স্বীকার করবেন না আপনি?

: শিব ছাই মেখে থাকেন, ভাঙ খান, তাঁর গলায় সাপ, স্যাংটো তিনি—এগুলো কি মিথ্যা কথা? কিন্তু তাই বলে শিবানী কি সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন?

বীরেনবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন। বাগচি সাহেব কি রকম কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা দেখে একটা কৌতুক বোধ করছিলেন তিনি।

ঠাকুর্দা বলেন: আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু আপনার ফ্যাকটারি আর প্রডাকসন সেণ্টার হ'তে তো বছর দুই লাগবে। ইতিমধ্যে লোকগুলো করবে কি? খাবে কি?

বীরেন বাবু বলেন: ফ্যাকটারি, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি যা কিছু এখানে করা হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। এখানকার মিস্ত্রি, মজুরেরা সব কাজ করবে আমার তত্ত্বাবধানে। আপনারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হ'য়ে যাবেন। প্রতি গ্রুপে থাকবে দুজন মিস্ত্রি আর আট দশজন মেহনতি মানুষ। আমরা কাজ দেখে নেব।

যোগেন প্রশ্ন করে: মজুর, রাজ, ছুতার এদের রোজ কত ক'রে হবে?

: রোজ কারও থাকবে না। এক একজন গ্রুপ-লীডার যেন একজন ঠিকাদার। মাপ হিসাবে যা পাওনা হবে তাই গ্রুপলীডারের মাধ্যমে পাবে সকলে। সব কাজ ফুরনে হবে। প্রতি আইটেমের রেট থাকবে। সপ্তাহান্তে গ্রুপ যে কাজ করেছে তাকে তার মূল্য দেওয়া হবে। মজুরেরা যত পাবে তার দেড়া পাবে রাজ ও ছুতার। গ্রুপ-লীডার পাবে ডবল। বেশী কাজ করলে বেশী পাবে—কম করলে কম পাবে। গ্রুপ-লীডারদের কিছু আগাম টাকা দেব আমরা প্রথম অবস্থায়—মালমশলাও কিনে দেবো।

পরিকল্পনার নানান দিক আলোচনা হ'তে লাগলো। খুঁটিনাটি সব। কি ভাবে গ্রুপলীডার বেছে নেওয়া হবে। তারা মূলধন পাবে কোথায়। যন্ত্রপাতি, মালমশলা যদি তারা নিজেরা কিনতে চায়? বীরেনবাবু একে একে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যান। সকলেই আলোচনায় যোগ দেয়। একমাত্র ভূষণ রায় ছাড়া। আজ এতবড় জরুরী মিটিঙে সে একবারও কথা বলেনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল নমিতাকে। আশ্চর্য! মেয়েটার কোনও পরিবর্তন হয়নি!

সব আলোচনা শেষ ক'রে, সবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বীরেন মৈত্র বললেন: আশা করি সকলের সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

নমিতা বলে: আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। কলোনীর কর্মহীনা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের পরিকল্পনা কি বলছে?

বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলেন: ও ইয়েস্। ও কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।

হেডমিস্ট্রেস বলেন: সেইটেই তো আমাদের ভয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমাদের দিকটা প্রায়ই ভুলে যান আপনারা। এ অভিযোগ আছে আমাদের—

বাগচি সাহেব পাদপূরণ করেন: চিরন্তনী নারীর পক্ষ থেকে শাশ্বত পুরুষের বিরুদ্ধে!

আবার হেসে ওঠে সবাই।

বীরেনবাবু বলেন: আমিই বলতে ভুলেছি। আমাদের পরিকল্পনাকার ভোলেন নি। মেয়েদের জন্তেও প্রডাকসন সেণ্টারে কয়েকটি বিভাগ থাকবে। সূচীশিল্প, আচার তৈরী করা, পুতুল বানানো প্রভৃতি।

যোগেন বলে: এ পরিকল্পনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি প্র্যাকটিকাল মানুষ, ঠাকুর্দার ভাষায় ঘরপোড়া গোরু। পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত তাই আমি অভিনন্দনটা মুলতুবী রাখছি।

বীরেন মৈত্র বলেন: ধন্যবাদ বা অভিনন্দন নিতে আমি আসিনি এখানে। কাজকে আমিও ভালবাসি কথার চেয়ে। সুতরাং কাজের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই আমি বেশী খুশী হব।

বাগচি বলেন: আমি কিন্তু ধন্যবাদটা মুলতুবী রাখব না। যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আপনারা আজ আলোচনা করলেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। অতীত ত্রুটি বিচ্যুতির রোমন্থন না ক'রে আপনারা যে গোড়া থেকেই গঠনমূলক চিন্তা করছেন এজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন কমিটিকে। সভাপতি অনুমতি করলে এবার আমরা উঠতে পারি।

ঠাকুর্দা সবার শেষে বলেন: আমিও বাগচি সাহেবের সঙ্গে একমত। অভিনন্দনটা মুলতুবী রাখতে চাই না। তবে আমি মৈত্র সাহেবের মত প্র্যাকটিকাল মানুষও—তাই মৌখিক অভিনন্দন না জানিয়ে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আপনারা কিছু মিষ্টিমুখ ক'রে যান।

সবাই হেসে ওঠে আবার।

ব্যবস্থা করাই ছিল। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক চা-খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে।

হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীও লোক পরম্পরায় শুনলেন কথাটা। প্রথমটা বিশ্বাস করেন নি। এতবড় ভুল হবে তাঁর? তিনি যে স্পষ্ট দেখেছেন নমিতার মুখে প্রথম প্রেমে পড়া লাজুক চাহনি। ভূষণের বিষয়ে যে অনেক কথা হয়েছে নমিতার সঙ্গে তাঁর। সেই নমিতা নিজের ছোট বোনের সঙ্গে

ভূষণের বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে ? স্বয়ং গিয়ে ভূষণের মাসি না পিসীর সঙ্গে কথা বলে এসেছে ? খবরটা অবিশ্বাস্য। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এতবড় ভুল হ'তে পারে তাঁর ?

তারপর হঠাৎ টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ফটোর দিকে নজর পড়তেই ম্লান হাসি হাসেন সুরেখা দেবী। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কি অথরিটি ? প্রেমে পড়া লোক দেখলেই চিনতে পারার ক্ষমতা আর যারই থাক সুরেখা দেবীর নেই নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে ভুল তো তাঁর আজকে প্রথম হচ্ছে না। আরও একবার বিরাট ভুল হ'য়ে গেছে তাঁর। সেবারও একজন লোককে দেখে মনে হয়েছিল লোকটা প্রথম-প্রেমের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে বুঝি। নিমজ্জমান লোকটাকে হাত ধরে তুলতে গিয়েছিলেন। কি হ'ল ফলে ? দুদিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ঈশপের গল্পটা মনে পড়ল তাঁর। তাঁকে ভর করে নিমজ্জমান লোকটি উঠে গেল কূপের উপরে। তিনি পড়ে রইলেন অন্ধকূপে। সেই ভুলেরই মাশুল দিয়ে চলেছেন তার পর থেকে।

মিটিঙ ভেঙ্গে গেলে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাসার দিকে পা বাড়ায়। জীপে ক'রে সরকারী অফিসার দুজন চলে যান। নমিতাও অগ্রসর হয় বাড়ির দিকে। মিটিঙে ভূষণ এসেছিল। নমিতা ওর দিকে একবারও তাকায় নি। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে যেন তাকে। সেই ছেলেটিও এসেছিল। রাখাল। কামিনীর সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটিকে সান্ধ্য ভ্রমণে যেতে দেখেছিল। ভূষণের পাশেই বসে ছিল। নমিতা সেদিকে দেখেও নি মুখ তুলে। দ্রুতপদে সে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকালে একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে। গোধূলির আলো মুছে যেতেই এক ঝলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সদ্য ধোওয়া করোগেটেড টিনের ছাদে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। জল জমে আছে এখানে সেখানে। বড়রাস্তা ধরে ফিরছিল সে। বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ল বড় মাঠটা। লরিতে করে মাল আসতে সুরু

করেছে। ইট নামছে লরি থেকে। থাক দিয়ে রাখছে। এখন লোকজনের ছুটি হয়ে গেছে অবশ্য। এখানেই তৈরী হবে কারখানাটা। কলোনিবাসীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে। অন্তত সেই রকম কথাই শোনা গেল আজ। নমিতা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল মাঠ জুড়ে উঠেছে প্রভাকসান্ সেণ্টারের বাড়ি। লম্বা লম্বা শেড। সেখানে কাজ শিখছে আগামী দিনের কারিগরেরা। কত ব্যবসা শিখছে তারা। উদ্বাস্তু পরিশ্রম করছে। করবে না? তাদের মুখ চেয়ে রয়েছে যে কত বাপ মা-স্ত্রী-পুত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে: শুনুন।

নমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ডেকেছিল এগিয়ে আসে সে। ভূষণ।

: আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

নমিতা নির্বিকার ভাবে বলে: বলুন।

: এখানে? অনেক কথা বলার ছিল। কোথাও বসলে হয় না?

চারিদিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল বসবার মতো কোনও স্থান নেই। সদ্য বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় সব জায়গাই ভিজা।

: আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসবেন?

: না, আমি নিরিবিলি বলতে চাই। চলুন না—স্টেশনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি?

: স্টেশন? সে যে অনেকখানি।

: আপনার তাড়া আছে?

: না তাড়া নেই কিছু। আচ্ছা চলুন।

পাশাপাশি দুজন হেঁটে চলেছে। কোনও কথাবার্তা নেই। ভূষণ আজ দিন পনের পর এসেছে। এতদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। পনের দিন অবশ্য সময় বেশী কিছু নয় কিন্তু দুজনেই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

নমিতাই প্রথমে কথা বলে: এবার মনে হচ্ছে কলোনীতে উন্নয়নের কাজ কিছু হবে।

ভূষণ অন্যমনস্কের মতো বলে: হুঁ।

: আপনার কি মনে হয় কলোনীতে সত্যিকারের কাজ কিছু হবে ?

: দেখা যাক্।

: আমার তো ভরসা হয় না। এঁদের ব্যাপার তো জানা আছে। আঠারো মাসে বছর।

ভূষণ জবাব দেয় না। নমিতা ইচ্ছা করেই বেশী কথা বলে। সে যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে ; তার মনে যে ঝড়ের স্পর্শ লাগেনি এটা প্রতিপন্ন করতে চায় সে।

ভূষণ চুপ ক'রে থাকায় আবার বলে : আপনি জবাব দিলেন না যে ?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভূষণ : এখন এইসব কথা ভাবতে পারছেন আপনি ?

: কেন এখন কি হয়েছে ?

: আমার মনে এখন এসব চিন্তা নেই।

: ও।

আবার দুজনে চলতে সুরু করে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জনমানব নেই। ওরা দুজনে গিয়ে বসে একটা খালি বেঞ্চিতে। মাথার উপরে দোচালা থাকায় ভেজেনি সেটা। বেঞ্চির তলায় শুয়ে ছিল একটা কুকুর। উঠে যায় সেটা। ভূষণ একটা বিড়ি ধরায়। দুজনেই চুপচাপ।

সন্ত ধরান বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভূষণ, বলে : দেখুন, যতই কেন না ভাব দেখান যে আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন না—আমি জানি আপনি আমার প্রশ্নের কথা জানেন। তাই প্রশ্নটা আমি করব না। আপনি কি জবাব দেবেন ?

আঁচলের চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি অকারণে খুলতে খুলতে নমিতা বলে : বারে, প্রশ্নটা আপনি বলবেন না—উত্তর দেব আমি ?

: হ্যাঁ দেবেন। কেন আপনি গিয়ে আমার পিসীমাকে ঐ অদ্ভুত প্রস্তাবটা ক'রে এসেছেন ?

: অদ্ভুত? অদ্ভুত কেন? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছেন। ওর মনে অনুরাগ সঞ্চারিত করেছেন, আপনার পিসীমা থেকে সুরু ক'রে পাড়াসুদ্ধ সকলে ধারণা করেছে আপনাদের বিবাহে এ মেলামেশার স্বাভাবিক পরিণতি হবে—আর এখন আপনার কাছে এটা অদ্ভুত লাগছে?

ভূষণ একটু কাছে সরে এসে বলে: দেখুন, আর কেউ একথা বল্লে আমাকে জবাবদিহি করতে হ'ত। কিন্তু আপনার কাছে তো সে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। লতুকে আমি কি চোখে দেখেছি—আর কেউ না জানুক আপনার তো তা অজানা নেই।

: আমি? না, আমি তা জানব কোত্থেকে? আমি তো সর্বজ্ঞ নই। আমি দুপুরে পড়াতে যাই স্কুলে। আপনি তখন লতুকে এসে কি চোখে দেখেন সে তো আমার জানার কথা নয় ভূষণবাবু। তাছাড়া আপনি নিজেই আসেন, না কোন ছোট ছেলেকে দিয়ে জামা কাপড়গুলো পাঠিয়ে দেন তাই কি জানা সম্ভব আমার পক্ষে?

ভূষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে বসে: আপনাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলার দরকার।

নমিতা রুক্ষস্বরে বলে: কিন্তু হয়তো শোনার প্রয়োজন নেই আমার। কি দরকার? কেনই বা আমাকে দোজবরে ব'লে মিথ্যে পরিচয় দিলেন, কেনই বা লতুর সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে তাকে মিথ্যে বলতে শেখালেন—তা শুনে আমার কি লাভ?

দু'জনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর ভূষণ ধীরে ধীরে বলে: আশ্চর্য মানুষের মন। এ নিয়ে আপনি পর্যন্ত যে আমাকে ভুল বুঝবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

: কিন্তু ভুল বোঝার তো কিছু নেই ভূষণবাবু।

: জানিনা আপনি সত্যিই ভুল বুঝেছেন—না ভুল বোঝার অভিনয় ক'রে সরে যেতে চাইছেন। আমার মানসিক অবস্থা আপনি বুঝতে পারেন নি এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

একটু থেমে আবার বলে: আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সেটা আপনার অন্তরের কথা নয়। তাই আমি বার বার আসতাম আপনাদের বাড়িতে। লুকিয়ে দেখতাম আপনাকে। সামনে আসতে সাহস হ'ত না। সঙ্কোচও হ'ত। তারপর ভাবলাম, কেন আপনি হঠাৎ আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তার কারণটা জানতে হবে। তাই লতুর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতাম। জানতে চেষ্টা করতাম আপনি কি করেন, কি বলেন। আমি গোপনে যে আপনাকে অনুসরণ করে চলেছি এটা আপনাকে জানতে দেব না বলেই লতুকে বারণ করতাম আপনাকে জানাতে—আমার আসা যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে লতুর বয়সের তফাত দেখেও অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল ওকে আমি ছোটবোনের মতোই ভালবাসি। আপনি কি ক'রে এতবড় ভুলটা করলেন?

নমিতার জবাব দিতে দেরী হয়, বলে: কিন্তু আমিই তো দুনিয়ার একমাত্র লোক নই। সমাজ আছে, সংসার আছে। তারা যদি ভুল বোঝে—

ভূষণ প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে: আমি স্বীকার করি না। তুমি তো জানতে নমিতা সমাজ সংসার আমার কাছে বড় কথা ছিল না। আমার চোখে তুমিই ছিলে সেদিন সংসারের একমাত্র লোক। আজও আছ।

নমিতা বলে: কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন আপনার জন্যে একটি পাত্রী দেখে দিতে।

: কী প্রসঙ্গে বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম তা তো তোমার মনে থাকার কথা নমিতা। আমি চেয়েছিলাম তোমার দক্ষ হাতে আত্মসমর্পণ করতে। তোমার অন্ধ বাপের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম আমি—বিনিময়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার মা-মরা বোনঝিটাকে মানুষ করার ভার। তুমি তা নিলে না। আমার ভালবাসাকে অবহেলা করলে তুমি; কিন্তু তা নিয়ে ব্যঙ্গও যে করতে পারো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নমিতা চুপ ক'রে থাকে। কী বলতে পারে সে? এখন যে সে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। লতু কী ভাববে? পিসীমা, বাবা! না, এখন আর

সম্ভবপর নয়। যাক্ ভূষণ তাহলে জানতে পারেনি নমিতার মনেও জেগেছিল গভীর অনুরাগ। ভূষণ যতখানি উদ্‌গ্রীব ছিল নমিতাকে পাওয়ার জন্য ততখানি আগ্রহ নিয়েই যে নমিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে এ খবরটা তাহ'লে ভূষণ জানে না। মনে মনে আশ্বস্ত হয় সে। জানলে আরও লজ্জায় পড়তে হ'ত। ছোটবোনের সঙ্গে যার বিয়ে দিতে হবে সে যদি জানতে পারে তার প্রতি গোপন অনুরাগ আছে নমিতার তাহ'লে লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না।

ভূষণ হঠাৎ বলে: আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

: বলুন।

: আমাকে সেই সন্ধ্যায় কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি?

: এটা নেহাৎ ব্যক্তিগত কথা।

: হোক। তবু জানতে চাই আমি।

: কী আশ্চর্য। এ বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে?

: জবাবদিহি! আচ্ছা থাক তবে।

নমিতা বুঝতে পারে ভূষণকে যা হ'ক একটা কিছু বোঝানো দরকার। না হ'লে লতুকে সে পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় লতু ছেলেমানুষ। ভূষণের প্রতি তার অনুরাগ থাকতে পারে না। ওটা তার নেহাৎই ছেলেমানুষি। নভেলি ভালবাসার ব্যর্থ অনুকরণ! জলের দাগ মুছে যাবেই। লতুর সম্মুখে পড়ে আছে যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। কত ভ্রমর আসবে সে বসন্তের যৌবনে। নতুন ক'রে সত্যিকারের ভালবাসতে শিখবে সে। আর নমিতা? যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কেউ তাকে এসে ডাকেনি। অনাহুত, অনাদৃত কেটে গেছে শতাব্দীর চতুর্থাংশ। ভূষণ এসে ওর হাত ধরতে চাইছে। ওর অন্ধ পঙ্গু বাপের দায়িত্ব নিতে চাইছে। এ সময়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই নমিতার। জীবনকে অস্বীকার করা পাপ। আজ যে ভালবাসাকে সে জোর করে অস্বীকার করছে—সে প্রেম মরে যাবে না। শিশু মহীরুহের মত মাথা

চাড়া দিয়ে উঠবেই একদিন। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। হয়তো অনাদর করবে ভূষণ লতুকে! সংসার ছারখার হয়ে যাবে।

: তুমি কি আমাকে তোমার যোগ্য মনে কর না?

নমিতা মন স্থির করে ফেলে। মিথ্যা কথাই বলবে সে। লতুর দিকে ওর মনটা ফিরিয়ে দিতে হবে। লতুর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিজে ক'রে আসার পর আর তার পক্ষে সম্ভব নয় বধূ বেশে ভূষণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া দাদা-বৌদির কাছে কোনদিনই ফিরে যাবেন না হরিপদ পণ্ডিত। অন্তত সেদিন যে দৃশ্য সে দেখেছে তাতে সে আশঙ্কাই দৃঢ় হয়েছে তার। বাপের দায়িত্ব তাকেই তুলে নিতে হবে। ভূষণকে সে ভুলতে পারবে না? কেন পারবে না। দুদিন আগে তো সে চিনত না তাকে। বলে: আমার সঙ্গে অন্য একজনের বিয়ে আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

ভূষণ চমকে ওঠে। বলে: অন্য একজন? কে সে? কবে থেকে?

: আপনি চিনবেন না। ছেলেবেলা থেকে।

: মিথ্যাকথা।

: মিথ্যা কথা?

ভূষণ জোর দিয়ে বলে: নিশ্চয়ই। যেদিন প্রথম তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম হাত—সেদিন তুমি আমার হাত ধরবার জন্যে উদ্গ্রীব ছিলে। তোমার চোখের কম্পনে, তোমার মুখের সলজ্জ রক্তিমাভায় তুমি ধরা পড়ে গিয়েছিলে। অত সহজে এড়ানো যায় না নমিতা। আমি স্থির জানি সেদিন তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্যে উন্মুখ ছিলে। আজ কেন তা নেই তাই শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমি।

নমিতার পক্ষে আর কথোপকথন চালান শক্ত হয়ে পড়ে। তবু ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। একবার ধরা পড়লেই আর ফেরা যাবে না। তাই মনে মনে শক্ত হবার চেষ্টা ক'রে বলে: আপনি ভুল বুঝেছিলেন। কোনদিনই আমি ওভাবে দেখিনি আপনাকে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে: কোনদিন নয়? মুহূর্তের জন্যও নয়? যখন

মিঠুয়াকে আমার মেয়ে ব'লে ভুল ক'রে বুকে চেপে ধরে বলছিল 'আমাকে মা বল'—তখনও নয়! নমিতা, কী নিষ্ঠুর তুমি!

দুহাতে মুখ ঢাকে নমিতা। বলে : ওগো; আর নয়, চুপ কর তুমি।

কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ভূষণ ওকে টেনে নেয় নিজের দিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নমিতার সমস্ত সংযম ভেঙে পড়ে। আর প্রতিবাদ করা নিষ্ফল একথা বোঝে সে।

অনেকক্ষণ পরে ভূষণ বলে : এই যদি তোমার মনের কথা তাহলে লতুর বিয়ের কথা কেন বলতে গেলে তুমি? কেন প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে?

নমিতা বলে : এখন আর ফিরবার পথ নেই। লতু জানে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাবা, পিসীমা সবাই বিয়ের আয়োজন করছেন। তোমার পিসীমা পরশু এসে মায়ের সঙ্গে পাকা কথাও বলে গেছেন। এখন আর অমত কর না তুমি।

ভূষণ বলে : সে অসম্ভব। লতু ছেলেমানুষ—সহজেই সৎপাত্রে তার বিয়ে দিতে পারব আমরা। তুমি তো বুঝতে পার এ বিয়ে হ'লে তুমি আমি কেউই সুখী হতে পারব না। লতুও সুখী হ'তে পারে না—আমাকে পেয়ে।

: কিন্তু এখন আর উপায় কি বল। না না, ছি ছি, সে আমি কিছুতেই পারব না।

: তোমাকে পারতেই হবে। আমি পিসীমাকে বলব—তোমার বাবাকে বলব।

: আর লতু? না গো—সে হয় না! ওই কারা আসছে এদিকে। ওঠ, চল যাই।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। আটটা সতেরোর লোকাল আসছে। টিকিটঘর খোলা হ'ল। একে একে লোক জমছে স্টেশানে। ওরা উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে দুজনে চলে যায় দুদিকে।

কাজে নেমে অবস্থার গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার বীরেন

মৈত্র। বস্তুত এ জাতীয় পরীক্ষা কখনও কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই তাঁর। কলকাতায় চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এবং উপদেষ্টার কাছে যখন কাগজে কলমে এই স্কীমটি দেখেন তখন উল্লসিত হয়েছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল এভাবেই হয়তো গড়ে তোলা যাবে নতুন এক সমাজ। সরকারী কাজের ঠিকাদারী ক'রে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদার স্ফীত হয় বছর বছর। যদি ঠিকাদার নিযুক্ত না ক'রে ডিপার্টমেণ্ট থেকে সরাসরি এইসব উদ্বাস্তু মানুষদের কাজে লাগানো যায়—এবং ঠিকাদারের মোটা মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া যায় তা হ'লে ভালই কাজ করা যাবে এদের দিয়ে। কর্মহীন এই কলোনীর লোকগুলি শিখে নেবে নানান কাজ। ক্রমশঃ দক্ষ হ'য়ে কলোনীর বাইরে গিয়েও কাজ যোগাড় করতে পারবে।

যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ চালু করলেন মৈত্র সাহেব। প্রথম কাজের স্চনা করতে এলেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সকলে জমায়েত হলেন ইস্কুলের মাঠটায়। ঐখান থেকেই রাস্তার কাজ সুরু হবে। সর্বপ্রথমেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার সকলকে ডেকে বললেন

: আজকে আমরা যা এখানে চালু করছি তার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাদের এবং আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, সকলের সততায় এবং আন্তরিকতায় তা অদ্ভুত সাফল্য লাভ করতে পারে—আবার আপনারা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় ক'রে দেখেন তা হ'লে এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই শুকিয়ে যেতে পারে। স্থির হয়েছে—এ কলোনীতে যা কাজ হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। মিস্ত্রি, মজুর, ছুতোর সমস্ত লাগানো হবে কলোনী থেকেই। এ কাজে হয়তো সবাই অভ্যস্থ নন। তাই তাড়াতাড়ি ভালো কাজ আমি মোটেই আশা করছি না—আমি বরং আশা করছি সততার সঙ্গে আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা। যাঁরা ভালো কাজ শিখতে পারবেন তাঁদের এ কলোনীর বাইরে নিয়ে গিয়েও ছোটখাট কাজ দেব আমি। একটা কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন, টেণ্ডার ডেকে বাইরের ঠিকাদার লাগালে এ কাজগুলি আরও সস্তায় করা যেত। আমরা সেটা করছি না শুধু আপনাদের

নানান কাজে শিখিয়ে তুলব ব'লে। এই সুযোগে কাজগুলো শিখে নিন আপনারা। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেরাই ফাঁকে পড়বেন। আপনাদের সন্তানেরাই ভবিষ্যতে বলবে—বাবা কাকারা দুটো পয়সার লোভে সর্বনাশ করে গেছে আমাদের।

পুনর্বাসন বিভাগের আর একজন বড় অফিসর বল্লেন: আমাদের ইচ্ছা আছে এইখানে আপনাদের দিয়ে ইঁট পোড়াব—টালি বানাব। আজও আমাদের এ রাজ্যে ইঁট-প্রস্তুতি-শিল্পে বাইরে থেকে পাতেরা-মিস্ত্রি আনতে হয়। আপনাদের এ সব ব্যবসায় নেমে পড়ায় দেশটা উপকৃত হবে।

ঠাকুর্দা অভ্যাগতদের স্বাগত জানান।

মেয়েরা শাঁখ বাজায়।

চীফ-ইঞ্জিনিয়র এগিয়ে আসেন উদ্বোধন করতে।

যতীশবাবু একটি ছোট রূপার কর্নিক এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। এটি যোগাড় করে রাখা হয়েছিল আজকের জন্যে।

চীফ ওঁর হাতখানা সরিয়ে দেন। তারপর সামনের একজন শ্রমিকের হাত থেকে লোহার কোদালটা টেনে নিয়ে মাটিতে মারেন প্রথম কোপ।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর।

এই সাত দিনেই বীরেন মৈত্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রথম সমস্যাই হ'ল গ্রুপলীডার নির্বাচন। বেছে নিতে হবে সেইসব লোক যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের—যারা পরিচালিত করবে সাধারণ কর্মীদের। যাদের লভ্যাংশ হবে সাধারণ কর্মীদের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রায় দু'শ আবেদনপত্র এল গ্রুপলীডার হবার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রমাদ গুনলেন। বাগচি বলেন: বেশ তো মশাই—আপনি বলুন না ক'জন গ্রুপলীডার চাই আপনার?

বীরেনবাবু বলেন: তার আগে আপনি বলুন কলোনীতে কাজ করতে নামবে কত লোক?

বাগচি বলেন: আপাতত ধরুন হাজার।

নিতাইপদ বলেন : আমার মনে হয় প্রথমে শ'তিনেকের বেশী লোক পাবেন না। উদয়-নগর হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের কলোনী। এরা মেহনতী মানুষ নয়। একে অনভ্যাস তায় চক্ষুলজ্জা। শ'তিনেক লোক পেতে পারেন প্রথমে।

বাগচি বলেন : বেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা যাক তিনশো।

বীরেন বলেন : গ্রুপে পনের জন ক'রে লোক কাজ করলে গোটা কুড়ি গ্রুপ হবে সর্বসমেত।

যতীশবাবু বলেন : দুশ' আবেদনপত্র থেকে মাত্র কুড়িটি লোক বেছে নিলে তো বিরাট দলাদলি মারামারি বেধে যাবে।

বাগচি দৃঢ়ভাবে বলেন: দলাদলি মারামারি যাতে না বাধে তা আমাদের দেখতে হবে। আপনি কুড়ি জনকেই কাজ দিন। নিতাইবাবু দরখাস্ত দেখে বলুন কোন কুড়ি জনকে প্রথম কাজ দেওয়া যায়।

ওঁরা সকলে মিলে বেছে বেছে বার করলেন কুড়িটি আবেদনপত্র। সবচেয়ে যারা দুঃস্থ তারাই পেল অগ্রাধিকার।

এদের নিয়েই কাজ সুরু হ'ল।

কাজে নেমে মৈত্রসাহেব অনুভব করলেন অসুবিধাটা। এসব বাধা বিঘ্নগুলি লক্ষ্য হয় নি এতদিন। নিঃস্ব বেকারের পক্ষেই গ্রুপলীডারশীপ পাওয়ার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিছু মূলধন না থাকলে ঠিকাদারী করা চলে না। দিনের শেষে সাধারণ মেহনতী মানুষ দৈনিক খোরাকি দাবী করে। কয়েকজন গ্রুপলীডার চড়া সুদে টাকা ধার করল ;—জড়িয়ে পড়ল ঋণজালে। কয়েকজন গোপনে বিক্রি ক'রে দিল গ্রুপলীডারশীপ—যেমন করে সিমেণ্ট আর টিনের পারমিট বিক্রি হয়। বেনামিতে চলল সে গ্রুপের কাজ। কেউ বা নিজে থেকেই এসে শরণাপন্ন হ'ল [illegible]। দরকার নেই ঠিকাদারীতে। চাকরি যদি দিতে পারেন কিছু তাই দিন।

বাগচি বলেন : কাজ চালাবার জন্যে গ্রুপলীডারদের কিছু আগাম দেওয়া যায় না ?

বীরেনবাবু হতাশ হ'য়ে মাথা নাড়েন। বিনা জামানতে আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা নেই সরকারি আইনে।

: দৈনিক মাপ ওঠানো যায় কি ?

: সেও এক রকম অসম্ভব।

সারাদিন মৈত্র কাজ দেখেন ঘুরে ঘুরে। শুধু রাস্তার কিছু কাজ বিতরণ করেছেন। অন্যান্য বড় কাজগুলি সুরু হয়নি। একজন ওভারসিয়ারও জয়েন করেছে কাজে। ছোট একটি ঘর ভাড়া ক'রে অফিস খুলেছেন। চেয়ার বেঞ্চি খাতাপত্র কিছুই আসেনি এখনও। ধারে চলেছে কারবার। প্রায় শ' চারেক লোক কাজ সুরু করেছিল। দৈনিক খোরাকির টাকা না পেয়ে কিছু লোক কাজ বন্ধ রেখেছে। এখন শ'দুই লোক খাটছে বিভিন্ন রাস্তায়। কোথাও 'বরোপিট' থেকে মাটি কেটে এনে রাস্তা উঁচু করছে, কোথাও নয় ইঞ্চি গভীর 'বক্সকাটিং' চলছে। কোথাও সোলিং বিছান সুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—যারা কাজ করছে তারা প্রায় সবাই ভদ্রসন্তান। ওপারে ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী, চাকুরে, শিক্ষক অথবা জমিদারী সেরেস্তার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। ঘোষ, বোস, মল্লিক, নন্দী তো আছেই—তাছাড়া রায়, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্যিও আছে।

বাগচি উৎসাহিত হয়ে বলেন : এই সব ভদ্রলোকের ছেলে যে মাটি কাটার কাজে এগিয়ে আসবে তা কিন্তু ভাবাই যায় নি।

মৈত্র বলেন : আপনি এতে খুসী হয়েছেন ?

: নিশ্চয়ই। জানেন কাল রাত্রে কি হয়েছে ?

গল্পটা শোনান বাগচি সাহেব। গতকাল কলোনীর কাজ সেরে সন্ধ্যা সাতটার লোকালে জংসনে ফিরছিলেন উনি। কলোনীতে এখনও ওঁর কোয়াটার্স হয়নি। তাই রোজ যাতায়াত করেন। হঠাৎ বাগচির নজরে

পড়ে রাস্তার মধ্যে লণ্ঠন জ্বেলে জনা পাঁচ-ছয় লোক কি করছে। ইট চুরি করছে না তো? উনি এগিয়ে আসেন। লোকগুলি উঠে দাঁড়াল। জনা কয়েক পুরুষ। তিনটি রমণী। দুটি বধূ একটি অনূঢ়া যুবতী।

একজনকে বাগচি চিনতে পারেন—শোভনাদেবী। স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

: কি করছিলেন এখানে?

ওরা জবাব দেয় না।

যুবতী মেয়েটির দু হাতে দুখানি থান ইট।

: ইট নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?

শোভনাদি হেসে বলেন: চুরি করি নাই। আমরায় ইট সাজাইতাছিলাম।

বস্তুত রাস্তায় সোলিং বিছিয়ে দিচ্ছিলেন ওঁরা। শোভনাদি, তাঁর ছোট বোন, মা আর বাবা। প্রকাশ্য দিবালোকে কাজ করা সম্ভব নয় বলে রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে কাজটা এগিয়ে রাখছিলেন। শোভনাদির বাপ নগেনবাবু একজন গ্রুপলীডার!

বাগচি বলেন: বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এ সঙ্কোচ আর ক'দিন? সকলেই যদি চক্ষুলজ্জার ভয়ে রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে কাজ করে তবে রাত্রেই সবার দেখা সাক্ষাৎ হবে। সকলেরই চক্ষুলজ্জা ভাঙবে।

মৈত্র বলেন: তা না হয় মানলাম। কিন্তু ঐ ভদ্রপরিবারটিকে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত করায় কেন এত আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন আপনি? ওঁদের পক্ষে সত্যিকারের মেহনতি মানুষ হওয়া কি সম্ভব? আর সম্ভব হ'লেও কি সেটা বাঞ্ছনীয়?

বাগচি বলেন: তাও ভালো মশাই তাও ভালো। বিশ্বাস না হয় ওদেরই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন। ভদ্রলোক সেজে কি লাভ হয়েছে ওদের? কতকগুলো বাড়তি চক্ষুলজ্জা ছাড়া কি দিয়েছে ওদের—সমাজ? শ্রমের মর্যাদাটা বিকৃত করার নজির বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে। আপনাদের ভদ্রলোক-

ছোটলোকের বিচার নিয়ে আপনারা থাকুন। এরা গায়ে খেটে দু পয়সা রোজগার করুক।

তারপর উনি বলতে থাকেন ওঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আগে উনি কিছুদিন ছিলেন বকুলতলা পি. এল ক্যাম্পের চার্জে। সেখানকার ইতিহাস ব'লে যান উনি।

: জোয়ান মর্দগুলো মশাই বসে বসে ডোল পেত। নড়ে বসবে না। তার চেয়ে এই ভালো নয়? তাছাড়া ঐ শোভনাদেবী অথবা তাঁর বাবা—ওঁরা আজ এভাবে দু' পয়সা বাড়তি রোজগার করছেন বইতো নয়। আপনার এখানে আজ যারা কাজ করছে তাদের অনেকে দু' পয়সা জমিয়ে আবার ফিরে আসবে মধ্যবিত্ত সমাজে। সুরু করবে অন্য ব্যবসা।

: আর মধ্যবিত্ত সমাজ যদি তাদের অপাংক্তেয় করে?

: তাতে বয়েই গেল। আপনাদের সো-কল্ড ভদ্রলোকের চেয়ে মেহনতী মানুষদের অবস্থা আজ বেশী খারাপ নাকি?

আর একটি সমস্যার দিকে নজর পড়েছিল মৈত্রসাহেবের। সেটাও আলোচনা করেন। ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে গ্রুপলীডার বেছে নেবেন। তারা কাজ শিখে ভবিষ্যতে হবে ঠিকাদার। নিজে হাতে কাজ করা না শিখলেও চলবে—তাদের জানতে হ'ব ঠিকাদারি বিদ্যা। হিসাব রাখা, মালপত্র জোগাড় করা, লোক খাটানোর কাজ। আর নিম্ন শ্রেণীর লোক শিখবে মিস্ত্রির কাজ, মজুরের কাজ প্রভৃতি। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল এ কলোনীতে প্লট হোল্ডার সকলেই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভদ্রলোক। উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত। মৈত্র তাই বাগচির দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। বাগচি বলেন: আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকেই গ্রুপলীডার করব।

: তা তো সম্ভব নয়। যে গ্রুপলীডার হবে তাকে শিখতে হবে ঠিকাদারি বিদ্যা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকেই যদি ঐ বিদ্যা শেখাতে যাই তা হ'লে আসলে কেউই কিছু শিখবে না। তাছাড়া কলোনীর সবকটি লোকই ভবিষ্যতে

ঠিকাদার হ'ক—এও নিশ্চয়ই চাই না আমরা। ওদিকে যারা গাঁথনির কাজ শিখবে, মজুরের কাজ শিখবে—তাদেরও লেগে থাকা চাই নিজ নিজ লাইনে।

: অর্থাৎ আবার সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজ ব্যবস্থা? ক্ষত্রিয় বেদপাঠ করতে পারবে না—মজুর গ্রুপলীডার হ'তে পারবে না? ক্লাসলেস-স্যোসাইটি থেকে যাবে স্বপ্ন কথা?

বীরেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন: ক্লাসলেস স্যোসাইটি বলতে আপনি যদি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষ রাস্তা ঝাঁট দেওয়া থেকে এ্যাসেম্ব্লির স্পীকার হওয়া পর্যন্ত সব কাজ একসঙ্গে করবে—তাহ'লে সেটা স্বপ্ন কথাই থাকবে বটে।

: আমি কিন্তু তা বলিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমি বলছি যে লোক আজ সত্যিই ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফা করছে কাল সে উপযুক্ত হ'লে কেন তাকে বসাবেন না এ্যাসেম্ব্লির স্পীকার ক'রে? আজ যে মজুর কাল সে ঠিকাদার হ'তে পারবে না কেন—বিশেষত সবাই যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক।

বীরেনবাবু উত্তেজিত হ'য়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাগচি আবার বলেন: যাক্ কাজের এই প্রথম অবস্থাতেই অত কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে।

মৈত্র দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়েন: না বাগ্‌চি সাহেব। এখানেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। ভাবতে হ'লে এখনই এসব কথা ভেবে নিন। এরপর আর ভাববার সময় পাবেন না। কাজের তাড়ায় এগিয়ে যাবো আমরা একমুখো। কাজ অনেকটা ক'রে যখন অগ্রগতি বিষয়ে আস্ফালন করতে বসব তখন হয়তো দেখা যাবে অগ্রগতি হ'য়েছে বটে তবে আমাদের মুখটা ছিল লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই। একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা এখানে যে এক্সপেরিমেণ্ট করছি সেটা আগে কোথাও পরখ করা হয়নি। এই লোকগুলোই শুধু নয়—এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্যও নিরূপন করছি আমরা। আমাদের একটা ভুলে হয়তো ভুগতে হবে এদের তিনপুরুষ ধরে।

বাগচি সাহেব বীরেন মৈত্রের পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন : জানি মিস্টার মৈত্র, জানি। কলোনীর এই লোকগুলোকে দিয়ে আমরা পত্তন করছি এক নতুন সমাজ। এখানে সৃষ্টি হ'চ্ছে এক ক্ষুদে পৃথিবী। এরা সবাই এখন নরম কাদার তাল। শিব গড়া অথবা বাঁদর গড়া নির্ভর করছে আমার আপনার উপরেই।

বীরেন মৈত্র জবাব দেন না। দুজনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন অফিসের দিকে। পথের দুধারে কর্মব্যস্ত মানুষ। ইঁট আসছে লরী ক'রে। মাটি কাটছে উদ্বাস্তরা—সোলিং বসাচ্ছে রাস্তায়। খোয়া ফেলছে। রোলার এখনও এসে পৌঁছায়নি। রেল লাইনের ওপাশে ইটখোলায় 'কিলন' কাটা হ'চ্ছে। সেখানেও মাটি কাটছে উদ্বাস্ত শ্রমিক। মাস্টার-রোল-লেবার। নীরবেই পথটা অতিক্রম করেন দুজনে। মৈত্রসাহেব ভাবছিলেন কি ক'রে এইসব পুঁজিহীন নিঃস্বদের দিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা যায়।

মনে আছে ক'লকাতায় ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা হেসেছিল পরিকল্পনা শুনে। সরকারের ঠিকাদারী বিভাগ! যতসব বোগাস! সহপাঠী ঋতব্রত বলেছিল : মায়ের কাছে আর মাসীর গল্প ক'র না ভাই। আমার জানা আছে সব। সদাশয় সরকার বাহাদুরের এইসব পোষ্যপুত্রেরা চেনে শুধু দুটি জিনিস 'লোন' আর 'ডোল'। খেটে খাওয়া! মাপ করুন লাগবো!

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল।

মৈত্র প্রতিবাদ করেন নি। উদ্বাস্তদের মধ্যে ইতিপূর্বে কাজ করেননি তিনি। এখন তাঁর মনে হ'চ্ছে বাঙ্গলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে তিনি যে পরীক্ষা ক'রে চলেছেন আজ, তার সংবাদ জানে না বৃহত্তর পৃথিবী, হয়তো জানবেও না কোনদিন যদি তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ না করে। যদি স্বার্থসন্ধানী উদ্বাস্ত দলনেতা আর উৎকোচ-লোভী সরকারী কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়! কিছু ক্ষমতা অবশ্য দিতেই হবে স্থানীয় কর্মচারীদের। গ্রুপলীডারের সংখ্যা যত বাড়বে—অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা

ততই সাম্যের রূপ নেবে। অথচ বেশী গ্রুপলীডার হ'লে উৎকোচলোভী কর্মচারীর সুযোগ যাবে বেড়ে। রামের মাপ শ্যামের খাতায় উঠল কিনা তখন আর ধরা যাবে না। দ্বিতীয়ত যে কোন সাধারণ [illegible] যেটুকু ক্ষমতা আছে তাঁর তা নেই। একজন সৎ ওভারসিয়ারকে তিনি পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে দিতে পারেন না—অসৎ জেনেও আর একজনের 'পে-বিল' আটক করতে পারেন না। যারা সততার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে নিরলস পরিশ্রমে তাঁর 'কণ্ট্রাক্ট ডিভিসনকে' লাভবান করবে তাদের কোন বোনাস—কোন পুরস্কার দেবার ক্ষমতা তার নেই ;—শুধু তাঁর কেন এমনকি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পর্যন্ত নেই। আবার আইনের ফাঁক দিয়ে হাতে-নাতে ধরা না পড়ে কেউ পুকুরচুরি করলেও কিছু করনীয় নেই—হাত কামড়ানো ছাড়া। তাহলে কি ক'রে ভালো কাজ করা যাবে?

আচ্ছা, এদের সমস্যা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়? পড়বে না কেউ সে বই? বিশ্বাস করবে না পড়ে? চিন্তা করবে না এর সমাধানের? যারা পারে তাঁর সমস্যাকে সরল করতে তারা এগিয়ে আসবে না? কে জানে! নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিপূর্বে একটি কাহিনী রচনা করেছিলেন মনে আছে। আর এও মনে আছে একটি বিখ্যাত প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকায় তাঁর পরিচয় হয়েছিল কল্পনাবিলাসী বলে। সমালোচনায় সমালোচক বলেছিলেন 'অমুক চরিত্রটা অবাস্তব!' হাসি পায়, যখন তাঁর মনে পড়ে চরিত্রটা তাঁর কলমের মুখে জন্মায় নি—সেটা তাঁর চোখে দেখা!

বাগচিও মনে মনে ভাবছিলেন প্রায় একই কথা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। এর আগে তিনি ছিলেন একটা পি. এল. ক্যাম্পের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সেই বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প-বাসীদের সঙ্গে এই কলোনীর লোকগুলোকে মনে মনে তুলনা করছিলেন তিনি। বাঁচবার জন্যে এদের কী অপরিসীম আগ্রহ। অনভ্যস্ত হাতে কাজ করছে—চড়া রৌদ্রে দাঁড়িয়ে। বাঁচবে, ওরা বাঁচবে, নিশ্চয়ই মানুষ হয়ে উঠবে আবার। সমস্ত প্রতি-

বন্ধকতা সত্ত্বেও আবার সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে ওরা। বিরাট পরিবর্তন হ'য়ে যাচ্ছে ওদের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে। এ পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হবেই। অনেক প্রতিকূলতা দেখা দেবে। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারাই আসবে বাধা দিতে। বড় বড় ঠিকাদার এ ব্যবস্থটা পছন্দ করবেনা; পছন্দ করবেনা যারা বড় ঠিকাদারের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে অভ্যস্ত। ক্যাস-ডোলের ব্যবস্থায় যাদের বে-আইনি সুবিধা হ'চ্ছিল তারাও আসবে বাধা দিতে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করতে হবে। সব সরকারী কর্মচারীই কিছু অসৎ নয়—তারা নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে বাগচির আর মৈত্রের।

চোখের সামনে বাগচি ভাঙ্গাগড়ার নতুন ইতিহাস সুরু হ'তে দেখছেন। ওপারে ওদের সমাজ বিভক্ত ছিল জাতের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য জল-অচল জাতের গণ্ডিতে। কর্মগত জাতিভেদও ছিল। ব্যবসায়ী, চাকুরে, ভূসত্ত্বভোগী, ভূমিহীন চাষী অথবা ভাগচাষী। এ পারে এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এক সমতলে। সবাই বেকার—সবাই উদ্‌বাস্তু! কর্মগত ভেদ হারিয়েছে তার সীমারেখা। এখন বরং জেলাগত গোষ্ঠি গড়ে উঠ্‌ছে ওদের মধ্যে। যশোর, পাবনা, মৈমনসিং, কুষ্টিয়ার লোকেরা নিজেদের জেলার লোকের মধ্যে অনুভব করে একটা সূক্ষ্ম আত্মীয়তাবোধ। এক গ্রুপে কাজ করছে যারা তারা এক পাড়ার বা এক ব্লকের লোক নয়—এক-প্রাক্তন-জেলাবাসী। দু পাঁচ বছরে না হ'ক—কালে ওরা সকলেই হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী। চট্টলা নোয়াখালী, ঢাকা, খুলনা, রাজসাহী হারাবে তাদের ভাষাগত বৈসম্য। ভাবেন বাগচি,—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবের দেশে এক দেহে লীন হ'য়ে ওরা রচনা করবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়!

পরিকল্পনার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নিতাই ঠাকুর্দা, ভূষণ, যোগেনদের আর নাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। কুড়িজন গ্রুপলীডার বিশটা রাস্তায় কাজ করছে। নতুন গ্রুপ আর লাগানো হয়নি। সাতদিনের মাথায়

বিল দেওয়া হয়েছে। মাথা পিছু মেহনতী মানুষেরা পেয়েছে দৈনিক আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। লীডাররা পেয়েছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা। এটা একেবারে আশাতীত। গ্রুপলীডাররা বেশী পাচ্ছে। সুতরাং সবাই গ্রুপ-লীডার হ'তে চায়! জীবেন বেনামিতে একজন গ্রুপলীডারের কাজ চালাচ্ছে। গোপনে কিনে নিয়েছে সে গ্রুপলীডারসীপটা। ফলে তার বিড়ি ফ্যাকটরির কাজ বন্ধ হ'তে বসেছে। যারা বিড়ি বানাতো তারা এসে অনুযোগ করল ঠাকুর্দার কাছে। এ জাতীয় অনুযোগ অভিযোগ লেগেই আছে।

এদিকে ফ্যাক্টারী তৈরী, প্রডাকসন সেণ্টার তৈরী আর ইঁট-খোলা করার স্যাংসন এসে গেছে। মৈত্র খবরটা গোপনে জানালেন বাগচি সাহেবকে। এ কাজ তিনটি বড় কাজ—প্রত্যেকটিই লাখটাকার কাছাকাছি। এর জন্যে ভালো গ্রুপলীডার চাই। মানে শুধু সৎ হ'লেই হবে না—একেবারে অন্তভক্ষ্যধনুর্গুন লীডারও চলবে না। কি ভাবে গ্রুপ-লীডার বেছে নেওয়া হ'বে সেটা জানবার জন্যে মৈত্র সাহেব নির্দেশ চেয়েছিলেন উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। চীফ-ইঞ্জিনিয়ার রহস্য ক'রে ছাড়া কথা বলতে জানেন না। বলেছিলেন: তোমরা দুই বারেন্দ্রেই সেটা ঠিক ক'র। আমাকে বাদ দিলেও যথেষ্ট ঘোলা হবে জল।

বাগচি সাহেব নিতাইপদকে মৌখিক বলেছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে। নিতাইপদ সেরকম লোক খুঁজে পাননি। কলোনীতে যে কটি লোকের মূলধন আছে তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় মোটেই। অথচ বেশী টাকার কাজ সাধারণ লোকের মধ্যে কাউকে দেওয়াও যায় না। ক'দিন আপন মনেই ব্যাপারটা ভেবেছেন নিতাইপদ। শেষে এক বুদ্ধি বার হ'য়েছে তাঁর মাথা থেকে। 'মালটি-পারপাস কোয়াপারেটিভ' তৈরী করতে হবে একটা। তার শেয়ার হোল্ডার হবে কলোনীর যত দুঃস্থ বেকার লোক। দশটাকা বা একশ টাকার শেয়ার কিনবে সবাই। সোসাইটির কর্মীপরিষদে রাখতে হ'বে কয়েকজনকে—যাদের গঠনমূলক কাজের

অভিজ্ঞতা আছে। ভূষণ, যতীন, রাখাল প্রভৃতি কয়েকজনকে মনে মনে স্থির করলেন নিতাইপদ।

গোড়া বেঁধে কাজ করার অভ্যাস ঠাকুর্দার। তিনি স্থির করলেন গোটা কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা থাকা উচিৎ তাঁর গণকল্যাণ সমিতির। এটা থেকে তিনি স্থির করবেন কে কে শেয়ার হোল্ডার হবে। সরকার থেকে যদি কোয়াপারেটিভ লোনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তো সোণায় সোহাগা। কর্মীদের লাগিয়ে দিলেন তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনতে। কেন, কি বৃত্তান্ত, সেটা গোপন রাখলেন আপাততঃ। স্বেচ্ছাসেবকগুলিও ওসব প্রশ্ন ক'রে না কখনও। অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে যায় তারা।

ঠাকুর্দা বসে আছেন তাঁর বৈঠকখানার চেয়ারে। অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। এটাই এখন গণকল্যাণের অফিস। অফিসেই মাঝে মাঝে ঠাকুর্দা কারও নাড়ি দেখে ওষুধ দেন। সেটাও গণকল্যাণের কাজ।

: বিহারি তোমার ব্লকের স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টটা হয়ে গেছে ?

: হ্যাঁ ঠাকুর্দা এই নিন।

একগাদা কাগজ সে এগিয়ে দেয় ঠাকুর্দার দিকে। পাতা উল্টে দেখতে দেখতে ঠাকুর্দা বলেন : প্রত্যেক বাড়ি গিয়েছিলে ?

: প্রত্যেক বাড়ি। ক'জন লোক, কত বয়স, কি করে, সব লিখে এনেছি। ছককাটা ঘরে লিখে দিয়েছি—যেমন চেয়েছিলেন।

রিপোর্টটা ঠাকুর্দা এগিয়ে দেন নমিতার দিকে : নাও ধর। কতগুলি ব্লক হ'ল ?

নমিতা বলে : চারটে হ'য়েছে। শুধু ভূষণবাবুর ব্লকের রিপোর্টটা আসেনি এখনও।

: শেষ পর্যন্ত ভূষণই লাস্ট ? নাঃ, ডোবালে দেখছি ছেলেটা। ওতো এমন ছিল না। কি হ'য়েছে বলত আজকাল ওর ? কই ভূষণ কই ?

: ভূষণবাবু আজ আসেন নি।

: দেখ দিকিনি কাণ্ড। ভূষণের রিপোর্টটা এলেই আমি কম্পাইল ক'রে ফেলতে পারতাম।

সুরেন কর বলে : কিন্তু এ মহাভারত রচনা ক'রে কি হ'বে ঠাকুর্দা ?

ঠাকুর্দা হাসেন : সে কথা এখন বলব না।

নমিতা বলে : বা রে—আমরা খেটে মরব অথচ জানতে পারব না ?

তখন নিতাই ঠাকুর্দা আসল কথাটা ভেঙ্গে বলেন। ওঁর ইচ্ছা আছে একটা মাল্‌টিপারপাস্ কোয়াপারেটিভ গড়ে তোলা। বড় বড় তিনটি কাজের স্যাংসন এসেছে ;—প্রডাকসন সেণ্টার, ফ্যাক্‌টারী আর ইটখোলা। এ তিনটি কাজই নেবে এই কোয়াপারেটিভ।

রাখাল বলে : তার সঙ্গে এ স্ট্যাটিসটিক্সের কি সম্বন্ধ ?

: বুঝলি না ? কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের নাড়ি-নক্ষত্র থেকে গেল আমাদের কাছে। কোন পরিবারে ক'জন লোক, কত আয়। কোয়াপারেটিভ হবে শুনলে সবাই চাইবে মেম্বার হ'তে। আমরা তখন বেছে নিতে পারব এই চার্ট দেখে।

নমিতা যোগ দেয় : আচ্ছা ঠাকুর্দা, রিলিফ অফিস থেকেও তো গতবার ইকনমিক্যাল সার্ভে করানো হয়েছিল। সে সব কাগজ কোথায় ? ভূষণবাবুর ব্লকের খবর তো সেখান থেকেও সংগ্রহ করা যায়।

: তা তো যায়, কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কি বাগচি সাহেবের মায়ের অসুখ। দিন দশেক ছুটি নিয়েছেন তিনি। যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি বলছেন সে সব কাগজ কোথায় তা একমাত্র বাগচি সাহেবই বলতে পারেন।

: অসম্ভব। বাগচি সাহেব তো নতুন এসেছেন। পুরানো রেকর্ড কোথায় আছে তিনি ছাড়া অফিসে কেউ জানে না ? রেকর্ড কোথায় থাকে তা রেকর্ড ক্লার্ক জানবে না—জানবে অফিসর ?

ঠাকুর্দা বলেন : যতীশবাবুকে তো চিনিস্। আমাদের দু চোখে দেখতে পারেন না। কী মতলব আঁটছেন তা তিনিই জানেন।

হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ঢোকে যোগেন নায়েক, বলে : ঠাকুর্দা, কী কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ঘরে বসে। বাইরে আসুন। ওদিকে সর্বনাশ হ'তে বসেছে।

: কি, হয়েছে কি ?

উঠে পড়ে সবাই।

: ভূষণদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—আপনাদের ডেকে আনতে। ফ্যাকটারীর মাঠটায় একদল নতুন রিফুজি এসে উঠেছে। যে স্টোর গোডাউনটা নতুন তৈরী হয়েছে—সেটা রিফুজিতে ভরে গেছে। মাঠেও এসে বসেছে অনেকে। মৈত্র সাহেবও এসেছেন। ওরা উঠ্‌বে না বল্‌ছে।

: নতুন রিফুজি ? কই চল্‌তো দেখি।

ফাঁকা মাঠটার কাছে এসেই ওঁরা দেখতে পেলেন ফ্যাকটারির জন্যে যে বিস্তীর্ণ জমিটা নির্দিষ্ট হ'য়েছে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হ'য়েছে। অন্তত দুশ' পরিবার। কঙ্কালসার মানুষ। নরনারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা নারী, সন্তান ক্রোড়ে সদ্য জননী। এরা কারা ? এল কি ক'রে ?

এরা নবীন অতিথি। এ দেশের লোক নয়—ভিন্‌দেশী মানুষ। নবীনতম প্রতিবেশী রাজ্যের প্রবীনতম অধিবাসী। যে দেশে এরা এতদিন ছিল সেটা সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে। ওদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে এই পরাধীন দেশে বাস করে এসেছে ওরা। সম্প্রতি সেখানে ওরা আবিষ্কার ক'রে বসল যে হাটের বাজারে চাল নেই, চাকরির বাজারে স্থান নেই, পথে ঘাটে মর্যাদাটুকু পর্যন্ত নেই। তাই ওরা চলে এসেছে সে দেশ ছেড়ে এদেশে। পড়ে ছিল শেয়ালদ' স্টেশনে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ। পাশপোর্ট, ভিসা মানে না। অন্যায় করে থাকি—জেলে দাও। বে-আইনি কাজ ক'রে থাকি—আইন-মাফিক্ শাস্তি দাও। জেলেও 'খাতি দেয়'।

ওদের জেলে দেওয়া হয় নি। তাই সংখ্যায় বাড়ছিল ওরা শেয়ালদ' স্টেশনে। বাক্স-তোরঙ্গ-পোঁটলা সাজিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের স্রোত থেকে রক্ষা করত নিজেদের। দেশে থাকতে যেমন পদ্মার জলস্রোতের দিকে সজাগ সশঙ্ক দৃষ্টি রাখত—এখানেও তেমনি দশটা-পাঁচটার জনস্রোতের দিকে মেলে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। ওদের ভীড় ঠেলে গেটে পৌঁছাতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের লাগে পনের বিশ মিনিট। ওদের ডিঙিয়ে মাড়িয়ে ছোটে তারা গেটের দিকে। দোষ দেওয়া যায় না তাদেরও। মনটা পড়ে থাকে এ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারের দিকে। পাঁচ মিনিট পরেই সেটা চলে যাবে সেকসানাল বড় সাহেবের ঘরে। সেখানে গিয়ে সই করা মানে যে কি তা যাঁরা জানেন না তাঁদের বোঝান বৃথা চেষ্টা। আর যাঁরা জানেন তাঁদের তা বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। এই জোয়ারের জল আবার ফিরে আসে সাড়ে পাঁচটা ছটায়—ভাঁটার টানে। আবার ওরা মাদুরটাকে উঁচু ক'রে বসে বসে তাকিয়ে দেখে।

এরই মধ্যে উনান জ্বালিয়ে ভাত ফোটায়, স্নান করে, খায়, ভিজে কাপড় নেড়ে নেড়ে শুকিয়ে নেয়। তারপর কি ক'রে সেখানে খবর রটে গেল উদয়-নগর কলোনীতে কাজ করলে খেতে পাওয়া যায়। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ কর, খাদ্য নাও! এর চেয়ে সুখবর আর কি হ'তে পারে। এই তো চায় ওরা। ওঠাও মালপত্র।

: ই টেরেন কই যাবো গো? উদয়নগর ইস্টিশানে ধরব?

একবার যদি কেউ বলে বসে 'হ্যাঁ'। ব্যস্। আর দেখতে হবে না। পিল্ পিল্ ক'রে লোক ওঠে ট্রেণে। টিকিট লাগে না ওদের। বিনা টিকিটে ট্রেণে উঠেছি? হাজতে দেবে? দাও। হাজতেও খেতে পাওয়া যায়। জ্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। দলে দলে লোক নেমে পড়ে উদয়নগর স্টেশনে।

: কই গো কি কাজ করুম কও। খাতি দাও।

ব্যাপার দেখে ঠাকুর্দা বিচলিত হলেন। অন্তত দু'শ পরিবার এসে উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার নরনারী। প্রডাকসন সেন্টারের সাইটে

যেসব বাঁশ টিন এসেছে সেগুলো খাড়া ক'রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলতে চায়। নতুন গুদামঘর যেটা তৈরী হয়েছিল—তার মধ্যে তিল ধারণের স্থান নেই। বীরেন মৈত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। ভূষণও দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

নিতাইপদ মৈত্র সাহেবকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

মৈত্র সাহেব বলেন: এ কী নতুন ফ্যাসাদ বলুন দেখি। ওরা এসে জোর ক'রে উঠেছে এখানে।

নিতাইপদ বলেন—ওরা এল কখন ?

কে একজন বল্লে কাল রাত্রি থেকেই লোক আসছে। আজ সকালের লোকালেই এসেছে অধিকাংশ লোক।

মৈত্র বলেন: কি করা যায় বলুন তো ? বার করে দিতেও পারছি না। সত্যিই ওরা যাবে কোথায় ?

ঠাকুর্দা বলেন: তা তো বটেই।

আর সহ্য হয় না ভূষণের। বলে: ফিরতি ট্রেণে ওদের জোর ক'রে তুলে দেওয়া হ'ক। না হ'লে আপনার যে লরিতে মাল আসছে সেগুলো তো খালিই ফিরছে—তাতে বসিয়ে দেওয়া হ'ক।

নিতাইপদ বলেন: ছি ভূষণ; ওদের আজকে যে অবস্থা হয়েছে একদিন তোমার আমারও ঐ অবস্থা হয়েছিল। সেটা ভুলে যেও না।

: তাই বলে, আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে ?

: বন্ধ হ'য়ে যাবে কেন ? যেসব ডেসার্টার্স প্লট খালি আছে সেগুলিতে ওদের বন্দোবস্ত দিতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন: কিন্তু ঐ দু তিন শ' পরিবারের পিছনে যে দু তিন হাজার পরিবার আসছে না—তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ?

ঠাকুর্দা চুপ করে রইলেন। কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

ভূষণ মৈত্র সাহেবকে লক্ষ্য করেই বলে: প্রথম থেকেই যদি কঠিন না হন স্যার—তা হ'লে কিছুতেই এদের ঠেকাতে পারবেন না। আর প্রথম

দলটিকেই যদি আমরা জোর ক'রে ফেরত পাঠাতে পারি তাহ'লে আর কেউ আসবে না এখানে।

নিতাইপদ ধীর কণ্ঠে বলেন: যারা এসেছে আমাদের এখানে অতিথি হিসাবে—ঘাড়ে ধরে তাদের বার ক'রে দেওয়াটায় আমার মত নেই।

যোগেন উত্তেজিত হয়েছে, বলে: বেশ তবে আপনার কি মত তা বলুন? এরা না হয় থাকল—যারা আসছে তাদের ঠেকাবেন কি ক'রে?

ভূষণ বলে: আর ঘাড়ে হাত দিয়ে তো সত্যিই ওদের তাড়ানো হবে না। আপনি অনুমতি দিন, আমরা ওদের বুঝিয়ে—

: অতি সযত্নে গাড়িতে তুলে দিই। ভূষণ, গণকল্যাণ সমিতি গঠনে তুমি ছিলে আমার ডান হাত। তবু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। যারা এসেছে তারা অতিথি, তারা নারায়ণ!

নিতাইপদ চলতে সুরু করেন।

ভূষণ বিরক্ত হয়ে পিছন থেকে বলে: তবে চলুক আপনার অতিথি সেবা। আমাদের পরিকল্পনা যাক বানচাল হয়ে। মরুক কলোনীর বাসিন্দা। নারায়ণ সেবা তো বন্ধ হ'তে পারে না!

নিতাইপদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। এ আঘাতটা বোধ হয় অপ্রত্যাশিত। তিনি নিজে বোধ হয় জানতেন না—তাঁর আদর্শ এরা মনে প্রাণে নিতে পারেনি। এরা বাধ্য হ'য়েই তাঁকে দলপতি ক'রে রেখেছে। নিজ সেনাপতিকেই এখন বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন। বলেন: ভূষণ! এতটা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর মন যখন তোমার—তখন তোমার উচিত হয়নি গণকল্যাণ সমিতির সভ্য হওয়া।

ভূষণ বলে: কিন্তু এতটা সেন্টিমেন্টাল হয়ে আপনারই কি উচিত হয়েছে সেই সমিতির কর্ণধার হওয়া!

: দলপতি আমি নিজে হইনি। এই সেন্টিমেন্টাল ফুলকে তোমরাই দলপতি নির্বাচিত করেছিলে।

: আমিও সভ্য নিজে হইনি ঠাকুর্দা। এই সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থপরকে কলোনীর পাঁচজনেই নির্বাচিত করেছে।

নমিতা আর স্থির থাকতে পারে না, বলে: কার সঙ্গে তর্ক করছেন ভূষণবাবু।

: তোমাদের নারায়ণভক্ত দলপতির সঙ্গে নমিতা!

ভূষণ ফিরে চল্‌ল।

কে একজন বল্‌লে: ভাঙ্গন ধরল মনে হচ্ছে গণকল্যাণ সমিতিতে।

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র বলেন: আপনি উত্তেজিত হয়েছেন নিতাইপদবাবু। কিন্তু ভূষণ বাবু তো অন্যায় কথা কিছু বলছেন না। ওদের না ফিরিয়ে দিলে দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে সুরু করে দেবে। ফ্যাকটারির জমিটা ওরা এখনই দখল করেছে। কাল কাজ বন্ধ। আবার মরবে সবাই। সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যষ্টির ক্ষতি তো অন্যায় নয়। এই তো মানব সভ্যতার ইতিহাস।

নিতাইপদ ম্লান হাসেন। হাত দুটি জোর ক'রে বলেন: ওইটা পারব না মৈত্র সাহেব। দেশঘর, জমি-জায়গা, স্ত্রী-পুত্র সব খুইয়েছি একে একে—অবশিষ্ট আছে ঐ একটা জিনিসই। সেটি তো ছাড়তে পারব না আপনার অনুরোধে।

মৈত্রসাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। ঠাকুর্দা বলেন: আদর্শ-বাদের কথা বলছিলাম আমি। আজীবন রাজনীতি ক'রে এসেছি! আপনাদের আধুনিক সভ্যতায় যাঁকে অর্ধনগ্ন ফকির বলেছে সেই নারায়ণ ভক্ত গুরুর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলাম একদিন যৌবনে। এত সহজে তো আমার মত বদলাবে না মৈত্র সাহেব।

ইঞ্জিনিয়ার বলেন: কিন্তু আমি বলছিলাম—

বাধা দিয়ে ঠাকুর্দা বলেন: আপনিই এখানে কর্তা। পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু ভাবে চালিয়ে নিতে যা করা উচিত করবেন আপনি।

: আমি যদি এদের সরিয়ে ফেলতে চাই, তাহলে আপনি অথবা আপনার গণকল্যাণ সমিতি কি আপত্তি জানাবেন? বাধা দেবেন?

ঠাকুর্দা বলেন: সমিতি কি করবে তা এখন বলতে পারছি-না। সমিতির একজনের কথা তো স্বকর্ণেই শুনলেন; তবে আমি নিজে নৈতিক আপত্তি জানাব। নমিতা, যোগেন—তোমরাও তোমাদের মতামত জানাতে পার।

নমিতা বলে: আপনাকে যখন দলপতি হিসাবে মেনে নিয়েছি তখন আপনার নির্দেশই মেনে চলব আমি।

যোগেন বলে: আমিও ঐ কথা বলতে পারতাম যদি দেখতাম ঠাকুর্দার কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব আছে। ওদের এখানে রাখতে চান এটুকুই জানিয়েছেন উনি। আর যারা আসছে তাদের সম্বন্ধে উনি কি মত পোষণ করেন তা জানি না। ওঁর যুক্তি অনুসারে পাঁচ-সাত-দশ হাজার লোক যদি এখানে আমাকে চায়—তবে তারাও অতিথি নারায়ণ। দলপতির প্রতি আনুগত্য রাখা যেমন প্রয়োজন—তেমনি যারা আমাদের নির্বাচন ক'রে পাঠিয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।

ঠাকুর্দা বলেন: আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। সর্বপ্রথমেই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ওরা আর না আসে। আমি এখনই কলকাতা যাচ্ছি। এখনই গেলে লোকালটা ধরতে পারব। আমি চললাম। বীরেনবাবু, আমার অবর্তমানে নমিতাই গণকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি।

ঠাকুর্দা সোজা স্টেশনের দিকে রওনা হন।

অনিমেষের বুকের ব্যথাটা অনেকটা ভালো হ'য়ে এসেছে। গায়েও বল পাচ্ছে এক আধটু। জংসন হাসপাতালেই সে আছে। দু' তিন দিন অন্তর অন্তর আসে কামিনী। প্রথম প্রথম স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়ে আসত। আজকাল একাই আসতে পারে। পারলে রোজই আসত; কিন্তু যাতায়াত ট্রেন ভাড়া পড়ে সাড়ে ছয় আনা। এটা তো রোজ খরচ করা চলে না। আজ কামিনী একাই এসেছিল। আঁচলে বেঁধে এনেছে দুটো ফল। ডাক্তারে অনিমেষকে ফল খেতে বলেছে।

হাসপাতালের বারান্দাতেই দেখা হ'ল সেই নার্সটির সঙ্গে। ওকে দেখে বল্লে : কী? আজ যে খুব খুশী খুশী ভাব! কর্তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার সময় হ'য়ে এল নাকি?

কামিনী প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ করত। আজকাল বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে পারে। এইসব সাদা পোষাক পরা মাথায় সাদা ঘোমটার উপর লাল ফিতে বাঁধা মেয়েগুলি যে বাংলাতেই কথা বলতে পারে প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি। বল্লে : আপনারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যাই। আপনারাই যে ছেড়ে দিচ্ছেন না হাসপাতাল থেকে।

এ কথায় হাসির কি আছে? মেয়েটি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। ও পাশের আর একজন নার্সকে ডেকে বলে : ও মতিদি, দেখুন কামিনী কি বলছে। বলছে ওর স্বামীকে ভালোমানুষ পেয়ে আমরা নাকি ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রেখেছি, যার ধন তাকে ফিরে নিয়ে যেতে দিচ্ছি না।

মতিদি নার্সদের মধ্যে একটু আমুদে। এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ান তিনি : আপনি এই কথা বলেছেন! আপনার কর্তাটি কি ভেড়া যে আমরা খুঁটিতে বেঁধে রাখব?

কি কথা থেকে কি কথা! কামিনী ঘাবড়ে যায়। এরকম ব্যাপার বুঝলে সে ও কথা বলতই না। ওসব কিছু ভেবে বলেনি মোটেই। আমতা আমতা ক'রে বলে : মানে আমি বলেছিলাম হাসপাতালের কর্তারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যেতে পারি। মানে, নার্সদের কেন দোষ দিতে যাবো আমি? আপনারা এত সেবা যত্ন করেন আমার স্বামীকে।

মতিদি আবার গর্জে ওঠেন : কী বল্লেন? আমরা আপনার স্বামী-সেবার অন্তরায়? আপনাকে স্বামী-সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে আমরা নিজেরাই তার সেবা যত্ন করছি?

কামিনী একেবারে হতভম্ব!

প্রথম নার্স বলে : তাছাড়া আপনি কথা ফেরাচ্ছেন। প্রথমে আপনি হাসপাতালের কর্তাদের কথা মোটেই বলেন নি। বলেছিলেন 'আপনারা ছেড়ে

দিলেই নিয়ে যাই। সেখানে আপনারা মানে—আমরা। নার্সরা। হাসপাতালের কর্তারা নয়।

কামিনী আমতা আমতা করে।

মন্তিদি ধমক্ দেয়: ঠিক করে বলুন হাসপাতালের কর্তারা না গিন্নিরা? আমরা হলাম হাসপাতালের গিন্নি। আর মেট্রণ ঐ প্যাকাটি হ'চ্ছে হেডগিন্নি মানে মুণ্ডগিন্নি। দেখছেন না খ্যাংরা কাঠির উপর আলুর দমের মত মুণ্ডটাই শুধু আছে ওর।

বলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে দুজন!

তাহ'লে সবটাই রসিকতা! কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে: আপনারা এমন ভয় লাগিয়ে দেন।

: আবার ভয় কি ভাই? ভয়ের রাজ্য তো পার হ'য়ে এসেছো। আর কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে অনিমেষবাবুকে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দিন আমাদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু।

: নিশ্চয়ই। কী খাবেন বলুন? রসগোল্লা না সন্দেশ?—কামিনী খুশীতে উচ্ছল।

: না, এমন কিছু যা রেখে খাওয়া যায়। আচার, কাশুন্দি, আমসত্ব কিম্বা বড়ি। কিন্তু আপনার নিজের হাতের তৈরী হওয়া চাই। আমাদের মেসের ঠাকুরটার রান্না একেবারে অখাদ্য। খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ তো দোকানে গেলেই পাওয়া যায়।

কামিনী অবাক হয়ে যায়। এই সুসজ্জিত মেয়েগুলির পাটভাঙা পোষাকের তলায় আছে নাকি ঘরোয়া বাঙালী মেয়ে? আচারের নামে যার জিবে জল আসে, কাশুন্দি দিয়ে শাক মেখে খেতে যে ভালোবাসে, বড়িভাজা যার প্রিয় খাদ্য?

সিঁড়ি দিয়ে গট্‌গট্ ক'রে উঠে আসেন একজন ডাক্তার। কামিনী স'রে দাঁড়ায়। ডাক্তার ডাকেন: নার্স!

: স্যার?

: জমাদারকে মর্গ খুলতে বল। জেডবডি এসেছে।

: ইয়েস স্যার।

নার্স দু'জন তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের নিজের কাজে। কামিনীও অনিমেষের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। অনিমেষ আজ উঠে বসেছে। পিঠের দিকে একটা বালিশ দেওয়া। বলে : অত কি গল্প করছিলে ওদের সঙ্গে? দেখলাম জানালা দিয়ে।

: জিজ্ঞাসা করছিলাম কবে ছেড়ে দেবে। ওমা জানো কি অসভ্য? আমার কথার উল্টো মানে ক'রে আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে তোমাকে নাকি ওরাই আটকে রেখেছে।

অর্থগ্রহণ হয় না অনিমেষের। বলে : তার মানে?

: মানে মশ্‌করা আর কি!

: তা ভালো। গোরাকে আনলে না যে আজ?

: গোরা তার রাখালদার সাথে ফুটবল খেলা দেখতে গেল।

ঘরোয়া গল্প সুরু হয়ে যায়। কামিনী বলতে থাকে কলোনীর কথা। নিতাই ঠাকুর্দার দলের লোকেরা কেমন যত্ন করছে তাকে। এবার থেকে সত্যিকারের দুঃস্থ লোকেরাই শুধু সাহায্য পাবে। কোনও পক্ষপাতিত্ব চলবে না। চালাক দেখি কে পারে? ঠাকুর্দার কাছে চালাকি চলবে না। ও দিকে কি যেন একটা বিরাট কারখানা হবে। তার যন্ত্রপাতি সব আসতে সুরু করেছে। বিরাট পাচিল গাঁথা সুরু হয়ে গেছে। রাস্তা ঘাটের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ইট আসছে ট্রাক বোঝাই। নতুন টিউব-ওয়েলও বসবে অনেকগুলি। অনিমেষ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে।

আবার অনিমেষ বলে এ দিকের গল্প। কালরাত্রে নিমুনিয়া রোগীটি মারা গেছে। ও ধারের বিষ খাওয়া লোকটা কাল খালাস পেয়েছে। তার বিছানায়? এসেছে নতুন একজন। ওর পেটে নাকি পাথর আছে।

কামিনী বলে : পাথর? খেয়ে ফেলেছে বুঝি ভুল ক'রে?

: না গো। ভাত ভালই খেয়েছে—পেটে গিয়ে শুধু পাথর হয়েছে।

: ও মা সে কি, তাই আবার হয় না কি ?

: তাই তো বল্লে নার্সরা। শুধু ভাত ডাল খায় আর পেটে পাথর জমে। অনেক রোগী আসে নাকি এ রোগের।

কামিনী ভাবে—কই অন্ত সকলেও তো ভাত-ডাল খায়—পেটে পাথর তো জমে না। তারপর নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দেয়—তবে আর ভবিতব্য বলেছে কেন ?

অনিমেষ অনেক কথা বলতে থাকে। এবার কলোনীতে ফিরে গিয়ে আর সে রিক্সা চালাবে না। এবার সে একটা ঠিকাদারি কাজ জোগাড় করবে। বাড়ি ঘর তৈরী করা শিখবে। রাস্তা বানাবে, নলকূপ বসাবে। নিজে হাতে অবশ্য করবে না। মিস্ত্রি মজুরদের খাটাবে।

কামিনী অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে। সে শুনছিল বারান্দায় দুটি ওয়ার্ড এ্যাটেণ্ডাণ্টের কথোপকথন।

: কেটে গেছে ? একেবারে দু আধখানা ?

: না তো বলছি কি ? পেট বরাবর চলে গেছে চাকা।

: আহা ষাট ষাট,—কার বাছা গো। মা-বাপ বোধহয় জানেও না এতক্ষণ। কত বড় হবে গো ?

: দুধের বাছা। না তো বলছি কি !

কামিনীর মাতৃহৃদয় দুলে ওঠে। অনিমেষকে বলে : ব'স শুনে আসি। বাইরে এসে জানতে পায়—মর্গে যে মড়াটা এসেছে তার সম্বন্ধেই কথা বল্ছে ওরা। কামিনী প্রশ্ন করে : কতটুকু ছেলে গো ? কাটা পড়ল কি ক'রে ?

: দুধের বাছা গো, দুধের বাছা। ট্রেণে কাটা পড়েছে। একেবারে দু-আধখানা।

কামিনী বলে : তবু কত বয়স হবে ?

: বছর দশ বারো। উদাম গা। তলার আধখানায় একটা খাকি হাফ প্যাণ্ট রক্তে ভেসে গেছে। ট্রেণে নাকি চানাচুর ফিরি করত। কলোনীর ছেলে।

ট্রেণে চানাচুর ফিরি করত? কলোনীর ছেলে!

মাথার মধ্যে দুলে ওঠে কামিনীর। হাসপাতালটা দুল্‌তে থাকে। পড়ে যায় সে।

: ও মা, এ আবার কি হল গো!

: ভির্মি গেছে—দেখছ না?

একটু পরেই জ্ঞান হয় কামিনীর। মতিদি বলে : হঠাৎ কি হল বলুন তো?

কামিনী ধীরে ধীরে বলে : যে ছেলেটি কাটা গেছে তার নাম কি?

মতিদি বলে : নাম তো পাওয়া যায়নি। এখনও বেওয়ারিস্। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। কেন বলুন তো?

ডুগরে কেঁদে ওঠে কামিনী।

লোক জমে যায়।

নার্স ধমক দেয় : কী ছেলেমানুষী করছেন! আপনার ছেলেকে আমি চিনি। সে তো চার পাঁচ বছরের। এ অন্তত বারো চোদ্দ বছরের ছেলে। ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত। হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে যায়। আপনার কেউ নয়।

কামিনী কাঁদতেই থাকে : আমারই! ও আর কেউ নয়। ও বাবলু! আমার দেওর।

নার্স ওকে জোর ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। মুখে চোখে জল দেয়। নিজের টুলের উপর বসিয়ে পাখাটা পুরা দমে খুলে দেয়।

: আপনি এ কী সুরু করলেন বলুন তো। কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই কান্না। কে বল্লে আপনার দেওর?

: সেও যে চানাচুর বিক্রি করে ট্রেণে। বছর এগারো বয়স।

একটু থমকে যায় মতিদি। বলে: ডেডবডি দেখবেন?

কামিনী প্রবলভাবে মাথা নাড়ে : না না, কাটা ছেলে আমি দেখতে পারব না। আমার বাবলুরে! মতিদি এবার ভাবিত হ'য়ে পড়ে। হ'তেও পারে ওর সন্দেহটা ঠিক। বলে : এখানে চুপ করে বসে থাকুন, আসছি।

মতিদি উঠে যায় ডাক্তারকে খবর দিতে। ব্যাপারটা এখন কর্তৃপক্ষকে

জানান উচিত। নিজের দায়িত্বে আর রাখা ঠিক না। ডাক্তার সমস্ত শুনে নার্সকে সঙ্গে করে আসেন এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। পাখাটা পুরো দমে ঘুরছে। কামিনী উঠে চলে গেছে। অনিমেষের কাছে যায়নি। হাসপাতালের আশেপাশেও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। ডাক্তার নার্সকেই ধমক দিলেন: ওকে এ রকম একলা রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি আপনার। অতবড় শক্ পেয়েছেন—কোথায় গেল মেয়েটি কে জানে! আবার না নতুন কোনও ফ্যাসাদ বাধে।

মতিদিও নিজের ভুল বোঝে! একলা রেখে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত হয়নি।

এ দু-তিনদিন ভূষণ কোনও কাজে মন দিতে পারছিল না। কলকাতার দোকান থেকে খবর এসেছে—সেখানেও যাওয়া দরকার। ধারে কারবার করতে হয় ভূষণকে। তার তাগাদা পত্র আছে। এদিকে কলোনীতে জনপ্রবাহ আসতে স্বরু হওয়ায় পরিকল্পনার কাজও ব্যাহত হয়েছে। ঠাকুর্দা কলকাতায় গেছেন—ফেরেন নি এখনও। বাগচি সাহেবও অনুপস্থিত। এখানেও ভূষণের অনেক কিছু করণীয় ছিল। ঠাকুর্দার অনুপস্থিতিতে বস্তুত সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছে এতদিন গণকল্যাণ সমিতিকে। এবার কিন্তু সে নিজে থেকে যেতে পারল না। ঠাকুর্দা নাকি যাওয়ার সময় নমিতাকেই তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত ক'রে গেছেন। নমিতা তাকে ডেকে পাঠায় নি। যোগেন নায়েক এসে খবরটা জানিয়ে গেছে। নমিতা ভূষণের [illegible] করেনি। কেন করবে? ঠাকুর্দার পরিত্যক্ত আসনে উন্নীত হয়ে নমিতা নিশ্চয়ই এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। শুধু দারা-সুজা-ঔরঙ্গজেব আর মুরাদই নয় তাহ'লে স্বয়ং জাহানারাও সিংহাসনের একজন দাবিদার? যোগেন বলে একদল স্তাবক জুটেছে নাকি নমিতার। মক্ষিরাণী হয়েছেন তিনি!

একবার মনে হয়েছিল ফুৎকারে নমিতাকে সরিয়ে দেয়। এ কী ছেলে-মানুষী! এতবড় একটা কলোনীর এত হাজার লোকের ভাগ্য কি খেলার

জিনিস? ঠাকুর্দা নিজেই রাজনীতির কিছু বোঝেন না—তিনি আবার দিয়ে গেলেন শাসনদণ্ড এমন একটি মেয়ের হাতে মাসখানেক আগে যে ছিল ভাঁড়ারঘরের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দিনী নারী। তাও আবার এমন একটি সময়ে দিয়ে গেলেন যখন সমূহ সঙ্কট চলছে কলোনীর ভাগ্যাকাশে। ভূষণ জানতো নমিতা চব্বিশ ঘণ্টাও এ দায়িত্ব বইতে পারবে না—তাকে ডেকে পাঠাবে। এ বিপদে ভূষণ ছাড়া আর কাকে ডাকতে পারে সে?

নমিতা কিন্তু তাকে ডাকতে পাঠালো না।

নিজের ঘরেই উস্‌খুস্ করে ভূষণ। এদিকে পিসীমাকেও নতুর ব্যাপারটা জানানো হয়নি। তিনি যথারীতি বিবাহের আয়োজন ক'রে চলেছেন।

পিসীমা এসে বলেন: তুই যে সকাল থেকে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লি না? ব্যাপার কি?

ভূষণ মনগড়া একটা জবাব দেয়: শরীরটা ভালো নেই।

পিসীমা এসে ওর ললাট স্পর্শ করেন। না, বেশ ঠাণ্ডা। বোধহয় ছেলে লজ্জা পেয়েছে। বয়স হয়েছে তো। বন্ধুবান্ধবেরাও হয়তো পিছনে লাগছে। তাই বাড়ি থেকে বার হয়নি আজ। পিসীর কিন্তু আজ একটু গরজ ছিল, তাই বল্লেন: শরীর বাপু তোমার ভালোই আছে। আজ একবার বাজারে যেতে হবে। একটু ভালো মাছ আর মিষ্টি আনতে হবে!

: কেন আজ কি?

: না কিছু নয়, আজ নতুকে আর নমুকে দুপুরে এখানে খেতে বলেছি।

ভূষণ খুশী হয়। এ ভালোই হয়েছে। এই সূত্রে নমিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। নমিতা ঠাকুর্দাপন্থী—ভূষণ উগ্রপন্থী। সে যাই হোক এ বিপদের দিনে সে স'রে থাকতে চায় না। নমিতার সমস্ত দায় সে নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে চায়,—নিজে যেচে গিয়ে সেটা বলা ভালো দেখায় না। কিন্তু আজ বাদে কাল যাকে ঘরের বধূ ক'রে আনবে এই বিপদের দিনে তার পাশটিতে না দাঁড়ানোও অন্যায়। এই সুযোগে পিসীমাকেও বলে দেওয়া দরকার যে বিয়ে করতে সে পশ্চাৎপদ হবে না, শুধু—

ভূষণ ইতস্তত করে। কি ভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারে না! পিসীমা সেটা লক্ষ্য ক'রে বলেন : আমায় কিছু বলবি ভূষণ?

: হ্যাঁ পিসীমা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন!

: বলিস্ কি রে? তুই তো এমন অস্থিরমতি ছিলি না।

: তুমি আমাকে না জানিয়ে ওঁদের কথা দিলে কেন?

: তোকে না জানিয়ে? মানে? তুইই তো নিজে থেকে প্রস্তাব করেছিলি নমিতার কাছে।

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে বলে : কে বল্লে?

: কে আবার বলবে? নমিতা বলেছে। লতুও শুনেছে।

: কিন্তু—

: ত্মাখ ভূষণ! আমাকে আর পাগল ক'রে তুলিস না। এতদূর এগিয়ে আসার পর তুই যদি এখন বেঁকে দাঁড়াস—তাহ'লে সত্যি বলছি গলায় দড়ি দেব আমি—তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস তুই—

হন্‌হন্ করে পিসীমা বেরিয়ে যান।

ভূষণ শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। নমিতা নাকি আজ আসবে এ বাড়ি। ওর অবর্তমানেও নাকি একদিন এসেছিল। আজই সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত মিমাংসা ক'রে ফেলতে হবে। কিন্তু লতুটা যে উপস্থিত থাকবে। ওর সামনে কি ক'রে ব্যাপারটা মেটানো যায় এটা বুঝে উঠতে পারে না।

মিঠু এসে বলে : লতু মামিমা আজ আমাদের বাড়িতে আসবে না মামা? ভূষণ বিরক্ত হ'য়ে বলে : লতু মামিমা কি? লতুকে তুমি দিদি বলবে।

: না দিদা বলেছে—ও মামিমা হয়।

: না লতুদি।

: বা রে। আমি লতুমামিকে লতুদি বলব কেন? ওতো আমার মামি হয়।

ভূষণ হঠাৎ ঠাস্ ক'রে এক চড় মেরে বসে।

আদরের মিঠুয়া মামার হাতে কখনও মার খায় না। কেঁদে ওঠে সে। ভূষণ স্থির করে আর অগ্রসর হ'তে দেওয়া নয়। এখনই রান্নাঘরে গিয়ে পিসীমাকে বলে আসা দরকার যে সে লতুকে বিয়ে করতে পারবে না। কিছুতেই নয়। রাজি হ'লে সে নমিতাকেই গ্রহণ করবে। না হ'লে যেমন চলছিল সংসার তেমনিই চলুক।

রান্নাঘরের সামনে এসে দেখে পিসীমা নেই। টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেছেন। লতু বসে তরকারি কুটছে। কাজের বাড়ি,—পিসী একা মানুষ—তাই বোধহয় এই সাত সকালেই নমিতা পাঠিয়ে দিয়েছে বোনকে। একখানা খয়েরি রঙের লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে লতু। সদ্য স্নান করেছে। চুলের নিচে একটা গিঁঠ বেঁধে পিঠের উপর ফেলে রেখেছে ভিজা চুল। একটু প্রসাধন করেছে—বেশ বোঝা যায়। কপালে একটা খয়েরের টিপ। সরু করে কাজলপরা চোখ দুটি তুলে ভূষণের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু ক'রে একাগ্রমনে তরকারি কুটতে লাগল।

ভূষণ বলে: পিসীমা কই?

: জল আনতে গেছেন।

: ও।

ভূষণ বাজারের থলিটা তুলে নেয়। একবার ভাবে কথাটা লতুকে বললেই বা কেমন হয়? দুদিন আগে হ'লে ভূষণ হয়তো এ অবস্থায় বলত—'নেমন্তন্নের গন্ধে বুড়ি ঠানদি এই সাত সকালেই এসে জুটেছ? কি নোলা বাপু!' লতুও তৎক্ষণাৎ হয়তো জবাব দিত 'ভাত না ছড়াতেই আজ ভূষণ্ডী-কাক রান্নাঘরের কাছে এই সাত সকালেই ঘুরঘুর করছে কেন? হ্যাংলা একেই বলে।'

আজ এ জাতীয় কথোপকথন যেন নিতান্তই অসম্ভব।

মিঠুয়া কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লতুকে জড়িয়ে ধরে বলে : মামিমা—মামা মেরেছে।

লতু বঁটিটা কাত ক'রে রেখে মিঠুয়াকে কোলে তুলে নেয়।

ভূষণ এক পা এগিয়ে আসে। বলে : তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

লতুর মুখে কে যেন একমুঠি আবীর ছুঁড়ে মারে। লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠা ঐ পনের বছরের মেয়েটি কি বুঝলে তা সেই জানে। নীচু স্বরে বললে : পাগলামো ক'র না। পিসীমা এখনই ফিরে আসবেন। মিঠুও জেগে রয়েছে!

বলেই দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে।

ভূষণ অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় বাজারের দিকে।

ভূষণের উপস্থিতিতে আজ নমিতা প্রথম আসবে ওদের বাড়ি। ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে ভালো ভালো জিনিস কেনে ভূষণ। পিসীমার যেমন কাণ্ড। কাল বললে জংসনের বাজার থেকে ভাল জিনিস নিয়ে আসতে পারত। নমিতার সঙ্গে ব্যবহারে ভূষণ তাকে বুঝিয়ে দেবে যে গণকল্যাণ সমিতির দলাদলির জন্যে তার মনে কোনও রেখাপাত করেনি। হতে পারে সেখানে নমিতা আর ভূষণ ভিন্ন মতাবলম্বী। ভূষণ, যোগেন এরা হ'ল নব্যপন্থী। কত ধানে কত চাল তারা বোঝে। ঠাকুর্দা গত শতাব্দীর রাজনীতি আঁকড়ে পড়ে আছেন। গত শতাব্দীই বা কেন ও তো হ'চ্ছে শ্রীচৈতন্যের থিয়োরি। মেরেছ কলসি কানা! নমিতা ভাগ্যচক্রে ঠাকুর্দার অবর্তমানে উঠে বসেছে তাঁর শূন্য গদিতে। ভূষণ কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেবে যে রাজনীতি আর জীবন-নীতি দুটো পৃথক জিনিস। গণকল্যাণ সমিতির কার্যকরী মিটিংএ সে নমিতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে ;—কিন্তু সমিতির বাইরে এই বিস্তৃত জীবনের ক্ষেত্রে সেজন্য কোনও ক্ষোভ নেই ভূষণের। সেখানে সে চায় নমিতার হাত ধরে চলতে। নমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। একথাটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি আর ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা মারাত্মক ভুল। সরলতা যদি ধর্মের

ভিত্তি হয় তবে শঠতা হবে রাজনীতির মেরুদণ্ড। চাণক্য থেকে চার্চিল সব বিখ্যাত রাজনীতিবিদই একথা প্রমাণ ক'রে গেছেন। গান্ধিজী? তিনি ঐ বুদ্ধ চৈতন্যের দলে—রাজনীতিক তিনি ছিলেন না।

বাজারে বেশ উত্তেজনা। ফ্যাক্টারির ময়দানে না কি গণ্ডগোল হয়েছে। পুলিশ ভ্যান এসেছে। শুনে ভূষণ একটু বিচলিত হয়। পুলিশ এসেছে? কেন?

বি. ব্লকের হারাণ দেবনাথের ভাইপো নয়ান দেবনাথ বলে: ভ্যানে কর‍্যা ঐ রিফুজিদিকে লয়্যা যাবে গা।

হেমেন নন্দীমজুমদার বলে: ও! ছাইলার হাতের মোয়া নয় হে! পুলিশ কইলেই উয়ারা উঠব গাড়িৎ?

: এমনিতে না উঠে ঠেলার নামে উঠ্‌ব।

ভূষণ রীতিমত বিচলিত হয়। নমিতা হয়তো ওখানেই আছে। বাগচি নাই, ঠাকুর্দা নাই, ভূষণ, যোগেন সবাই স'রে দাঁড়িয়েছে। একলা মেয়েটি কি করতে পারে এখন? এ সময়ে স'রে দাঁড়ানো অন্যায়। হ'তে পারে তার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই—তবু এ সময়ে যদি ওর পাশে গিয়ে না দাঁড়ায় তবে সে কেমন সহযাত্রী। শুধু উৎসবের দিনে বন্ধুর আয়োজন নয়। দুঃখ রাত্রেই তার প্রয়োজন বেশী। আর আদর্শের ছুতো ক'রে বিপদ থেকে স'রে দাঁড়ানো কাপুরুষতা। নমিতা ভাবতে পারে বিপদ দেখে ছুতা ক'রে ওরা সরে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ঠাকুর্দার ঐ নারায়ণ-সেবা-মার্কা ভাবালুতায় নমিতাকে ভেসে যেতেই বা দেবে কেন ভূষণ? এটা গণতন্ত্রের দেশ। নিজের বিশ্বাস অপরকে বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে আনার অধিকার এখানে প্রত্যেকেরই আছে। নমিতা, যে তার জীবনসঙ্গিনী হবে তাকে সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্বমতে আনতে পারবে না? এত বুদ্ধিমতী নমিতা,—সে বুঝবে না যে ঠাকুর্দার অতিথি-নারায়ণের আদর্শবাদ কালোনীর জন্য নয়—ওঁর উচিত বেলুড়মঠে গিয়ে রাজনীতি করা? হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নবীন পতিতুণ্ডির সঙ্গে।

: এই যে ভূষণবাবু। আপনি কোন দলে ?

: কোন দলে ?

: বিতারণ পক্ষে না আমন্ত্রণ পক্ষে ?

: মানে ?

: শোনেন নি ? আপনাদের দলেই যে ভাঙন ধরে গেছে। আপনাদের ঠাকুর্দা নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করছেন। তাতে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় যাক আর যোগেন, কানাই, তাছাড়া আমরা সবাই চাই যেমন করে হ'ক কাজ চালিয়ে যেতে। নমিতাই এখন আপনাদের রাজরানী হ'য়েছেন। কয়েকজন চ্যাংড়া স্তাবক তাকে চামর ঢোলাচ্ছে এখন।

কে একজন বলে: আরে নবীনদা আপনি যে মায়ের কাছে মাসির গল্প সুরু করলেন। বিতারণ পক্ষের কাণ্ডারী হ'চ্ছেন ভূষণবাবু!

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না ভূষণের। দ্রুতপদে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

পিসীমার রান্না সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেলা একটা বাজে। ভূষণ নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল। ফ্যাক্টারির মাঠে তার যাওয়া হয়নি। সে ভেবেছিল নমিতা এলে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গেই যাবে সেখানে। নমিতাকে আগে বোঝাতে হবে পরিস্থিতিটা। না বুঝতে পারার মত জটিল নয় সমস্যাটা। মিঠু খেয়ে দেয়ে মামার পাশে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়েছে। কর্মব্যস্ত লতু মাঝে মাঝে ঘরবার করছে। দু একবার চোখাচোখিও হ'য়েছে ভূষণের সঙ্গে। কথাবার্তা হয়নি আর কিছু। নমিতা এতবেলাতেও আসেনি।

পিসীমা এসে ডাকেন: তুই এবার খেয়ে নে ভূষণ।

: সে কি? আর তোমরা? নমিতা দেবী তো এলেনই না এখনও।

: নমিতা খবর পাঠিয়েছে সে আসতে পারবে না।

: ও! গরীবের বাড়ির নিমন্ত্রণ রাখা বুঝি সম্ভবপর হ'ল না।

পিসীমা ধমক দেন: তোর যেমন কথা। ওর এখন কত কাজ।

: তা তো বটেই। উনি হ'চ্ছেন গণকল্যাণ সমিতির কর্ণধার, আর আমরা সামান্য কাটা কাপড়ের কারবারী।

গামছাটা কাঁধে ফেলে টিউব-ওয়েলের দিকে পা বাড়ায় ভূষণ।

হরিপদ পণ্ডিত একা বসেছিলেন দাওয়ায়। মনটা ভালো নেই তাঁর। লতু সকালে উঠেই গেছে ভূষণদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ আছে তার। নমিতাও বেরিয়ে গেছে সাত সকালে। স্কুলে যায়নি। গেছে গণকল্যাণ সমিতির কাজে। দুপুরেও ফিরবে না—তারও নিমন্ত্রণ আছে ভূষণদের ওখানে। বিন্দুবাসিনী দুজনের জন্য ভাতে ভাত রাঁধতে বসেছেন রান্নাঘরে। সংসারটা যেন ক্রমশই নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নমিতাকে এতটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। হাজার হ'ক মেয়েমানুষ। কাল রাত্রে ফিরেছে রীতিমত রাত্রে। আজও ভোরবেলা উঠে গেছে।

ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে মনে হ'ল কে যেন বাগানের গেট খুলে ভিতরে আসছে। সচকিত হন বৃদ্ধ। কে এল? লোকটি এগিয়ে এসে বসে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে।

: কে?

উত্তর দেয় না কেউ। পায়ের ধুলা নেয়।

বৃদ্ধ হাতটা ধরেন।

: কে লতু? নমু?

জবাব পাওয়া যায় না। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বলে ওঠে: বাবা!

: কে বৌমা! বৌমা তুমি! এস এস মা—অমু কেমন আছে?

অভিমানে, আশঙ্কায় কামিনী থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে! জবাব দিতে পারে না। কি ক'রে যে সে হাসপাতাল থেকে পথ চিনে এতটা এসেছে তা শুধু সেই জানে। হাসপাতাল থেকে প্রথমে পাগলের মতোই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। প্রতিমুহূর্তে মনে হয় পিছন পিছন ছুটে আসছে মতিদি। কোলে তার দলিত পিষ্ট এক খণ্ডিত বালকের

উর্ধ্বাঙ্গ। মন্তিদি যেন কেবলই পিছন থেকে প্রশ্ন ক'রে চলেছে : দেখুন তো এই কি আপনার দেওর ?

কামিনী ছুটতে থাকে।

কোথায় যাবে সে ? হাসপাতাল থেকে শুধু স্টেশনের পথটাই সে চেনে। নিজের অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের নির্দেশে এসে পৌছায় স্টেশানে। উত্তর-মুখী একটা ট্রেণ ছাড়ছে। কলোনীর দিকেই যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে মনস্থির ক'রে ফেলে। সে যাবে তার শ্বশুরের কাছে—যেখানে থাকে বাবলু। হয়তো গিয়ে দেখবে বাবলু বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলছে—অথবা বেলায় ঘুমিয়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মনটা হু হু ক'রে ওঠে তার। ভগবান, বাবলুকে যেন সে দেখতে পায় ও বাড়ি। আর কিছু সে চায় না !

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায় অন্ধের। চিৎকার ক'রে ওঠেন তিনি : কী হয়েছে ? কথা বলছ না কেন তুমি ?

কামিনীর ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে। কিছু বলতে পারে না।

কামিনীর হাতের উপর দ্রুত হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বলেন : আঃ ! কথা বলছ না কেন তুমি ? বৌমা ! এটা কি শাঁখা, না প্ল্যাস্টিক ?

কামিনী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে : উনি ভালো আছেন।

: ভালো আছে ! আঃ, বাঁচালে তুমি। অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে ? ওগো শুনছ ?

ও পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন বিন্দুবাসিনী। তাঁর দু'হাত হরিদ্রারঞ্জিত। কামিনীকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত হয় তাঁর। সেদিনকার সন্ধ্যে বেলার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। স্বামীর কাছেও গোপন রেখেছিলেন তিনি সে কথাটা।

: এই দেখ বৌমা এসেছেন। অনু ভালো হ'য়ে গেছে। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কামিনী বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করে। উবুড় হ'য়ে পড়ে পায়ের উপর। বাবলুর কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করতে মন সরে না। বলে : ঠাকুরঝি কোথায় ?

: নমু? সে বেরিয়ে গেছে। ফ্যাকটারির মাঠে নাকি পুলিশ এসেছে। সেখানে গেছে।

: আর লতু?

: ভূষণদের বাড়ি গেছে নেমন্তন খেতে।

: আর, আর বাবলু?

: বাবলু?

: আমার বাবলু কোথায়?

: সে তো তুমিই জানো। সে তো তোমার ওখানে থাকে।

: আমার কাছে থাকে? কতদিন এ বাড়ি আসে নি সে?

: কোনদিনই আসেনি। বাবলু তো এখানে নেই।

নেই! বাব্‌লু নেই! আর্তনাদ ক'রে কেঁদে ওঠে কামিনী! পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বিন্দুবাসিনীর। কি হ'ল? সবাই ছুটে আসে। প্রতিবেশীরাও। কামিনীকে তুলতে গিয়ে দেখে—সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

সমস্ত শুনে স্তব্ধ হ'য়ে বসে ছিলেন হরিপদ মাস্টার। ঘরে এসে জমায়েত হ'য়েছে প্রতিবেশীরা। নানা রকম মন্তব্য।

: থোঁড়ার পাই থানায় পড়ে গো। আহা অন্ধ মানুষের কোলের ছেলেটা।

: দুধের বাছারে ক্যান পাঠান বাপু চানাচুর বিক্রি করনের লগে?

হরিপদ পণ্ডিত শূন্যের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোয়ালসর্বস্ব গাল বেয়ে ঝ'রে অঝোর ধারায় অশ্রু। বলেন: বাবলুকে তুমি পাঠাতে চানাচুর ফিরি করতে? আমাদের বলনি কেন?

কামিনী মাথাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলে: আমি, আমিই মেরে ফেলেছি বাবলুকে।

কে একজন তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুলতে যায়।

বিন্দুবাসিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উন্মাদিনীর মত চেহারা হয়েছে তাঁর। কামিনীর কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলেন: ভয়েছে? তোর অজর

পেট ভরেছে? রাক্ষসি! তোর ছায়া ছেড়ে পালিয়ে এলাম—তবু কেড়ে নিলি আমার ছেলেকে?

একজন এসে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। কামিনী নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। প্রতিবাদ করে না। সেই যে মেরে ফেলেছে ধাবলুকে!

আর একজন বলে: আরে চানাচুর বিক্রি করে তো কত ছেলে। এ যে আপনাদের বাবলুই তা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন কেন?

হরিপদ বলেন: আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা। এ বাবলুই। আর কেউ নয়। এ আমার পাপেই হয়েছে। আমার সতী লক্ষ্মী মাকে আমি মিথ্যা সন্দেহ করেছিলাম। সেই পাপেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ওঃ ভগবান!

ছেলেটি তবু বলে: ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন। চলুন আমার সঙ্গে হাসপাতালে। সেখানে নিজে দেখে যা হয় করুন।

পণ্ডিত বলেন: চলো, শেষকৃত্য তো আমাকেই করতে হবে।

কামিনী ওঠে: আমিও আসব বাবা?

: এস।

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে শয্যা নিয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা তাঁর শুশ্রূষায় লেগেছেন। একজন খবর দিতে যায় নমিতাকে ফ্যাক্টারির মাঠে। আর একজন যায় ভূষণদের বাড়ি থেকে লভুকে ডেকে আনতে। ছেলেটি বলে: এই রিক্সায় উঠুন। স্টেশনে দিয়ে আসবে।

হরিপদ বলেন: রিক্সা লাগবে না বাবা। আমরা হেঁটেই যাবো। ঐ তো স্টেশন। এটুকুর জন্ম আর রিক্সা চাই না।

রিক্সা-ওয়ালা ধমক দেয়: আরে চুপ করেন বুড়া কর্তা। ভাড়া ভাওন লাগব না আপনার। ওঠেন বৌমারে লয়্যা।

হরিপদ তবুও ইতস্তত করেন।

রিক্সা-ওয়ালা বলে: আরে পাগল হইছেন নাকি আপনে বুড়াকর্তা? অনিমেষ রিক্সাআলার ভাই—আমি কি ভাড়া লইবার পারি?

হরিপদ পণ্ডিত কামিনীকে নিয়ে রিক্সায় ওঠেন, প্রশ্ন করেন : অনিমেষকে তুমি চেন বুঝি।

: চিনি না, তয় সব রিক্সাআলাই তো সব্বার ভাই। মানেন তো সে কথা। আমার ঘরেও তো ভাই-বুইন আছে।

রিক্সা চলল রাস্তা দিয়ে। এ রাস্তায় রিক্সা চালানো এখন কঠিন হয়ে উঠেছে। দশফুট চওড়া ক'রে এক বিঘৎ পরিমান মাটি কাটা হয়েছে। 'বক্স-কাটিং' না কি যেন বলে ওরা। কোথাও আবার তার উপর ইট বিছিয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক যেখানে সেই বিছান ইঁটের উপর ছড়িয়ে রেখেছে খোয়ার টুকরা। হু হু করে কাজ করছে লোকগুলো। সরল রাস্তাকে—রিক্সায়ালার মতে—দুর্গম করে তুলছে প্রতিমুহূর্তে।

কামিনী কাঁদছিল। নীরব অশ্রুপাত।

পণ্ডিত ওর মাথায় ডান হাতখানা রাখেন। সে স্নেহস্পর্শে থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে ওঠে কামিনী।

: কেঁদে মনটা হাল্‌কা ক'রে নিচ্ছ বৌমা? কাঁদ। আমি তো জানি বাবলুকে শুধু গর্ভেই ধরেছিলেন তোমার শাশুরী। ওঃ! এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল!

রিক্সায়ালা আবার ধমক্‌ দেয় : ওই, ওই, আবার ঐ কথা কইতে আছেন?

: এই কথাই যে বল্‌ব বাবা সারাজীবন। এ আমারই পাপের ফল। সংসারের আয় নেই—অথচ বৌমা বাজারের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। সে অন্ন আমার গলা দিয়ে নামতো না। তারপর, তারপর সে রাত্রে—

কামিনী বলে : থাক্‌ বাবা।

হরিপদও বলেন : থাক্‌ মা থাক্‌। সে রাত্রের ভুল বোঝাবুঝির কথা আর বল্‌ব না আমি। কিন্তু তুমি কেন বল্‌লে না আমাকে ডেকে যে বাবলুর রোজগারে খাচ্ছিলাম আমরা?

কামিনী চুপ করে থাকে।

হরিপদ মাস্টার মাথা নেড়ে বলেন : না, আমারই ভুল হচ্ছে। তুমি বলতে চেয়েছিলে। আমিই শুনতে চাইনি। না বৌমা?

কামিনী আর্তকণ্ঠে বলে : ও কথা থাক বাবা।

: থামতে তো আমিও চাইনি। কিন্তু পারছি কই? আমার যে প্রতি-মুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে মিথ্যা সন্দেহ ক'রে বাবলুকে মেরে ফেলেছি আমি। আমি সন্তান হত্যা করেছি!

কামিনী ব্যথাবিধুর কণ্ঠে বলে : না বাবা, আপনি নয়। দুরন্ত অভিমানে আমিই দূরে সরে গিয়েছিলাম। পাপ আমারই—

কথাটা শেষ হয় না, ডুগরে কেঁদে ওঠে আবার।

রিক্‌সাআলা রিক্‌সা থামিয়ে নেমে পড়ে। বলে : করেন, আপনারা বিচার ক'রে রায় স্থান্ তারপর ফির চালাইবাম।

হরিপদ বলেন : কি হল?

: যে ছেলে মরে নাই—সে কার পাপে মরল স্থির করেন তারপর যাইবাম্।

হরিপদ বলেন : আচ্ছা বাবা আর কোনও কথা বলব না আমরা।

আপন মনে গজগজ করতে করতে রিক্‌সাআলা প্যাডলে বসে।

খাওয়া দাওয়া সেরে ভূষণ এসে আবার শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়। 'ডি'.ব্লকের দিক থেকে একটা মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে। গণ্ডগোল বেশী হচ্ছে মনে হয়। অনাহুতই যাবে নাকি একবার ভূষণ? সেও তো সমিতির একজন কার্যকরী সভ্য? তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব ছুটিতে। এত বড় দায়িত্বে নমিতার পাশে গিয়ে তার দাঁড়ানো উচিত। নাই বা ডাকলো নমিতা। বিপদের দিনে না ডাকতে যে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সেই তো বন্ধু। এটা অভিমান করার সময় নয়। বিপদ কেটে গেলে যখন সকলে নমিতাকে অভিনন্দন জানাবে তখন অভিমান ক'রে সরে থাকার তবু মানে হয়।

আবার ভাবে ভূষণ—কিন্তু বিপদটা কি স্বখাত-সলিল নয়? নমিতা কেন যাচ্ছে ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে মাথা গলাতে? যোগেন, কানাই অথবা সে যা বলেছে সেটাই তো ঠিক কথা। এ সোজা কথাটা বুঝছে না কেন নমিতা? ওদের জোর ক'রে উঠিয়ে না দিলে পরিকল্পনা কিছুতেই সার্থক হ'তে পারে না। কলোনীর যদি আর্থিক উন্নতি হ'তে থাকে, কলোনীবাসির এই উইটিপি-গুলিকে যদি এবারকার মত বাঁচানো যায় দুর্দৈবের আক্রমণ থেকে—তখন আরও লোককে আমরা স্থান দিতে পারব। বর্তমান বেকারদের যদি কর্ম-সংস্থান হয় তা হ'লে কলোনীর উন্নতি হবে। ফাঁকা প্লটগুলোয় আমরা ডেকে আনতে পারব ওদের। আর ওরা যদি সেই সুদিনের অপেক্ষা না ক'রে, আজই এখনই এসে আমাদের জীবনধারার পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাহ'লে অতিথি নারায়ণদের কঠিনভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা স্বার্থের কথা নয়, মুক্তির কথা। গোটা দেহটাকে বাঁচাতে যেমন পচনশীল একটা অঙ্গকে কেটে বাদ দেন সার্জেন এ তেমনিই। দেশের মুক্তি, জাতির মুক্তির জন্যে আপাত-নিষ্ঠুর আদেশ দেন সেনাপতি। রণাঙ্গনে একদল প্রাণ দিতে ছোটে,—আর একদল তার ফলভোগ করে উত্তরকালে। যুদ্ধ থেমে যায়, গৃহাগত সৈনিকদের তখন আবার ঠাঁই হয় গ্রামে নগরে। নেতাকে হ'তে হবে দূরদর্শী। তিনি শুধু বর্তমানের কথাই ভাববেন না। সেন্টিমেন্টের উর্ধ্বে উঠবেন তিনি। তাঁকে হ'তে হবে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য জাহ্নবীর ভগীরথ! তাঁর দায়িত্ব অনেক। ঠাকুর্দা সেন্টিমেন্টাল হ'তে পারেন. নমিতা তাঁর অন্ধ অনুসারী হ'তে পারে—তবু সমগ্র কলোনীর লোকে যা চাইছে তাই মঙ্গলের পথ। ভূষণ যদি এখন গিয়ে দাঁড়ায়ও নমিতার পাশে সে কেমন ক'রে সাহায্য করবে তাকে? নৈতিক সমর্থন তো সে দিতে পারবে না।

এবং সেটা জানে বলেই তাকে নমিতা ডাকেনি—ভাবে ভূষণ। ঐ মেয়েটি ভালোভাবেই জানে যে ভূষণ প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ। দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরুপায় নিরন্ন নবাগত লোকগুলোর প্রতি যতই সহানুভূতি থাক ভূষণের—সমগ্র কলোনীর বৃহত্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ওরা এখন বাধারূপে উপস্থিত। সমূলে ওদের

উৎপাটিত করতে ভূষণ কুণ্ঠিত হবে না। এখানে সে বিচারকের মতই অনম্র, বজ্রস্বকঠিন। তার এ পরিচয় অন্তত নমিতা জানে। তাই সে তাকে নি ওকে।

হঠাৎ পায়ের কাছে একটা সুরসুরি লাগায় ভূষণ উঠে বসে। লক্ষ্য করে লতু এসে ওর পায়ের কাছে নিবেদন করছে একটা সলজ্জ প্রণাম।

: একি? হঠাৎ কি হ'ল?

ওকে হাত ধরে তুলতে গিয়ে ভূষণ লক্ষ্য করল একটি জিনিস!

লতুর ছ'হাতে দুটো মকর-মুখো বালা।

এটা চিনতে কষ্ট হয় না। এ বালা শৈশবে দেখেছে সে মায়ের হাতে! এ বংশের মাঙ্গলিক অলঙ্কার!

: আমাকে আশীর্বাদ করলে না?

: আশীর্বাদ! ও, হ্যাঁ করলাম বই কি!

মিঠু একটু বেকায়দায় শুয়ে ছিল। লতু তাকে সরিয়ে ঠিক ক'রে শুইয়ে দিল। মাথার নিচে বালিশটা টেনে দেয়। তারপর পানের বাটাটা এগিয়ে দিল ভূষণের দিকে। লতুরও খাওয়া হ'য়ে গেছে। নিজে এক খিলি পান তুলে নিল মুখে। একবার কৌতুকদীপ্ত চোখে ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে: কী গোপন কথা বল্‌বে বলছিলে তখন?

প্রশ্নটা করে মাটির দিকে তাকিয়েই।

ভূষণ জবাব দিতে পারে না।

হঠাৎ হেসে ফেলে লতু। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে: তুমি কী গো? বিয়ে না হ'তেই গোপন কথা শোনাবে?

বলেই ছোটে দরজার দিকে।

ভূষণ ডাকে—লতু শোন।

ভুলটা এখনই ভেঙে দিতে চায়। এ কী অত্যাচার। এ মেয়েটা কেন ধরে নিয়েছে যে ঐ একফোঁটা লতিকাসুন্দরীর জন্যে ভূষণের প্রেম একেবারে উথলে উঠেছে!

দ্বারের কাছ থেকে লতু বলে: ঈস্। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ নাকি? দুপুর বেলায় বন্ধ ঘরে ডাকছ যে আমায়? শুনব না আমি।

পিসীমা হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকেন: ভূষণ!

: কি পিসী?

: বন্দুকের আওয়াজ না?

তাই তো! দু দুবার ফায়ার হ'ল! পর পর। তারপর একটা মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে 'ডি'-ব্লকের দিক থেকেই।

এক লাফে উঠে পড়ে ভূষণ! পাঞ্জাবীটা তুলে নেয় আলনা থেকে। লতু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে: না, আমি যেতে দেব না। ওখানে গুলি চলছে।

: কী ছেলেমানুষী করছ লতু? তোমার দিদি রয়েছে ওখানে।

: না নেই। তুমি যেও না। দিদি নিশ্চয়ই পালিয়ে আসবে।

: তোমার দিদি পালিয়ে যাবার মেয়ে নয় লতু। তোমার চেয়ে তাকে বেশী চিনি আমি। ভয়টা আমার সে জন্যেই। ছাড় আমাকে।

জোর ক'রে লতুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছুটে বেরিয়ে যায়। পিসীমা পিছন থেকে ডাকেন: ভূষণ, শোন, যাস্‌নে!

: এখনই ফিরে আসছি আমি।

আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেও দুর্দৈবকে নমিতা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব ছুটিতে,—যোগেন, কানাই প্রভৃতি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করছে। ভূষণবাবু বিরোধী পক্ষের পাণ্ডা। সমস্ত কলোনিবাসী চাইছে এই লোকগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। এই ব্যাপারে, আশ্চর্য, ভূষণবাবুর দল হাত মিলিয়েছে বিষ্টুপদ গোকুল নবীনের সঙ্গেও। কলোনীর কর্তৃপক্ষও ওদের সরিয়ে দেওয়াই মনস্থ করেছেন। বাগচি সাহেবের অনুপস্থিতিতে যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি খবর পাঠিয়ে পুলিশ ভ্যান আনিয়েছেন। মারামারি গণ্ডগোল হ'লে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবে

তারা। বিষ্টুপদ নবীন যোগেন কানাই গোকুল হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। বেসরকারী লরি জোগাড় হয়েছে খান কয়েক। বিতারণপর্ব চলেছে নির্বিবাদে।

মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে ঠাকুর্দার বৈঠকখানায় নমিতা গুমরে মরছিল আপন মনে। এদের স্থানান্তরিত করা উচিত কি অনুচিত এটা সে ভেবে দেখেনি। সে যে নিতাই ঠাকুর্দার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না এটাই তার ক্ষোভ। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর্দার একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে। এ লোকগুলোকে তিনি কলোনীতে রাখতে চান। তার মানে এ নয় যে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাক্। উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে সেটা নিতাই ঠাকুর্দাকেই যে সবচেয়ে আঘাত করবে—এ বিষয়ে নমিতার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু একা সে কি করতে পারে?

ঠিক এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবী।

: ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না নমিতা। আমাদের বাধা দিতে হবে। ঠাকুর্দা যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ যাতে একটি লোকও স্থানত্যাগ না করে তা আমাদের দেখতে হবে। দরকার হয় আমরা পিকেটিং করব।

: আপনিও? কিন্তু আপনি যে সরকারী চাকুরে—

: বাজে তর্ক কর না। এস আমার সঙ্গে—

ওরা দুজনে গিয়ে দেখা করে ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্রের সঙ্গে।

মৈত্রসাহেব বলেন: আপনারা দুজনে আর কি বাধা দেবেন? বাধ্য হ'য়ে দারোগা আপনাদের এ্যারেষ্ট করবে। জনসাধারণ তো দূরের কথা গণকল্যান সমিতিও যখন আপনাদের পিছনে নেই, তখন, কিছু মনে করবেন না আপনারা—এটা নেহাৎই ছেলেমানুষি হবে।

ওরা দুজনে ফিরে আসে। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু নমিতার ইচ্ছা নৈতিক আপত্তি জানাতেও ওদের দুজনের যাওয়া উচিত। যে লোকগুলি এখানে এসেছিল, যাদের জোর ক'রে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা

আয়ুক, তারা বুঝুক যে কলোনীতে অন্তত দুজন লোকও ছিল যারা চেয়েছিল তাদের স্থান দিতে।

হঠাৎ ছুটে আসে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে রয়েছে কানাই বাচ্চু, রাখাল। প্রমোদ বলে: নমিতাদি খবর শুনেছেন?

: কি?

: রিফুজিদের সরাবার জন্যে যে লরিগুলি এসেছে সেগুলো জংসন থেকে ভাড়া ক'রে এনেছে বিষ্টুপদ আর গোকুল। একলরি লোক পাঠান হ'য়ে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে লোক বোঝাই করাচ্ছে।

সুরেখা দেবী বলেন: এ খবরে তো আপনাদের উল্লসিত হওয়ার কথা প্রমোদবাবু। আপনারাই তো চাইছিলেন ওদের পত্রপাঠ বিদায় করতে।

রাখাল বলে: কিন্তু ভেতরে যে এই ষড়যন্ত্র চলছে তা জানব কি ক'রে?

: ষড়যন্ত্র?

কানাই বলে: আসল কথাটা খুলে বল। ওঁরা বোধ হয় এখনও কিছু জানেন না।

প্রমোদ পাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।

রাস্তার কাজে জনা কুড়িক গ্রুপ কাজ করছিল এতদিন। এবার বড় তিনটে কাজের স্যাংসান এসে যাওয়ায় মৈত্রসাহেব নতুন গ্রুপলীডারের নাম চেয়ে পাঠান বাগচি সাহেবের অফিসে। অর্থাৎ যে কাজ কোয়াপারেটিভের মাধ্যমে করাতে চেয়েছিলেন নিতাইপদ। ইতিমধ্যে বাগচি সাহেব ছুটিতে যাওয়ায় যতীশবাবু পত্রের উত্তর দেন মৈত্রকে। তিনি তিনটি কাজের জন্য তিনটি নাম পাঠিয়েছেন। তাদের আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখও করেছেন। মৈত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাম্প অফিসের নির্বাচিত গ্রুপলীডার তিনজনকে তিনটি কাজ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রডাকসন সেন্টার বানাবেন শ্রীবিষ্টুপদ মজুমদার, ফ্যাকটারিটা তৈরী করবেন শ্রীগোকুলদাস;—আর ইটখোলার কণ্ট্রাক্ট শ্রীনবীন পত্তিতুণ্ডির!

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে নমিতার। সে আবার ফিরে যায় বীরেনবাবুর

অফিসে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চায় সব কথা। বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন: একজন কাজ পেলেই অন্য একজন বলে অন্যায় করা হয়েছে। আপনারা যদি কেউ পেতেন—ওরাও এসে বলত অন্যায় হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করতে এসেছি। আপনাদের দলাদলির মধ্যে আমি নেই।

নন্দিতা বলে: কিন্তু ঐ বিষ্টুপদ, নবীন আর গোকুলবাবু কি বেকার? না অন্নাভাবে ওদের পরিবার না খেতে পেয়ে মরছে?

মৈত্র বলেন: আপনি খামকা রাগ করছেন মিস্ চক্রবর্তী। আমি রিলিফ ডিপার্টমেন্টের লোক নই। আমার কাছে নবীন প্রাচীন, কেষ্ট-বিষ্টু সব সমান। কে অর্থবান আর কে বেকার তার আমি কি জানি?

: তা হ'লে কিছু না জেনে কাজ ডিস্ট্রিবিউট করলেন কেন? আপনি জানেন না, কিন্তু আমরা তো জানি। আপনার উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করা।

: আমার কি উচিত ছিল তা আপনার সঙ্গে আলোচনা না করলেও চলবে। গণকল্যাণ আর গণনাশন সমিতিকে আমার চেনার কথা নয়। আমি এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের অফিস থেকে নাম পেয়ে কাজ দিয়েছি।

: আমি কি তাহ'লে ধরে নেব—এ ষড়যন্ত্রে আপনিও লিপ্ত আছেন?

বীরেন মৈত্র পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন: ষড়যন্ত্রটা আপনি কোথায় দেখলেন জানি না; কিন্তু সে যাই হ'ক, কোনও কাজের কথা যদি আপনাদের বলার না থাকে তাহ'লে আসতে পারেন। আমার ইন্টগ্রিটি সম্বন্ধে আমারই ভিজিটার্স চেয়ারে বসা একটি মহিলার সঙ্গে আমি আলোচনা করব—এটা আপনি একটু বেশী আশা করছেন মিস্ চক্রবর্তী।

: বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু এর ফল ভাল হবে না মিস্টার মৈত্র।

বীরেনবাবু একটু হাসলেন: কলোনীর কাজে দলাদলি থাকবেই। এটা জেনেই আমি কাজে নেমেছি। দলাদলি করুন—ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনারা? যারা কাজ পেয়েছে হ'তে পারে তারা আপনাদের বিপক্ষ শিবিরের লোক; কিন্তু ওরাও এমন কিছু বড়লোক নয়। ওরাও কলোনিবাসী। ওরা কাজ

ক'রে যদি পেমেন্ট পায় তবে সে-টাকা কলোনীতেই থাকবে। এত আপত্তিই বা কিসের ?

: কেন আপত্তি শুনবেন ? দুদিন পরে আমরা বলতে আসব পাঁচজন কাজ করছে আর পঁচিশজনের হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কলোনীর বাইরে থেকে অল্পমজুরীর মিস্ত্রি মজুর এনে কাজ করানো হচ্ছে অথচ হিসাবে দেখানো হচ্ছে কলোনীর লোকের নাম। ভুল হিসাব দাখিল করে, সই জাল করে ওরা তিনজনে টাকা আত্মসাৎ করছেন। আপনারা তদন্ত করতে আসবেন। আমরা পাঁচজন সাক্ষী হাজির করলে ওঁরা দশজন ভাড়া করা সাক্ষী হাজির করবেন। আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আপনারা ফলাও ক'রে খবরের কাগজে ছাপবেন—উদয়নগর কলোনীতে এত লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে, এত হাজার লোক কর্মসংস্থান করছে—অথচ কলোনীর সত্যিকারের অর্থহীনেরা অনশনে মরতেই থাকবে। বেকার আত্মহত্যা করবে। স্ফীত হবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এ আমরা আগেও হ'তে দেখেছি—এবারও দেখব !

বীরেনবাবু বলেন : বেশ তো, সে রকম অন্যায় যদি হ'তে দেখেন তাহ'লে অভিযোগ জানাবেন। বিচারের প্রহসন হবে এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ?

: এই তো অভিযোগ করছি। যতীশবাবু যে তিনজন লোকের নাম আপনার কাছে দিয়েছেন ওঁরা ছিলেন আগেকার কমিটির লোক—নানান অভিযোগ আছে আমাদের—ওঁদের বিরুদ্ধে। আপনি নতুন লোক তাই আমাদের এতকথা কিছুই জানেন না।

: অর্থাৎ আপনার মতে—একমাত্র গণকল্যাণ সমিতিই সততার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। রিলিফ অফিস আর ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সবাই চোর—তারা সৎ লোকের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রই করছে,—কেমন ? কিন্তু বলতে পারেন এতে আমাদের স্বার্থটা কি ?

: খুব পারি। যতীশবাবুরা চায় না যে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখি। ক্যাস্-ডোল আর স্টায়ভেসন্ ডোলের ডামাডোলে তাদের সুযোগ-

সুবিধা বেশী। উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের পুনর্বসতি হ'লে তাঁদের চাকরিই থাকবে না—চোরাই কারবার চালানো তো দূরের কথা। আর আপনারা? আপনারা পয়সা-ওয়ালা বড় লোক ঠিকাদার দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাতে আপনাদের কি কি সুবিধা হয় সে কথা প্রকাশ্যে না বলাই ভালো—তবে কারণটা আপনি জানেন আমাদেরও বুঝতে কিছু বাকি নেই মিষ্টার মৈত্র!

মৈত্র সাহেব কি একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কানাই ঘরে ঢুকে বলে: নমিতাদি শীগ্‌গির আসুন। ওখানে বোধহয় গণ্ডগোল বেধেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

পর পর দুবার।

ওরা ছুটে বেরিয়ে এল। কে একজন বল্লে: নমিতাদি আপনি এখনই বাড়ি চলে যান। আপনার মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বাড়িতে ডাকছে।

নমিতা একটু থেমে পড়ে। বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। খামোখা বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞান হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। এখানে গুলি চলছে বলে বোধহয় ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার কৌশল করেছেন।

ছেলেটিকে বলে: তুমি বাড়ি যাও ভাই। মাকে একটু দেখ। আমি এখনই আসছি।

কানাই এগিয়ে গিয়েছিল, বলে: কি হ'ল নমিতাদি? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন শীগ্‌গির।

: এই যে আসছি।

দু'ব্যাচ লোককে জোর ক'রে লরিতে চাপিয়ে পাঠানো হয়েছে পি. এল. ক্যাম্পের উদ্দেশে। লোকগুলো প্রতিবাদ করবার ভরসা পায়নি। য়ুনিফর্ম পরা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে স্বয়ং দারোগা সাহেব উপস্থিত। তাছাড়া এই কলোনীর একজন লোকও চায় না ওদের এখানে রাখতে। কি আর করা যায়? ওরা বিনা প্রতিবাদে গাড়িতে ওঠে। যাবে, পি. এল.

ক্যাম্পেই যাবে ওরা। তৃতীয় ট্রিপ লোক বোঝাই দেবার সময় বাধলো গণ্ডগোল।

ইতিমধ্যে খবর রটে গিয়েছিল কাজ পেয়েছে বিষ্টুপদ, গোকুল আর পতিতুণ্ডির দল। তাই ওদের এত উৎসাহ। সে জন্যেই এ লোকগুলিকে কুকুর বেড়ালের মত গাড়ি বোঝাই ক'রে পাঠান হচ্ছে তাড়াতাড়ি। না হ'লে কাজ স্থরু করতে পারছে না ওরা।

মুখে মুখে রটে গেল কথাটা। গণকল্যাণ সমিতির ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। বেকার যুবকেরা নাম লিখিয়েছে। আশা করেছিল স্বাভাবিক ভাবে কাজ স্থরু হ'লে তাদের ডাক পড়বে। নিতাই ঠাকুর্দার দলের অধীনে কাজ করলে আর যাই হোক স্থবিচার পাবে। মজুরী করে হাজিরাও পাবে। হঠাৎ এ খবরটায় ওদের সে আশা যেন নির্মূল হ'ল। এ কী অত্যাচার! যে লোকগুলো চুরি জুয়াচুরি ক'রে এতদিন সর্বনাশ ক'রে এসেছে কলোনীর তারাই আবার কাজ পাবে?

: দেব না ওদের কাজ করতে।

: বন্ধ থাক্ কাজ। যতদিন না ঠাকুর্দা ফেরে, বাগচিসাহেব জয়েন করে।

একদল উৎসাহী যুবক গিয়ে চড়াও হ'ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের অফিসে। ঘেরাও করল অফিস। উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছে।

: কই মশাই গ্রুপ-লীডার রেকমেণ্ড করনেওয়ালা—একটু বেরিয়ে আস্থন তো।

যতীশবাবু জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেন। চট ক'রে বাথরুমে ঢুকে পড়েন এবং ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দেন।

: যতীশবাবুকে ডেকে দেন না মশাই। ঘরের বাইরে আস্থন উনি। আমরা দেখা করতে চাই।

যতীশবাবু ততক্ষণে বাথরুমের ওদিককার দ্বার খুলে বেরিয়ে গেছেন। মৃণাল আর মিহির বেরিয়ে আসে।

: কেন ঝামেলা করছেন অফিসের সামনে? কি চাই আপনাদের?

: যতীশবাবুকে চাই।

যতীশবাবুকে পাওয়া গেল না অফিসে।

একদল গেল তাঁর বাড়ির দিকে। একদল গেল স্টেশনে।

মৃণাল মিহিরকে বল্লে : ঘেন্না ধরে গেল ভাই। বিয়ে যদি না করতাম— তোমায় বলছি মিহির, চাকরির মাথায় লাথি মেরে বাড়ি চলে যেতাম।

মিহির বল্লে—সেটা তো কঠিন নয়। এর ভেতর থেকে যদি সততার সঙ্গে কাজ করতে পার, তবেই না ক্ষমতা। কর্তাতো ভেগেছেন। একবার যাবে নাকি ফ্যাকটারির মাঠে?

মৃণাল ইতস্তত করছিল। হঠাৎ ঐ দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসায় উঠে পড়ে। দুজনে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে।

জনতা চলেছে ফ্যাকটারির মাঠে। অর্ধদণ্ড আগে যারা বলছিল'—হাটাও বখেড়া, তাড়াও ঐ নতুন লোকগুলোকে', তারাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভাঁটার টানের মুখে হঠাৎ এসে পড়েছে কোটালের বান।

একদল উৎসাহী বেকার যুবক এসে সমবেত হ'ল ময়দানে। সেখানে পূর্বেই উপস্থিত ছিল যোগেন তার কয়েকটি অনুচর নিয়ে। নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলছিল যোগেন। ঠাকুর্দা নেই। ভূষণ বিপদের সময় সরে দাঁড়ালো! কলোনীকে নেতৃত্ব দেবার একটা লোক নেই এই অসময়ে। দলটা এসে যোগেনের কাছেই সুবিচার দাবী করল। এ অত্যাচার হ'তে দেব না! যোগেন মুহূর্তে এগিয়ে এল নেতৃত্ব দিতে। সে নিজেই ভুলে দলপতির ঝাণ্ডা! সতীশের চায়ের দোকান থেকে একখানা টিনের চেয়ার টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিল—

: বন্ধুগণ—

মিনিট কয়েক পরে ওদের দলটা এসে পৌছালো যেখানে মানুষগুলোকে লরিতে বোঝাই দেওয়া হচ্ছে সেখানে। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে ওদের দলে। বেড়েছে উদ্দীপনা আর অসন্তোষ। মানব না এ অত্যাচার!

ওরা বাধা দিল।

দারোগাবাবু এসে ওদের সতর্ক করে দিলেন। সরকারী কাজে বাধা দিলে তিনি বাধ্য হয়ে এ্যারেস্ট করবেন এদের।

যোগেন জবাবে শুধু বললে '—ইনক্লাব—!'

পাদপূরণটা জানা আছে সকলের। ধ্বনিত হ'ল সেটা।

ওরা ঘিরে দাঁড়ালো লরিখানাকে

: দেব না ওদের সরিয়ে নিতে।

দারোগা জনতাকে বে-আইনি ঘোষণা করলেন। চলে যেতে বল্লেন। ওরা জবাবে একই কথা বল্লে আবার'—ইনক্লাব!'

দারোগা সশস্ত্র পুলিশদের কি যেন হুকুম দিলেন।

বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। পর পর দুবার।

বন্দুকের মুখ ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে! আঘাত করা ইচ্ছা নয়। এ বোধহয় একটা চরমতম সাবধান বাণী। অর্থাৎ প্রয়োজন হ'লে বন্দুকও চালান হ'বে।

বিষ্টুপদ দারোগাবাবুর কানের কাছে এসে বলে: লাঠি চার্জ করেন ছার। আর ঐ হালা জগারে এ্যারেস্ট করেন।

দারোগা একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন : আপনি কে মশাই? বেশী বাজে কথা বলবেন না—চালান দেব আপনাকেই।

বিষ্টুপদ ঘাবড়ে যায়। এ বেটা তাঁকে চেনে না নাকি।

লোকগুলো ফাঁকা আওয়াজে ভয় পায় না।

নিরুপায় উদ্বাস্তুগুলোও সাহস পেয়ে ফিরে দাঁড়ায়। যাদের ওঠানো হয়েছিল গাড়িতে তাদের কয়েকজন ফের ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ে। বিষ্টুপদর দলের কয়েকজন ছুটে গিয়ে পাকড়াও করে ওদের।

যোগেনদের দলের কয়েকজন গিয়ে বাধা দেয়। ফলে হাতা হাতি সুরু হয়ে যায়।

নমিতারা পৌছে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

দারোগা হুইসিল বাজালেন। সব কটি পুলিশ একত্র হল নিমেষে।

বিষ্টুপদ, গোকুল জানত এ জাতীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। সব রকম

বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল ওরা। বেশ কয়েকঝুড়ি ঝামা খোয়া গাদা ক'রে রেখেছিল এক কোণে। ঠিকাদারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আদলা-ঝামা-ব্যাটের এ উপকারিতাটা অজ্ঞাত ছিল না।

এক ঝাঁক ঢিল এসে পড়ল কোথা থেকে।

কানাই আহত হ'ল, দারোগা সাহেবের কপালে এসে লাগলো একটা। বাঁ হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বসে পড়লেন তিনি।

একজন সাব ইন্সপেক্টর এসে তাঁকে ধরতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে খাকি সার্টের উপর।

লাঠি চার্জ করবার হুকুম দিলেন তিনি। বে-আইনি জন সমাবেশ ভেঙ্গে দিতে বল্লেন।

ওদিকে যষ্টিবর্ষণ তার আগেই সুরু হয়ে গেছে। বিষ্টুপদর ভাড়াটে গুণ্ডার দল এলোপাতাড়ি মারতে সুরু ক'রে দিয়েছে যোগেন নায়েকের দলটাকে। এরা নিরস্ত্র এসেছিল বস্তুত মার খেয়ে পেছুতে লাগলো।

পুলিশের এক ঝাঁক লাঠি পড়ল।

ছুটে পালাচ্ছে সবাই। কঙ্কালসার উদ্বাস্তুগুলো এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। বুড়োবাচ্ছা সামলে দাপাদাপি করছে সারা মাঠ ময়। যোগেনের কাঁধে লাগলো একটা লাঠি! পড়লো সে ঘুরে।

পুলিশের লাঠি নয়। বিষ্টুপদর ভাড়া করা একটা লোক।

আবার উঠ্‌ল লাঠি। সামনে একজন বৃদ্ধা উদ্বাস্তু!

দু হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ক'রে চীৎকার করে উঠ্‌ল সে ভয়ে। গগন বিদীর্ণ-করা সে আর্তনাদে নমিতা আত্মহারা হয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই যষ্টিবর্ষণের মধ্যে। ঠেলে ফেলে দিল বৃদ্ধাকে সবলে। বেঁচে গেল বুড়িটা।

লাঠিখানা সজোরে নামলো নমিতার মাথায়! খোঁপা সমেত মাথার পিছন দিকটা নেমে এল।

নমিতা পড়লো মাটিতে।

যোগেনের পাশেই!

হরিপদমাস্টার মশাই যখন গিয়ে পৌঁছলেন জংসনের হাসপাতালে তখন মৃতদেহকে দাহ করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলোনীর রিকসাআলা কিন্তু সঙ্গে এসেছে। একা ছেড়ে দেয়নি অন্ধকে পুত্রবধূর সঙ্গে। শুধু কৌতূহল নয়—কর্তব্য বলেই মনে করেছে সঙ্গে আসাটা। রিক্শাখানা রেখে এসেছে উদয়নগর স্টেশনে একজন জানা লোকের জিম্মায়। মৃত ছেলেটিকে সনাক্ত করা হয়েছে। তার তিনকুলে কেউ নেই। আছে এক বুড়ো কাকা। এসেছেন তিনি। উদয়নগর কলোনীরই একজন বাসিন্দা। মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে আসছে মর্টন, হাতকাটাতেল, তানসেনগুলি প্রভৃতি। বাবলুও এসেছে। বৌদিকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না। সজল চোখ দুটি তুলে বল্লে : মশলামুড়ি কাটা পড়েছে বৌদি।

কামিনী ওকে টেনে নেয় নিজের কোলে। হরিপদ মাস্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন একটা। বাবলুর সর্বাঙ্গে ধুলো, বালি ময়লা। চিমটি দিলে ময়লা উঠে আসে। খালি গা। প্যাণ্টটা এককালে খাকি ছিল এখন চেনা যায় না এতো কালো। রুক্ষ চুল, শুক্নো মুখ।

কামিনী বলে : তুই আজকাল চানাচুর বিক্রি করিস না ?

: না, কে ভেজে দেবে ?

: তবে কি করিস আজকাল ? বাড়িতে থাকিস না যে ?

: কয়লা বাছি।

উদ্যোগী সিংহশাবক বাবলু। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' মন্ত্র তার। যে বয়সে ওর বাপ দাদারা অঙ্ক ইংরাজি শিখেছে—সে বয়সেই ওকে শিখতে হয়েছে উপার্জন। বিনা মূলধনের ব্যবসায় এ বাজারে প্রায় অসম্ভব ; কিন্তু অসম্ভবকে জয় করতেই ওর তারুণ্যের অভিযান। খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা ব্যবসা বার করেছে সে। জংসন স্টেশনের ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের রাবিস্ থেকে বেছে বেছে পোড়া কয়লা উদ্ধার করে। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ থেকে

কয়লার টুকরা খুঁজে বার করা আর হীরকখনিতে কয়লার স্তূপ থেকে হীরকখণ্ড বেছে বার করার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। অন্তত পরিশ্রমের দিক থেকে, ধৈর্যের মাপকাঠিতে, অধ্যবসায়ের নিক্তিতে। তারপর ঝুড়ি ক'রে বেচে দিয়ে আসে বাজারের দোকানে। বৌদি যদি চানাচুর নাই ভেজে দেয়—তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে? বাবা মাকে মানুষ করার দায়িত্ব আছে না? দাদার অসুখ সারিয়ে তুলতে হবে না? ওর বলবার ভঙ্গি দেখে এত দুঃখেও হাসে কামিনী। বলে: থাকিস কোথায়? খাস্ কি?

: থাকি ঐ ইয়ার্ডেই। খাই যা পাই। কত টাকা জমেছে জানো? আঠারো টাকা! পঞ্চাশ টাকা জমলেই আমি ফিরে যাবো কলোনীতে। তখন আর আলাদা থাকতে হবে না বাবা মাকে। সেখানে দোকান খুলব আমি।

হরিপদ মাস্টার হঠাৎ টেনে নেন বাবলুকে! ধুলাবালি মাখা ছেলেটাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে শিরশ্চুম্বন করেন পণ্ডিত। বাবলুর সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছিল তাঁর। তিরস্কার করেছেন, মেরেছেন, শাসন করেছেন এই ঘরপালানো ছেলেটিকে। সংসারের কোনও কাজ করে না, পড়াশুনায় মন নেই এ জন্য মনে মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ একলব্যের মতো একক সাধনরত শিশুটির অন্য এক রূপ ফুটে উঠেছে অন্ধের দৃষ্টি-সম্মুখে। কয়লার গুড়ায় মলিন তার সর্বাঙ্গ কিন্তু তার সাধনা, তার তপস্যা একনিষ্ঠ, অমলিন!

মর্টনদা ওকে ডাকে: বাবলু যাবি না?

বাবলু বলে: যাই বৌদি, যাই বাবা? মশলামুড়িকে দাহ ক'রে আসি?

কামিনী বলে: এস ভাই। কিন্তু ওখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। বাড়িতে থেকেই ব্যবসা করতে হবে তোমাকে।

বাবলু ঘাড়-নেড়ে চলে যায়।

ওরা এগিয়ে যায় ওদের এক প্রিয় বন্ধুর শেষকৃত্য করতে। কিশোর বন্ধুটির সঙ্গে ওরা ফেরি করতো নানান সওদা ডেলি প্যাসেঞ্জার ভর্তি রেলের কামরায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে যাতায়াত করত এ ঘর থেকে ওঘরে—রড ধরে ধরে। একসঙ্গে খেত বিড়ি—গাইত সস্তা সিনেমা সঙ্গীত। সমব্যবসায়ীই শুধু নয়—জীবনের যাত্রাপথে ওরা সহযাত্রী, ঐ মশলামুড়ি হাতকাটাতেল মর্টন আর বাবলু। জীবন যুদ্ধের রণাঙ্গনে সংগ্রামরত বালসেনা! কমরেডস্!

হরিপদ মাস্টার তখন অন্য কথা ভাবছেন। হারানো ছোট ছেলেটিকে পেয়েই মন গিয়েছে বড়ছেলেটির দিকে। একবার দেখা হয় না? ঐ তো ঐ ওয়ার্ডে আছে অনিমেষ। যাকে বাঁচিয়ে তুলছে তাঁর বৌমা ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সীমন্তিনীর একনিষ্ঠ সেবায় ফিরিয়ে এনেছে মৃতকল্প স্বামীকে—মৃত্যুর দ্বার থেকে।

ক্যাম্পের রিকসায়ালা ভেবেছিল বুড়োকর্তা যদি ছেলে ফিরে পায়—তবে সে একটা দাবী জানাবে। না ভাড়া নয়—একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার দাবী। সে কথা কিন্তু সে বলতে পারল না। ঐ একফোঁটা ছেলেটার দ্বিখণ্ডিত দেহ, ঐ হরিধ্বনি, এ সবে তার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাবলুকে সে চেনে না—তবু বাবলু বেঁচে যাক এটাই সে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে বাবলু বেঁচেছে বটে, কিন্তু মশলা-মুড়ি মারা গেছে। না, মশলামুড়িকেও সে চেনে না। মশলামুড়ির বংশে কেউ রিক্সাআলা আছে বলেও জানা নেই তার। তবু রিফুজি তো? সব রিফুজিই তো সব্বার ভাই, না কি কও? যুক্তিটা ওর এই জাতীয়। বলে: আয়েন বুড়াকর্তা, লয়্যা যাই।

ফেরা কিন্তু হয় না তাঁদের।

এ্যাম্বুলেন্সখানা এসে পৌঁছায়! পিছন পিছন একখানা জীপ। জীপ থেকে নামেন ঠাকুর্দা আর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। এ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হ'ল নমিতা আর যোগেনকে। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওদের।

ঠাকুর্দা এসে হরিপদ পণ্ডিতের হাতখানা চেপে ধরেন।

তিনি এসে পৌঁচেছেন ক'লকাতা থেকে। সোজা জীপে করে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন ক'লকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বাগচি সাহেবও ছুটি সত্ত্বেও খবর পেয়ে এসেছেন।

মারামারি গণ্ডগোল সব থেমে গেছে।

নতুন উদ্বাস্তুরা যাতে আর উদয়-নগরে না আসতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে, শেয়ালদ' স্টেশন থেকে ওদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যারা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে বেছে বেছে কর্মঠ লোকের পুনর্বসতি দেওয়া হবে এখানেই। বাকি লোক ফিরে যাবে ক্যাম্পে। সবই সুষ্ঠু ভাবে মিটে গেছে। পরিকল্পনার কাজ কাল থেকে পূর্ণোদ্যমে চালু হবে। নিতাইপদ লীডার বাছাই করা বিষয়ে কোয়াপারেটিভ গড়ার প্রস্তাবটাও দাখিল করেছিলেন। বাগচি সাহেবও পূর্ণ সম্মতি জানান এ ব্যবস্থায়। বস্তুত কোয়াপারেটিভ ক'রে কাজ বিতরণ না করলে কিছুতেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হ'তে পারে না। বেকার নিঃস্বকে গ্রুপ লীডার করলে তারা কাজ করতে পারে না অর্থাভাবে। গোপনে তারা মহাজনের পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজে। এদিকে বিনা জামানতে, কাজ করার আগে দাদন দেওয়াও সম্ভব নয় সরকারী আইনে। যতীশবাবু চেয়েছিলেন এমন কিছু গ্রুপ-লীডার বেছে নিতে যারা প্রথম পর্যায়ে অর্থ বিনিয়োগ করবার ক্ষমতা রাখে। তাই তিনি বিষ্টুপদ, গোকুল আর পতিতুণ্ডির নাম রেকমণ্ড করেছিলেন। বাগচি সাহেব তাতে রাজী নন। ক'লকাতা থেকে যে কজন অফিসার এসেছিলেন তাঁরাও চান না তেলামাথায় তেল ঢালতে। সুতরাং নিতাইপদর প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন সকলে। কাজ দেওয়া হবে কোয়াপারেটিভকে—ব্যক্তিগত মুনাফার অবলুপ্তি ঘটল! সমষ্টির লাভ লোকসান বুঝে নেবে শেয়ার হোল্ডাররা। কোয়াপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ মাদ্রাজী অফিসারও এসেছিলেন ওঁদের সঙ্গে। অবিলম্বে কি ক'রে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তা তিনি সরজমিনে দেখতে এসেছেন।

বিষ্টুপদ-গোকুল-নবীন পতিতুণ্ডির শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তাঁদের বড় মুরুব্বি স্বয়ং যতীশ বাবুই যখন হালে পানি পাচ্ছেন না! তখন তাঁদের আর আশা কোথায়? সুতরাং ওঁরা সরে দাঁড়ালেন। খিড়কির দরজা দিয়ে পুনঃপ্রবেশেরও আর পথ রইল না। ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী যতীশবাবুই এখন সে পথ দিয়ে প্রস্থান করতে পারলে বাঁচেন। বদলি হ'লেই খুশী হন তিনি, কিন্তু ভাবে মনে হয় টিনের হিসাবটা না মিটানো পর্যন্ত বদলির কোনও আশা নেই।

সবই মিটে গেছে, —সবই স্বচ্ছ ভাবে মিটিয়ে এনেছেন নিতাইপদ। এবার এই ছন্নছাড়া জীবগুলোকে নিয়ে নতুন পৃথিবী সৃজন করবেন ওঁরা। বল্মীকধর্মী মানুষগুলো শুধু বাড়ি করেই ক্ষান্ত হবে না—ওরা গড়ে তুলবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। পশ্চিম বাংলার আর পাঁচটা জরাজীর্ণ গ্রামে যা সম্ভব হয়নি—হবে না, তাই সফল করে তুলবে ওরা। ওদের কলোনীতে নেই প'ড়ো ভাঙ্গা মন্দির আর মজা পানাপুকুর। সমাজপতির অর্কফলার আন্দোলনকে ওরা ভয় করে না। কালো শ্লেটে নতুন ক'রে পড়বে ওদের লেখা—নতুন পরিবেশে—মাঠের মাঝে গড়ে ওটা এই গ্রাম নগরীতে। গ্রাম্যসমাজ জীবনের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে ওরা সচেতন—সেগুলি প্রথম থেকেই পরিহার করে চলবে। নিতাইপদ নবীন উৎসাহ নিয়ে তাই ফিরে এসেছেন বাগচি সাহেবকে সঙ্গে ক'রে ক'লকাতা থেকে।

কিন্তু যদি কয়েকঘণ্টা আগেও এসে পৌছাতে পারতেন—তাহ'লে এ শুভকাজের সূচনায় রক্তপাতটা নিবারণ করা যেত।

পরের দিন প্রভাত।

জংসন হাসপাতালের সামনে একটা বিরাট জনতা।

মর্গ থেকে জনা চারেক লোক বার ক'রে আনল নমিতাকে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণটা ভরে গেছে লোকে। তিল ধারণের স্থান নেই। রাত্রি থাকতেই লোক আসছে। ফার্স্ট লোকালেই এসেছে অসংখ্য লোক।

কলোনীর বাসিন্দা। সমস্ত উদয়-নগর কলোনী বুঝি সমবেত হয়েছে ওদের একটি মেয়েকে শেষ সম্মান জানাতে। এসেছে প্রমোদ, কানাই, রাখাল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যোগেন। দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। সন্ত ফিরেছে সে শ্মশান থেকে। প্রিয়বন্ধুর শেষকৃত্য ক'রে ফিরে এসেই শুনেছে এই দুঃসংবাদ। মর্টন আর হাতকাটা তেল ধরে আছে ওর দু হাত। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। শ্মশান বৈরাগ্য তার ছোট্ট দেহখানিতে মাখা। কাঁদছে না আর। অশ্রুর উৎস তার শুকিয়ে গেছে। গাজনের ক্ষুদে সন্ন্যাসী যেন একটা। জনতা নির্বাক।

নমিতাকে নামানো হ'ল হাসপাতালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসেন নিতাই কবিরাজ। তাঁর ডানহাতখানিতে ধরা আছে অন্ধ হরিপদ মাস্টারের একখানা হাত। আর একখানা হাত ধরা আছে অনিমেষের মুঠিতে। জরাগ্রস্ত পঙ্গু অন্ধ হরিপদ পণ্ডিত। বৃদ্ধ হাতড়ে হাতড়ে মুখখানার নাগাল পেলেন। সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তার মধ্যে অপরাজিতা ফুলের মত ফুটে রয়েছে পঁচিশ বছরের কুমারী কালো মেয়েটির মুখখানি।

অন্ধ কোটরগত দু চোখ দিয়ে নেমেছে দুটি ধারা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। মাথাটা নিচু করে অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মতো কি যেন বল্লেন তিনি।

আঘাতে আঘাতে পাষাণ পণ্ডিত আজ যদি আকাশ-বিদীর্ণ-করা আর্তনাদ ক'রে উঠতেন তাহ'লেও বুঝি এর চেয়ে আশ্বস্ত হত লোকগুলো।

নিতাইপদ বলেন : এবার ওদের নিয়ে যেতে দিন।

হরিপদ পণ্ডিত আপত্তি করেন না। উঠে দাঁড়ান। অস্ফুটে বলেন : আচ্ছা আয় মা!

সুরেখা দেবী বিরাট দুটো ফুলের তোড়া এনে রাখলেন মুখখানির দু'পাশে। আঁচলে চোখটা মুছলেন।

নমিতা আজ শহীদ!

—বলহরি, হরিবোল!

আর্তনাদ ক'রে নমিতার পায়ের উপর উবুড় হ'য়ে পড়ল লতু। ফুলে ফুলে কাঁদছিল সে। ভূষণ ওর হাত দুটি ধরে তোলে। ফুলে ঢাকা মেয়েটি ওঠে জনতার কাঁধে।

জীবনের প্রথম ফুলশয্যা।

শেষও!

বাগচি সাহেব ছুটে এসে বলেন: নামাও, নামাও।

নামানো হ'ল নমিতাকে।

বাগচি বলেন: প্রেস ফটোগ্রাফাররা এসেছেন। নমিতার ফটো নেবেন। একখানা এনলার্জ ক'রে রাখতে হবে আমার অফিসেও।

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন মেয়েটির দিকে। গতকালও ছিল এই মেয়েটির কত আশা আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত কলোনীর ভালো মন্দ নিয়ে তর্ক করে গেছে তাঁর সঙ্গে। কত কটু কথা বলে গেছে তাঁকে!

ওরা এখান থেকে যাবে কলোনীতে—নমিতার বাসায়। বিন্দুবাসিনী আছেন সেখানে। কামিনীও আছে তাঁর কাছে। সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে গণকল্যাণ-সমিতির অফিসে—অর্থাৎ নিতাই ঠাকুর্দার সেই এককামরার ঘরে। সেখান থেকে হাতিপোতার বিলে। উদয়নগর কলোনীর অন্তিম মণিকর্ণিকায়। ওখানে ওদের অনেকেই গিয়েছে এতদিন দলে দলে, যাবে ভবিষ্যতেও—কিন্তু এমন সমারোহ ক'রে শোকযাত্রা হয়নি কখনও হাতিপোতায়!

অন্ধ হরিপদ পণ্ডিতকে হাত ধরে নিতাই ঠাকুর্দা নিয়ে এসে বসালেন একটা রিক্সায়। পণ্ডিত তখনও নির্বাক। নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পন করেছেন নিতাইপদর হাতে। নিতাইপদ ভাবছিলেন তাঁর ডান হাতখানাই ভেঙ্গে গেল। ভাঁড়ার ঘরের আগল খুলে বেরিয়ে এসেছিল যে ঘরোয়া মেয়েটি—তাকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি আপন হাতে। মুখচোরা লাজুক মেয়েটির মধ্যেই ছিল সুপ্ত বহ্নিশিখা। জাগিয়ে তুলছিলেন তাকে তিনি।

সংগ্রামের সুরুতেই বিদায় নিল সেই দক্ষ সেনাপতি। কিন্তু কলোনীর জীবন-উপন্যাসের এতো শেষ পরিচ্ছেদ নয়—এই যে সুরু। অন্ধ হরিপদ যেন এই উদয়নগর কলোনীর একটা রূপক। নমিতাকে হারিয়ে বুকটা ফেটে গেলেও আর্তনাদ করার সময় নেই। এর পরেও আছে আগামী দিনের সমস্যা। রুটি চাই, অন্ন চাই। হরিপদ যেন সমগ্র কলোনীর প্রতীকরূপে নিতাইপদর হাতে করেছেন অন্ধ আত্মসমর্পণ।

কাজ! কত কাজ!

সে কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে নবাগতদের জন্য। দলে দলে লোক আসছে আরও। সার বেঁধে আসছে ও রাজ্য থেকে এ রাজ্যে। যেমন ক'রে খাইবার পাস দিয়ে এসেছিল এদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, যেমন ক'রে নিতাইপদ এসেছেন কয়েকবছর আগে—তেমনি ক'রেই আসছে ওরা। আসুক ওরাও আসুক! নিতাইপদ কিছুতেই ওদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। এখানে জমি নাই, এখানকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বারে বারে, তবু ঠাকুর্দা ওদের বরণ করে নেবারই পক্ষপাতী। অতিথি সব অবস্থাতেই নারায়ণ!

গঙ্গার জল পবিত্র। ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় যখন বান ডাকে তখন দুপারের গ্রাম ভেসে যায় প্লাবনে। বন্যাবিধ্বস্ত গৃহহীনেরা সে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখতে পায় মৃত্যুর ছায়া। সে জলকে আমন্ত্রণ জানায় না কেউ। তবু সে ঘোলাজলও পূত গঙ্গোদক। তার মধ্যেও থাকে উর্বর পলিমাটির স্বর্ণরেণু। আজ যে জন-জাহ্নবীর প্লাবনে ভেসে যেতে বসেছে নিতাইপদর দেশ—সেও পূত গঙ্গোদকই। মনুর পবিত্র বংশধর এই গণ-গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গ। সবার উপরে ওদের স্থান। অমৃতের পুত্র—কঙ্কালাবশেষ মনুষ্যাকৃতি জীবগুলো।

হয়তো ওদের ভাগ দিতে গিয়ে ভরপেট খাবার মিলবে না সকলের। তবু এদের সাথে অন্নপান ভাগ করে খেতে হবে। সে কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হবে হাসিমুখেই।

সেই হাসিরই একটু টুকরো লেগে আছে ঐ তাঁর ফুলে ঢাকা নাতনিটির অধরপ্রান্তে।

অপরাজিতার হাসি।

শ্মশান যাত্রীরা মোড় ফেরে বাঁয়ে।

বিরাট শোকযাত্রা।

সকলের পিছনে পিছনে আসছিল ভূষণ। হাত ধরে নিয়ে চলেছে লতুকে। পাশে পাশে চলেছে লতু। কাঁদছে সে। ভূষণের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কি ভাবছে সে—তা সেই জানে। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য উঠছে। ভূষণের চোয়ালের হাড় দুটো চেপে বসেছে। আশপাশের সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। চলেছে সামনের দিকে দৃঢ়মুষ্টিতে লতুর ডানহাতখানা চেপে ধরে।

খেয়াল নেই ওর হাতের তালুতে ফুটছে কাঁটা—ওর মায়ের হাতের মকরমুখো বালার সোনার কাঁটা!

